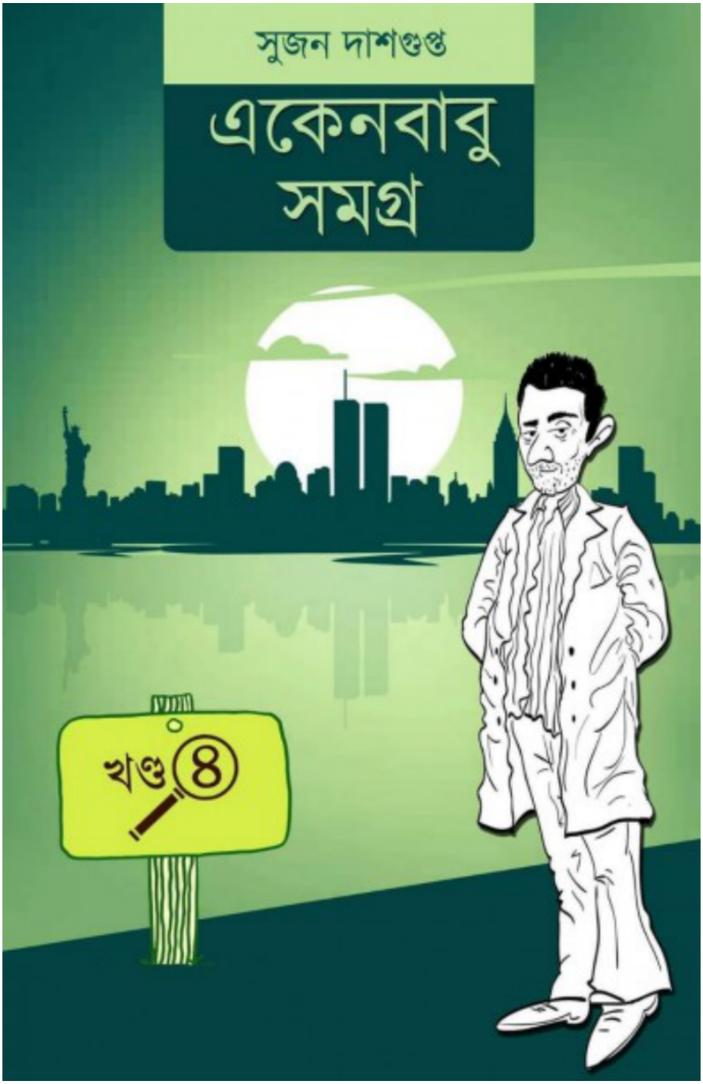
সুজন দাশগুপ্ত
একেনবাবু
সমগ্র
খণ্ড ৪

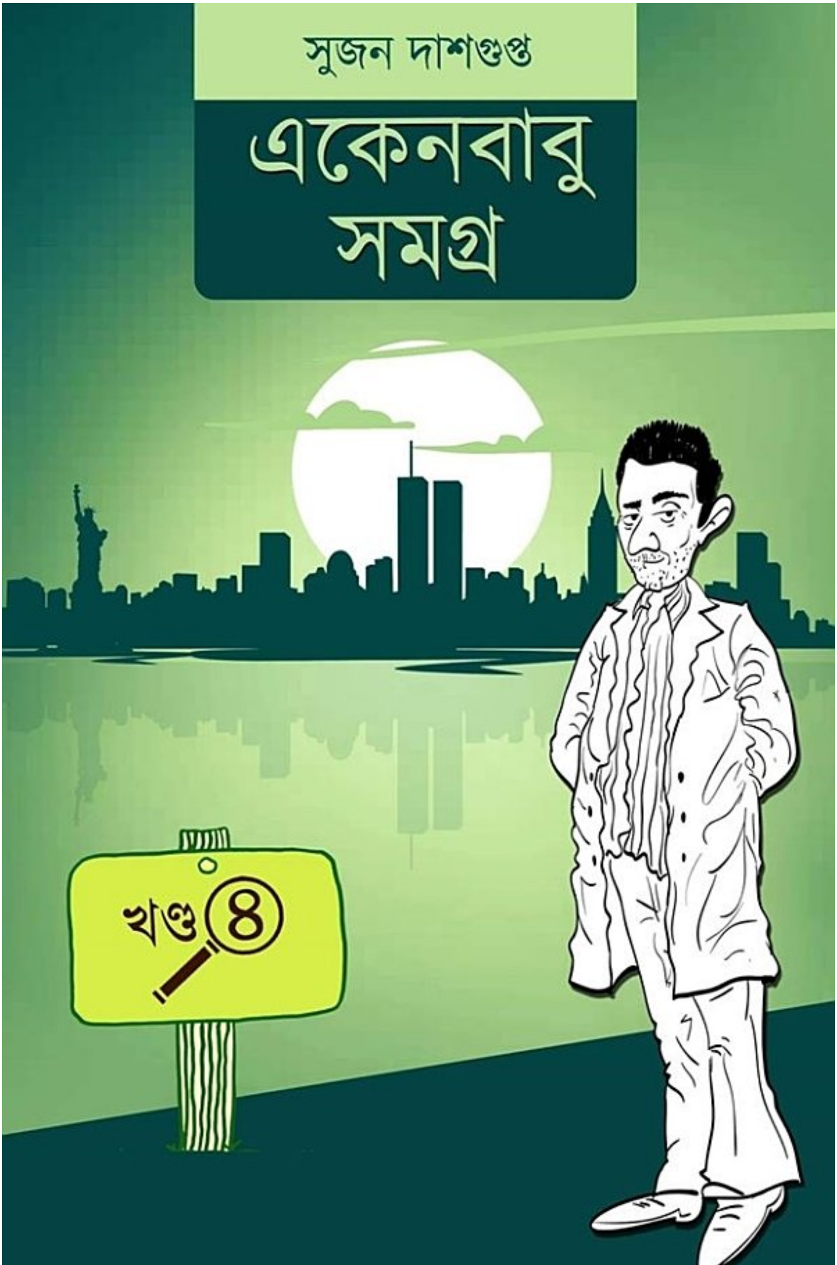
সুজন দাশগুপ্ত
একেনবাবু
সমগ্র
খণ্ড ৪

একেনবাবু সমগ্র

(চতুর্থ খন্ড)

সুজন দাশগুপ্ত

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

The Cafe Table

www.thecafetable.com

Ekenbabu Somogra (Choturtho Khondo)
Sujan Dasgupta
A Collection Of Detective Novels

প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারি, ২০২০
প্রথম ই-বুক প্রকাশ	মে, ২০২০
দ্বিতীয় ই-বুক প্রকাশ	মার্চ, ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব	সুজন দাশগুপ্ত
প্রচ্ছদ	একতা ক্রিয়েটিভ টেলস্
পত্রবিন্যাস	ইন্দ্রাণী নাগ
মুদ্রক	জয়শ্রী প্রেস, কলকাতা-০৯
পরিমার্জিত	দ্য বুকমেকার্স
ই-বুক সংস্করণ	(thebookmakers2020@gmail.com)
মূল্য	৩২৫ টাকা / ১৬.২৫ ডলার
ISBN	978-93-87753-91-4
প্রকাশক	অভিষেক আইচ ও অরিজিৎ ভদ্র দ্য কাফে টেবল সাহেববাগান, ব্যান্ডেল, হুগলি – ৭১২১২৩ ৯৮৭৪২৬৩৪১৩, ৯৭৪৮০৮১৫৪২

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রিঙ্কি ও বরুণকে

ভূমিকা

‘একেনবাবু সমগ্র’-র তিনটে খণ্ডের পর এবার চতুর্থ খণ্ড। একেনবাবু যে এত কীর্তি করেছেন আমি তো আগে জানতাম না! আর বাপিবাবুর কাণ্ড দেখুন, তেড়ে সেগুলো লিখে গেছেন! ছাত্র পড়ানোর কাজে নিশ্চয় বিস্তর ফাঁকি দিয়েছেন, নইলে... থাক, ভদ্রলোককে আর গালমন্দ করব না। এদিকে আমার হয়েছে ঝামেলা। যদি প্রথমেই জানতাম পাঠক আগ্রহ নিয়ে একেনবাবু পড়বেন, তাহলে সতর্ক হয়ে সংকলনের কাজটা শুরু করতাম। সবগুলো কাহিনি আগে পড়ে নিয়ে খণ্ডগুলো ভাগ করতাম, যাতে একটা পারম্পর্য থাকত। এখন তো কোনও উপায় নেই।

‘উডব্রিজ শহরে’ গল্পটি বাদে, এই খণ্ডের সব কাহিনিই পূর্ব-প্রকাশিত। কিন্তু প্রত্যেকটি কাহিনিতেই প্রচুর পরিমাণে কলম চালানো হয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার অগ্রজ সুমন দাশগুপ্তের প্রতি কৃতজ্ঞ বাপিবাবুর লেখাগুলোতে যে সব খামতি ছিল সেগুলো ধরিয়ে দেওয়ার জন্য।

প্রকাশক অভিষেক আইচ আর অরিজিৎ ভদ্র দু-জনেই আমার স্নেহাস্পদ। তাদের প্রবল উৎসাহ ছাড়া চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হত না।

□ সুজন দাশগুপ্ত
মন্টভিল, নিউজার্সি

সূচি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

আসল খুনির সন্ধানে

আইডিয়াল জুয়েলরি

উডব্রিজ শহরে

ভয়ঙ্কর চিঠি

খুনের আগে খুনী খোঁজা!

আসল খুনির সন্ধানে

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

একেনবাবুর ঘ্যানঘ্যানানি সহ্য করতে না পেরে শনিবার আবার এশিয়া সোসাইটিতে যেতে হল। এশিয়া সোসাইটির প্রধান কাজ সায়েবদের কাছে এশিয়ার কালচার তুলে ধরা। তারজন্য প্রায়ই ওরা কিছু না কিছু একটা করে বক্তৃতা, আলোচনা, গান, বাজনা, সিনেমা, এক্সিবিশন, কী নয়? একবার কারো চাপে পড়ে এশিয়া সোসাইটির মেম্বার হয়েছিলাম, পরে চাঁদা-টাদা আর দিইনি। কিন্তু অনুষ্ঠানের নোটিসগুলো নিয়মিত পাই।

প্রথম লাইনেই 'আবার' কথাটা কেন যোগ করলাম বলছি, কারণ কয়েকদিন আগেই বিনয় দত্তের আর্ট এক্সিবিশনে গিয়ে সবাই অপদস্থ হয়েছিলাম। একেনবাবু আবার যাবার বায়না করছেন দেখে প্রথম ধমকটা প্রমথই দিল।

"আপনার লজ্জা করে না মশাই! জাস্ট তিনদিন আগে আপনার জন্য বিনয় দত্তের কাছে আমাদের সবার কী বেইজ্জতিই না হল!"

"আসলে স্যার আর্ট ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না," কাঁচুমাচু মুখে স্বীকার করলেন একেনবাবু। "বিশেষ করে উনি যে ধরনের ছবি আঁকেন... বিমূর্ত কী জানি...।"

"অভিব্যক্তিবাদ। কিন্তু সেটা পড়েই তো গিয়েছিলেন নেচে নেচে। আর এটাও তো এনশেন্ট আর্ট নিয়ে... ভালো করে নোটিসটা পড়েছেন? The Future of the Past—Collecting Ancient Art in the 21st Century।"

"কী মুশকিল স্যার, এটা তো আর্ট নয়, অ্যান্টিক সংগ্রহ নিয়ে। আর্ট ডিলার, কিউরেটর, আইনজ্ঞ, আর্ট-বিশেষজ্ঞরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবেন। খুব জানা দরকার।"

"যত্তসব ননসেন্স!"

প্রমথ আসবে না বলেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এল। তবে আগের থেকেই ঘোষণা করে রেখেছে, দু-ঘণ্টা ধরে আলোচনা শুনতে ও রাজি নয়, বড়োজোর আধঘণ্টা। একেনবাবু তাতে গাঁইগুঁই করেননি।

আমাদের অবশ্য এক মিনিটও শুনতে হল না। এশিয়া সোসাইটি থেকে যখন এক ব্লক দূরে একেনবাবুর মোবাইলটা বেজে উঠল।

"বলুন স্যার... খুব জরুরি? আমরা এখন এশিয়া সোসাইটির খুব কাছে... আপনার বাড়িতে? সবাই? দাঁড়ান স্যার, ওঁদের একটু জিজ্ঞেস করি।"

"কার ফোন?"

একেনবাবু ফোনটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে বললেন, "ডাক্তার অবনী গুপ্তের। ওঁর বাড়িতে আমাদের একটু আসতে বলছেন।"

"কেন, কী ব্যাপার?"

"জানি না স্যার, তবে খুব জরুরি, এখুনি কথা বলতে চান।"

বাঁচা গেল! পণ্ডিতদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল! সানন্দে মাথা নেড়ে দু-জনেই সম্মতি জানালাম।

"ঠিক আছে স্যার, আমরা তিনজনই আসছি।"

অবনী গুপ্তের বাড়ি এশিয়া সোসাইটির খুবই কাছে। নিউ ইয়র্কের এই অঞ্চলে টাকাওয়ালা লোকেরা থাকে। ভদ্রলোক কত বড়ো ডাক্তার বলতে পারব না, তবে দুর্দান্ত ব্যাবসাদার। ম্যানহাটান, কুইন্স আর ব্রুকলিন□ এই তিন জায়গা মিলিয়ে আট-দশটা ওষুধের দোকানের মালিক। এছাড়া নিউ জার্সিতে দু-দুটো নার্সিং হোম চালান। এবার ওঁর নজর কলকাতায়। একটা ফাইভ-স্টার নার্সিং হোম খোলার জন্য জমি কিনেছেন, বিল্ডিং-এর কাজ প্রায় কমপ্লিট। কলকাতার বাঘা বাঘা অনেক ডাক্তার নাকি যোগ দিচ্ছেন সেখানে। অন্তত সেটাই গুজব।

অবনী গুপ্ত শুধু অর্থবান নন, খুবই আত্মম্ভরি। এমন কি অভদ্র বলেও বাঙালি মহলে দুর্নাম আছে। আমাদের সঙ্গে অবশ্য ভালো ব্যবহার করেন, কারণ একেনবাবু। একবার একটা নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে কেউ ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছিল। অবনী গুপ্ত ধোয়া তুলসীপাতা না হলেও ওই ব্যাপারে বোধহয় কেউ ফাঁসিয়েছিল। একেনবাবু সেই ব্ল্যাকমেলারকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে ওঁর বাড়িতে বড়ো কোনো পার্টি হলে আমরাও নিমন্ত্রিত হই। ওঁর ব্যবসাগুলোতে সিকিউরিটি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলেই একেনবাবুর পরামর্শ চান। পয়সাকড়ি অবশ্য দেন না, তবে ভালোমন্দ খাওয়ান□ সেটাই বা কম কি!

কলকাতায় এই নার্সিং হোম খোলা নিয়েও একেনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন অবনী গুপ্ত। বিশেষ করে বাড়িটা করতে গিয়ে যে-সব ঝামেলা হয়েছে, সেই নিয়ে। এখন ওঁর চিন্তা ইন্ডিয়ার এই ব্যবসা কতটা লাভজনক হবে! ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলো বেছে তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসা, কারো ইন্সিওরেন্স না থাকলে তাকে ভর্তি করা হবে কিনা ঠিক করা... কারণ, ফেলো কড়ি মাখো তেল ব্যাপারটা সব সময় খাটে না। কত কড়ি অ্যাডভান্স? বিশেষ করে এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে পেশেন্টকে একবার ভর্তি করে নিলে চিকিৎসায় কত খরচা হবে আগে থেকে বলা যায় না। সেক্ষেত্রে টাকা আদায় একটা সমস্যা, আর রোগীর মৃত্যু হয়ে গেলে তো কথাই নেই।...

আমি এইসব আলোচনায় ছিলাম না, আবছা আবছা যা শুনেছি তাই লিখলাম। দিন পনেরো আগে কোথাও যাবার পথে মিনিট পাঁচেকের জন্য আমাদের বাড়িতে থেমেছিলেন। আসলে একেনবাবুর কাছে ওঁর একটা প্রশ্ন ছিল। উনি নাকি কয়েকদিন আগে শুনেছেন চিকিৎসায় গাফিলতির নামে হাসপাতাল বা নার্সিং হোমগুলোতে যে-সব ভাঙচুর চলে, মৃত-রোগীর আত্মীয়স্বজন বা পাড়াপড়শিরা সব সময় তা করে না। পিছনে টাকার ব্যাপারও থাকে। লোকাল গুন্ডাদের হাতে পাঁচ-দশ হাজার ধরিয়ে দিয়ে এই ভাঙচুরগুলো করানো যায়! কথাটা কি ঠিক?

একেনবাবু এইসব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। "হ্যাঁ স্যার, পত্র-পত্রিকায় তো অনেক কিছুই বার হয়, সত্যি না মিথ্যা...।"

"মিথ্যে কেন হবে, এতে তো লাভ আছে। বেশির ভাগ সময়েই হাসপাতাল বা নার্সিং হোম ঝুট-ঝামেলা এড়ানোর জন্য লাখ লাখ টাকার পাওনাই মকুব করে দেয়, লাখ লাখের বদলে পাঁচ-দশ হাজারেই কাজ মিটে যায়! সুতরাং আমাদেরও এ লাইনে কিছু একটা ভাবতে হবে, মানে গুন্ডা কানেকশনের ব্যাপারে...।"

"কী যে বলেন স্যার!"

এই সময়ে আমার একটা ফোন এসে যাওয়ায় পরের কথাগুলো শুনিনি। ফোন যখন শেষ হল আলোচনাও শেষ। চলে যেতে যেতে অবনী গুপ্ত শুনি আফশোস করেছেন, কলকাতায় নার্সিং হোম খোলার ঝুটঝামেলায় কেন নিজেকে জড়িয়েছেন বলে!

।। ২।।

অবনী গুপ্তের অ্যাপার্টমেন্ট আটতলায়। একেনবাবুর দৌলতে আগে এখানে বেশ কয়েকবার এসেছি। সিকিউরিটি গার্ডদের সবাইকেই অল্প-বিস্তর চিনি। তবে আজকে যারা পাহারায় তারা নতুন। ডাঃ গুপ্ত নিশ্চয় ওদের বলে রেখেছিলেন আমরা আসছি। নাম বলতেই লিফট দেখিয়ে দিল।

পাশাপাশি দুটো প্রশস্ত লিফট, হাত-পা ছড়িয়েও এক ডজন লোক দিব্যি দাঁড়াতে পারে। ফ্যান্সি ইন্টিরিয়ার। মেঝে থেকে ফুট চারেক উঁচু মেহগনি প্যানেল লিফটের তিন দিক জুড়ে। প্যানেল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে কাচের ঝকঝকে আয়না। ফলে লিফটটা যেন আরও বড় দেখাচ্ছে! দু-দিকে হাত-ধরার লম্বা হ্যান্ডেল আয়নার ঠিক নীচে লাগানো। লিফটের দরজা আর তার পাশের প্যানেল, যেখানে কন্ট্রোল বাটনগুলো, সোনালি রঙের স্টেইনলেস স্টিলের। লিফটের কার্পেটে কী স্প্রে করে জানি না, ঢুকলেই এক ঝলক সুগন্ধ নাকে আসে। আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর ঘুপচি, রং-চটা, দেয়ালে চিত্র-বিচিত্র দাগওয়ালা লজ্ঝড়ে লিফটের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। ঘটঘট আওয়াজ করতে করতে কষ্টেসৃষ্টে ওপরে ওঠে না, সোঁ করে উঠে যায়। এতে চড়াও একটা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা।

অবনী গুপ্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বেল টিপতেই দরজা খুলে অভ্যর্থনা করলেন, "আসুন, আসুন, থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং অন সাচ এ শর্ট নোটিস।"

মুখ দেখে মনে হল একটু উদ্বিগ্ন।

"কী যে বলেন স্যার," একেনবাবু তাঁর স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে বললেন।

"এদিকে, এই ঘরে আসুন," বলে আমাদের সবাইকে বাইরের ঘরে নিয়ে বসালেন। "কী দিতে বলব আপনাদের হুইস্কি, জিন, ভডকা? কফি, চা?"

"আরে না স্যার, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

আমার একটু তেষ্টাই পেয়েছিল। বললাম, "কোনো সফট ড্রিঙ্ক আছে?"

"নিশ্চয়। কী চান কোলা না আনকোলা?"

"কোক আছে?"

"নিশ্চয়। বলজিৎ!" বলজিৎকে আমরা চিনি। এক মধ্যবয়সি পাঞ্জাবি মহিলা। ডাঃ গুপ্তের কুক-কাম-হাউসকিপার। বলজিৎকে একটা কোক আনতে বলে সেইসঙ্গে চা-ও অর্ডার করলেন। তারপর একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন, "বনানী বাড়ি নেই,

শিকাগোতে বোনের কাছে গেছে।”

মনে মনে ভাবলাম, সর্বনাশ, আবার নিশ্চয় কোনো নারীঘটিত ব্যাপার!

“সব কিছু ঠিক আছে স্যার?” একেনবাবু উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্নটা করলেন।

“না, ঠিক নেই, একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটেছে!”

“কী স্যার?”

“কলকাতায় আমার পাবলিসিটি ম্যানেজার বিকাশ সেন গতকাল খুন হয়েছে।”

নার্সিং হোম প্রসঙ্গে বিকাশ সেনের নাম কয়েকবার শুনেছি। ডাঃ গুপ্তের সঙ্গে তোলা তাঁর ছবিও দেখেছি। আমাদেরই মতো বয়স। তিনি খুন হয়েছেন! কী ভয়ানক কথা!

“সেকি স্যার!” একেনবাবু বললেন।

“যেটা হরিবল, সেটা হল ওর লাশ সোনাগাছির একটা গলিতে পাওয়া গেছে!”

“সোনাগাছিতে!”

“হ্যাঁ, আর সেই নিয়ে এখন কেলেঙ্কারি! ওর স্ত্রী-র সঙ্গে একটু আগে কথা হল। ভীষণ কান্নাকাটি করছে। একে স্বামীর মৃত্যু, তার ওপর এই কলঙ্ক। বিকাশকে আমি চিনি বহু বছর। সোনাগাছিতে যাবার ছেলে সে নয়। ভদ্র পরিবারের পড়াশুনো জানা বিবাহিত সোফিস্টিকেটেড ইয়ং ম্যান। স্ত্রীসঙ্গ করতে চাইলে কোনো হাইক্লাস কলগার্লের সঙ্গে করতে পারে, সোনাগাছি যাবে না। আমার মনে হয়, কেউ ওকে গুলি করে বডিটা ওখানে ফেলে দিয়ে গেছে।”

“পুলিশ কী বলছে স্যার?”

“পুলিশ কী বলছে কে জানে! একটু আগে অনলাইনে কয়েকটা পত্রিকা পড়লাম। হাজার রকম থিওরি, পুলিশের নাম দিয়েই চলছে অত্যন্ত ডিসগাস্টিং ব্যাপার!”

ব্যাপারটা যে মর্মান্তিক ও জঘন্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে তার জন্যে একেনবাবুকে কেন জরুরি তলব, সেটা ভাবার চেষ্টা করছিলাম। বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। একটু চুপ করে থেকে ডাঃ গুপ্ত বললেন, “আই নিড ইওর হেল্প।”

“আমার হেল্প স্যার?” হতভম্ব হয়েই প্রশ্নটা একেনবাবু করলেন।

“ইয়েস। আমার মনে হয় এই খুনটার পিছনে বড়ো রকমের কোনো উদ্দেশ্য আছে। বিকাশ কলকাতায় আমাকে রিপ্রেসেন্ট করছে। এটা শুধু বিকাশকে খুন নয়, আমার এতদিনের প্ল্যানটাকেও কেউ মার্ডার করার চেষ্টা করছে।”

“দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান, আপনার এত পরিকল্পনা মার্ডার হবে কেন?”

“আপনি ব্যাবসাদার নন তাই বুঝছেন না। আমার কোম্পানির একজন বড়ো কনসাল্টেন্ট, যিনি পাবলিক রিলেশন্স দেখছেন তিনি সোনাগাছিতে খুন হলেন... এ নিয়ে কী পরিমাণ হইচই হচ্ছে সেটা কল্পনা করতে পারছেন? তিনি কী রকম শেডি ডিল করেন, সে ব্যাপারেও অনেক স্পেকুলেশন হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট বিকাশ যে কিছুদিন আগে লোকাল রতন গুন্ডার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খেয়েছে, সেটা নিয়েও পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। অথচ এগুলো আমি করতে বলেছি আপনারই পরামর্শে।”

“আমার পরামর্শে স্যার!” একেনবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।

“আপনিই তো বললেন, যে নার্সিং হোমের ফিজিক্যাল প্রোটেকশনের জন্য লোকাল গুন্ডাদের সঙ্গে সমঝোতা রাখতে। নার্সিং হোমে লোক তো মারা যাবেই, তারজন্য যদি সেখানে ভাঙচুর হয় তাহলে প্রফিটটা থাকে কোথায়?”

একেনবাবু কখনোই অবনী গুপ্তকে গুন্ডা পুষতে বলেননি, বরং উলটোটাই শুনেছি। অবনীবাবু যখন নার্সিং হোমে ভাঙচুর নিয়ে গুন্ডা কানেকশন রাখার কথা তুলেছিলেন,

একেনবাবু বলেছিলেন, 'কী যে বলেন স্যার!' কিন্তু এ নিয়ে অবনী গুপ্ত-র সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই, সব ব্যাপারেই উনি যা বুঝতে চান তাই বোঝেন।

একেনবাবু সে চেষ্টা না করে বললেন, "আমাকে বলুন স্যার, কী ভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"আমার বিশ্বাস এটা বিগ কনস্পিরেসি এগেইন্সট মি। কে বিকাশকে মেরেছে এবং কেন মেরেছে আপনি খুঁজে বার করুন।"

"এখান থেকে কি স্যার ওটা করা যায়!"

"এখান থেকে কেন! আপনি কালকের ফ্লাইটেই দেশে যান। যতদিন লাগে ওখানে থাকুন অল অ্যাট মাই এক্সপেন্স। এছাড়া আপনার ফি-টি যা লাগে আমি দেব।"

"কিন্তু স্যার..."

"কিন্তু-টিন্তু নয়, এই সাহায্যটুকু আপনাকে করতেই হবে, প্লিজ।"

লাকিলি এই সময়ে হাসপাতাল থেকে ডাঃ গুপ্তের একটা এমার্জেন্সি কল আসায় একেনবাবু সাময়িক ভাবে মুক্তি পেলেন।

সেদিন বাড়ি ফেরার পর থেকেই অবনী গুপ্তের ঘনঘন ফোন আসছে। একেনবাবুকে কলকাতা যাবার তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন। কোনো ওজর-আপত্তিই টিকছে না দেখে একেনবাবু আমাদের পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, ওঁর সঙ্গে আমাদেরও কলকাতা যেতে হবে। যেহেতু আমরা একটা টিম, একসঙ্গে কাজ করি অবনী গুপ্তের কাছ থেকে আমাদের সবার যাতায়াতের ভাড়াও নাকি উনি জোগাড় করে ফেলেছেন!

অন্যের পয়সায় দেশে যাওয়া লোভনীয় হলেও সম্ভব নয়। একেনবাবুর ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, উনি ফেলো হিসেবে নামে মাত্র ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত। ভুজুংভাজুং দিয়ে যত্রতত্র যেতে পারেন। আমি বা প্রমথ সেটা পারি না, দু-জনেই পড়াই। এটা ঠিক, একেনবাবুর হাতে কেস এলে আমরা সঙ্গে থাকি। 'সঙ্গে থাকি' বলাটা একটু বাড়াবাড়ি। আমার একটা গাড়ি থাকায় ওঁকে নিয়ে এদিক-ওদিক যেতে পারি। দুয়েকটা পরামর্শও দিই, যদিও পরে দেখি সেগুলোর মূল্য কানাকড়িও নয়। প্রমথ বাঁকা বাঁকা নানান কথা বললেও দরকার মতো সাহায্য করে। একেনবাবু অবশ্য সবাইকে বলে বেড়ান, আমি আর প্রমথ না থাকলে উনি অচল! এমন কি রহস্যের সমাধান করেও এমন ভাব দেখান যে আমরা দু-জনে সঙ্গে ছিলাম বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে! মজার ব্যাপার, কথাটা মিথ্যে হলেও শুনতে বেশ লাগে। তবে এবার সেটা হবার জো নেই।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একেনবাবুকে সেই একাই কলকাতা যেতে হল। যাবার দিন প্রমথ একেনবাবুর হাতে একটা ছবি দিয়ে বলল, "বউদিকে গিয়ে দেখাবেন।"

"কী স্যার?"

"আর্টিস্ট বিনয় দত্তের সঙ্গে আপনার ডায়ালগের ছবি। নিজের মুখ তো তখন আপনি দেখতে পাননি, তাই এখন দেখুন কী অবস্থা হয়েছিল।"

সত্যি, বেচারা একেনবাবু! বিনয় দত্তের সামনে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে বিনয় দত্তের আঁকা ছবি, যেটা তখনও শেষ হয়নি।

ও, ঘটনাটাই তো বলিনি। বিনয় দত্ত বিখ্যাত আর্টিস্ট হতে পারেন, কিন্তু আমাদের মতো আর্ট-অজ্ঞ লোকের কাছে তো তিনি অচেনা! শ্যামলা চেহারার ছোটোখাটো এক ভদ্রলোক লাল রঙের তুলি হাতে ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ইজেলের ওপর ক্যানভাসে প্রিন্ট করা কলকাতার একটা অস্পষ্ট ম্যাপ।

ভদ্রলোক তুলি দিয়ে ম্যাপের ওপর বাঁকা ত্রিভুজ-টাইপের কিছু আঁকছেন। আমাদের মতো আরও বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ একেনবাবু উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, ওটা কি একটা ত্রিভুজ?"

ভদ্রলোক থমকে তুলি হাতে ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখেমুখে বিরক্তি।

"আপনার কী মনে হয়?"

গলার স্বরে শ্লেষ সুস্পষ্ট। আমি একেনবাবুর হাতে একটু চাপ দিলাম, যদি হিন্টটা নিয়ে মুখটা বন্ধ রাখেন। বৃথাই। মাথাটা দু-একবার হেলিয়ে আরেকবার ভালো করে তাকিয়ে একেনবাবু উত্তর দিলেন, "মনে তো হচ্ছে স্যার ত্রিভুজ।"

একেনবাবুর ভাবভঙ্গি দেখে আর উত্তর শুনে অনেকেই হাসতে শুরু করেছে। কর্মকর্তাদের একজন চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। সত্যি, কী লজ্জাজনক পরিস্থিতি! একজন তো বিনয় দত্তকে বলেই ফেললেন, "প্লিজ গো অ্যাহেড এন্ড ফিনিশ ইট।"

বিনয় দত্ত ওঁর তুলি প্যালেটের ওপর রেখে বললেন, "আই অ্যাম ডান!"

সেটা রাগ করে, না সত্যিই 'ডান'□ কে জানে।

যাক সে কথা। আমি বললাম, "এটা তো দারুণ ছবি, কোত্থেকে পেলি?"

"রশিদের কাছ থেকে। ওখানে ও গিয়েছিল সেদিন। ইট ওয়াজ সাচ এ ড্র্যামাটিক মোমেন্ট, ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারেনি।"

একেনবাবু ছবিটা পরীক্ষা করে বললেন, "বোধহয় একটু নার্ভাসই হয়ে গিয়েছিলাম স্যার।"

"লজ্জা পেলে গিন্নিকে দেখাবেন না।" প্রমথ টিপ্পনি কাটল।

"কেন স্যার, এমন কী খারাপ হয়েছে?"

"একটুও না," আমি বললাম, "রেখে দিন যত্ন করে, বিখ্যাত লোকের সঙ্গে তোলা ছবি□ এটা তো ট্রেজার।"

একেনবাবুর এই কাহিনি পুরোদমে শুরু করার আগেই বলে রাখি, পরের ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী আমি নই। একেনবাবু কলকাতায় পৌঁছোনোর পর প্রায় প্রতিদিনই ফোনে কথা হত। উনি যা-যা ঘটেছে জানাতেন, আর মাঝেমাঝে আমাদের মতামত নিতেন। প্রমথ অবশ্য বলত "কেন ফালতু আমাদের মত নিচ্ছেন, সেটা শুনে তো আপনি চলবেন না।" একেনবাবুর উত্তর, "কী যে বলেন স্যার, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে কত যে ক্লু পাই।"

সে যাইহোক, ফোন শেষ হলেই দরকারি সূত্রগুলো আমি ডায়েরিতে লিখে রাখতাম। ঘটনাগুলো একেনবাবুর কাছে যেভাবে শুনেছি সেভাবেই লেখার চেষ্টা করছি। আমি নিজে ধারে-কাছে ছিলাম না, তাই একেনবাবুর উলটোপালটা কথা বলা, ক্ষণে ক্ষণে কনফিউসড হওয়া, কথা বলতে বলতে পা নাচিয়ে চিন্তা করা, বোকা বোকা প্রশ্ন করে আসল খবর বার করা ইত্যাদি, তেমন ভাবে লিখতে পারিনি। সেই বিচারে একেনবাবুর অন্যান্য কাহিনি থেকে এটা একটু আলাদা।

এখানে আরও একটা কথা বলি। আমার লেখার ব্যাপারে একমাত্র উৎসাহদাতা একেনবাবু। প্রমথ চিরদিনই নেগেটিভ। এবার তো আরও বেশি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস এই লেখাটা হবে নিকৃষ্টতম, একেবারেই অপাঠ্য। এক-আধ জন যাঁরা আমার বই পড়েন তাঁরা নাকি পড়েন একেনবাবুর অরিজিন্যাল ডায়ালগ আর প্রমথর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের

আকর্ষণে। আমার কৃতিত্ব একেবারেই শূন্য জিরো। আমার না আছে গল্প বলার ক্ষমতা, না আছে ভাষার ওপর দখল। আর আমার চিন্তাশক্তি তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

বাজে লিখি মানতে রাজি আছি। চিন্তাশক্তি নেই কথাটা মানা যায় না। প্রতিবাদ করতেই প্রমথ বলল, "এতদিন ধরে একেনবাবুর কাহিনি লিখছিস, একবারও মনে হয়নি পাঠককে জানানো দরকার স্বামীকে ছেড়ে একেনবউদি কেন এত বছর ধরে একা কলকাতায় পড়ে আছেন? ওঁদের কোনো ছেলেপুলে নেই যে তাদের পড়াশুনোর জন্যে কলকাতায় থাকা দরকার, একেনবউদি নিজে চাকরি করেন না যে তার জন্যে কলকাতায় থাকা প্রয়োজন... তাহলে কারণটা কী? এদিকে একেনবাবু তো তোর মুখ্য চরিত্র!"

সত্যি কথা বলতে কী, এটা আমার মাথায় আসেনি। আসলে লিখতে গিয়ে রহস্যের জটের মধ্যেই মনটা আটকে থাকে পূর্ণাঙ্গ কাহিনি রচনার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক তথ্যগুলো ঢোকানো হয় না।

"ঠিক আছে, ওটা এবার লিখে দেব।"

"কী লিখবি?"

"যা সত্যি তাই লিখব। লিখব একেনবউদি নিউ ইয়র্কে এসে থাকেন না, কারণ ওঁর মা কয়েক বছর ধরে স্ট্রোকে প্রায় শয্যাশায়ী। নার্স থাকলেও মেয়ের তত্ত্বাবধানের ওপর তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল।"

"আরও অনেক কিছু লিখতে হবে তোকে।" প্রমথ বলল।

"আর কী লিখতে হবে?"

"পারম্পর্য বলে একটা কথা আছে জানিস? যাকে বলে ধারাবাহিকতা।"

"তুই কি আমাকে বাংলা শেখাচ্ছিস?"

"শেখাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি। ক'দিন আগে তুই একটা কাহিনি লিখলি, সেখানে আমরা সবাই কলকাতায় ফিরে গেছি। এমন কী আমার সঙ্গে ফ্র্যান্সিস্কার ছাড়াছাড়ির কথাও ফলাও করে বললি। এখন সে নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নয়। মনে হচ্ছে আমরা যেন নিউ ইয়র্কেই বরাবর আছি। ফ্র্যান্সিস্কাও আমাদের সঙ্গেই আছে।"

"কিন্তু আমরা তো আবার সবাই নিউ ইয়র্কেই ফিরে এসেছি, আর ফ্র্যান্সিস্কার সঙ্গে তোর ভুল বোঝাবুঝি মিটে গেছে।"

"সেটা তুই জানিস। কিন্তু তোর পাঠকরা জানে? মনে মনে তো খুব ভাবিস, একেনবাবুর সিরিজ নিয়ে একদিন মাতামাতি হবে। মাতামাতি হবে না, হাসাহাসি হবে। একবার লিখছিস সবাই কলকাতায় ফিরে গেছে, পরের গল্পেই সবাই নিউ ইয়র্কে! এর পরের গল্পে সবাইকে কোথায় নিয়ে ফেলবি আফ্রিকায়?"

সত্যি কথা বলতে কী, আমি একবারও চিন্তা করিনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন একেনবাবুর কাহিনির মধ্যে জড়িয়ে যাবে। হ্যাঁ, কলকাতায় আমরা সবাই ফিরে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু নানা কারণে সেখানে থাকতে পারিনি। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ভালো অফার পেয়ে ফিরে এসেছি। প্রমথও অধ্যাপকের চাকরি পাওয়ায় চলে এসেছে। একেনবাবুর এবার এদেশে আসার পিছনে কলকাঠি নেড়েছিলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। মার্কিন মুলুকে একেনবাবুর পার্মানেন্ট ভিসা বা গ্রিনকার্ড পাওয়া ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট না থাকলে হত না। এই ভিসার জোরেই এখন উনি নিউ ইয়র্কে স্বনামে গোয়েন্দাগিরি করতে পারছেন।

যাইহোক, এসব এখানে লিখলাম প্রমথর তির্যক মন্তব্যের প্রত্যুত্তর দিতে। লেখা শুরু না করতেই 'একেনবাবুর নিকৃষ্টতম কাহিনি' লিখছি বলে প্রমথর যে ভবিষ্যদ্বাণী, সেটা

মানতে আমি মোটেই রাজি নই। আমার লেখা রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মতো যে নয় সে বোধটুকু আমার আছে। প্রশ্ন হল, একেনবাবুর রহস্য-উদ্ঘাটনের ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারছি কি না। সেটা পারলেই আমার শ্রম সার্থক।

আর দু-একটা কথা এখানে যোগ করে দিই। ডায়েরিতে যা আছে, তার থেকে এই কাহিনি কলেবরে অনেক বড়ো। কল্পনা-প্রসূত অনেক বর্ণনা এতে যোগ করেছি। বিশেষ করে একেনবাবু আর একেনবউদির কথোপকথন তো প্রায় পুরোটাই বানানো। ওটা যোগ করেছি কাহিনির গতি যাতে বজায় থাকে। প্রমথর মতে ওই ডায়ালগগুলোতে আমি ঝুলিয়েছি... ওগুলো নাকি চরিত্রানুগ হয়নি, বিশেষ করে একেনবউদির ক্ষেত্রে। এমন কী একেনবাবুর যে প্রতিষ্ঠিত চরিত্র সেটাও নাকি ঠিক মতো ফোটেনি! তবে কাহিনির মূল বিষয়বস্তু নিয়ে প্রমথর সমস্যা নেই, সেটাই বাঁচোয়া। ও আরেকটা কথা, বেশ কিছু চরিত্রের নাম পালটেছি। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদিতে যে অসঙ্গতি আছে সেগুলো ইচ্ছাকৃত। নাম পালটে লিখলেও পাত্রপাত্রীরা অনেকে এখনও জীবিত। তাঁদের বাসস্থান হয়তো একই আছে। সেই কথা ভেবে এছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

।। ৩।।

কলকাতায় পৌঁছে একেনবাবু প্রথমেই ওঁর পুরোনো সহকারী রাখাল দত্তের খোঁজ করলেন। কিছুদিন বাইরে বাইরে পোস্টিং-এর পর রাখাল দত্ত আবার কলকাতায় সি.আই.ডি-র দপ্তরে ফিরে এসেছেন। আছেন হিন্দুস্থান পার্কে ওঁর শ্বশুরবাড়িতে। একেনবাবুর ফোন পেয়ে রাখাল দত্ত উত্তেজিত!

"উঃ, কতদিন বাদে! বউদিকে নিয়ে আজ বিকেলে চলে আসুন স্যার, চা খেয়ে যাবেন।"

"ওটা আরেকদিন হবে ভাই, আজকে শুধু আমিই আসছি।"

একেই বলে ভাগ্য, রাখাল দত্তই তদন্ত করছেন বিকাশ সেনের কেসটা। সরকারি নিয়ম মানলে অবশ্য উনি একেনবাবুকে কিছুই জানাতে পারেন না। তবে একেনবাবুর ক্ষমতার উপর রাখাল দত্তর অগাধ ভক্তি। কেসটাও বেশ গোলমেলে। একেনবাবু যদি আন-অফিশিয়ালিও এতে মাথা খেলান, তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই।

রাখাল দত্ত জানালেন, ২২ ক্যালিবারের কোনো হ্যান্ডগান দিয়ে মাথার খুব কাছ থেকে গুলি চালিয়ে খুন করা হয়েছে। বিকাশ সেনের ঘড়ি, মানিব্যাগ, মোবাইল কিছুই পাওয়া যায়নি। খুনের সময়টা রাত ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে। রাত এগারোটা নাগাদ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সেন্ট লরেন্স স্কুলের কাছাকাছি বিকাশ সেনের মোবাইল সুইচড অফ হয়ে যায়। এর থেকে অবশ্য কোনো সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। মৃত্যুর সময় মোবাইলটা হয়তো ওঁর কাছেও ছিল না। সোনাগাছিতে যেখানে লাশ পাওয়া গেছে, সেখানে গুলির আওয়াজ কেউ শোনেনি। হ্যান্ডগানে সাইলেন্সার না থাকলে ধরে নেওয়া যায় অন্য কোথাও খুন করে মৃতদেহটা সোনাগাছিতে এনে ডাম্প করা হয়েছে। রাতে সোনাগাছি অঞ্চলে পুলিশ মাঝেমাঝেই টহল দেয়, তাই অন্য জায়গায় খুন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিকাশ সেন প্রায় ছ-ফুট লম্বা স্বাস্থ্যবান পুরুষ, একজন লোকের পক্ষে কাজটা করা সহজ হবে না।

মনে হয় একাধিক লোকই হত্যাকাণ্ডে জড়িত। সোনাগাছির কেউ বিকাশ সেনের দেহ শনাক্ত করতে পারেনি। ওই চত্বরে বিকাশ সেনের আনাগোনা ছিল না বলেই পুলিশ মনে করছে। তবে এটা ঠিক যে, নারীঘটিত ব্যাপারে বিকাশ সেন অনেকবারই জড়িয়েছেন। অফিসে নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছেন বেশ কিছুদিন। ওঁর অফিসের একজন মেয়ে অ্যাসিস্টেন্ট তো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের চার্জ এনে চাকরি ছেড়েছিল। অফিশিয়াল কমপ্লেন বলতে সেই একটাই। অফিসের পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট দায়সারা গোছের একটা এনকোয়ারি করেছিল। পুলিশকে কিছু জানায়নি। বিকাশ সেন ওয়াজ এ ভেরি চার্মিং ম্যান এবং পলিটিক্যালি ওয়েল কানেক্টেড। ওঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো অভিযোগ থাকলেও হাতেনাতে না ধরতে পারলে সেটা নিয়ে এগিয়ে কোনো লাভ হত না।

রাখাল দত্তের একটাই দোষ, কিছু বলতে শুরু করলে মাঝে মাঝে ডাইগ্রেস করে যান।

একেনবাবু ওঁকে থামিয়ে বললেন, "ওগুলো ভাই পরে ভালো করে শুনব। তার আগে বলো তো, বডিটা যেখানে পড়েছিল সেখানে এমন কি কিছু পেয়েছ, যেটা মনে কর খুনিরা ফেলে গেছে?"

"যা পেয়েছি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না... এর সঙ্গে খুনিদের কতটা যোগ আছে জানি না।"

"কী সেটা?"

"একটা কাগজ। বিকাশ সেনের শার্টের পকেটে একটা কাগজে লেখা ছিল 'your number 1/4'।"

"ও হ্যাঁ, একটা অনলাইন পত্রিকাতেও সেটা দেখলাম! বেশ মিস্টিরিয়াস।" একেনবাবু বললেন।

"হাতের লেখা নয়। অন্য কোনো কাগজ থেকে অক্ষর আর সংখ্যাগুলো কেটে আঠা দিয়ে বসানো হয়েছে।"

"বিষ চিঠি বা পয়জন লেটার যেভাবে লেখা হত?"

"এক্স্যাক্টলি। আমার প্রশ্ন স্যার, বিকাশ সেন এটা পকেটে নিয়ে ঘুরছিলেন কেন? এটা কি খুনির কাছ থেকে পেয়েছিলেন? সেক্ষেত্রে মেসেজটা কী? 1/4 সম্ভবত একটা বাড়ির নম্বর যেটা বিকাশ সেনের চেনা। এছাড়া আর কী হতে পারে? সংখ্যাগুলোকে সংখ্যা না ভেবে যদি ইংরেজি অ্যালফাবেটের পজিশন ধরি, তাহলে 1 হল 'A', 4 হল 'D', অর্থাৎ A/D। এর অর্থ তো অনেক কিছু হয় বিজনেসে অ্যাডভান্স-ডিক্লাইন লাইন, কম্পিউটারে অ্যানালগ-ডিজিট্যাল কনভার্টার। কিন্তু তার সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক?"

"A.D কি কোনো নামের আদ্যাক্ষর হতে পারে?"

"সেটাও স্যার ভেবেছি। কিন্তু তার আগে 'ইয়োর নাম্বার' বলার অর্থটা কী? পুরোটাই হেঁয়ালি।"

একেনবাবু মাথা নাড়লেন। এই হেঁয়ালির অর্থ যদি কিছু থেকেও থাকে, চট করে তার মর্মোদ্ধার সম্ভব নয়। জিজ্ঞেস করলেন, "কাগজে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?"

"না। সাধারণ কাগজ। তবে যে কাগজ থেকে সংখ্যা আর অক্ষরগুলো কেটে আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে, সেটা খুব ভালো কোয়ালিটির আশি পাউন্ড গ্লস পেপার স্টক। টাইপফেসটাও একটু আনইউস্যুয়াল ধরনের। আজকাল অনেক বিজনেস হাউস দামি কাগজে নানান ফ্যান্সি টাইপফেস ব্যবহার করে নিজেদের ম্যাগাজিন, বুলেটিন, ইত্যাদি

ছাপায়... সম্ভবত তার কোনো একটা থেকে।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং।” কেন ইন্টারেস্টিং সেটা বিশদ না করে, ঘাড়টা একটু চুলকে আগের একটা কথার খেই ধরে একেনবাবু প্রশ্ন করলেন, “আশেপাশে 1/4 নম্বরের কোনো বাড়ি পেলে কি?”

“সোনাগাছিতে 1/4 নম্বরের বাড়ি নেই। সবচেয়ে কাছে যে বাড়িটা পেয়েছি, সেটা প্রায় দু-কিলোমিটারের মত দূরে। এক বৃদ্ধা বিধবা মহিলার বাড়ি। তার সঙ্গে কথা বলে এটা পরিষ্কার ওখানে কিছু ঘটেনি।”

“দ্যাট মেক্স সেন্স। আর খুন যদি দূরে কোথাও হয়ে থাকে, তাহলে আশেপাশে খোঁজ করে লাভ নেই।”

“এক্স্যাক্টলি। আরও খোঁজ করছি, তবে মনে হচ্ছে না এটা বাড়ির নম্বর।”

একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “1/4 মানে এপ্রিল মাসের 1 তারিখ। অর্থাৎ এপ্রিল ফুলস ডে। পয়লা এপ্রিল বিকাশ সেন কি কিছু করেছিলেন, যার জন্য ওঁকে প্রাণ হারাতে হয়েছে?”

“এটা তো আমি ভাবিনি,” রাখাল দত্ত বললেন।

“একটু খোঁজখবর নাও। আমেরিকা হলে বলতাম জানুয়ারির 4 তারিখে ওঁর জীবনে কিছু ঘটেছিল কিনা খোঁজ নিতে। আমেরিকায় প্রথম সংখ্যা মাস, দ্বিতীয় সংখ্যা তারিখ।”

“ওটাও বা বাদ দিই কেন,” রাখাল দত্ত হাসতে হাসতে বললেন, “খুনিরা তো স্যার আপনার মতো এন.আর.আই-ও হতে পারে।”

“তা পারে।”

এরমধ্যে চা এসে গেল, সেই সঙ্গে মিষ্টি। একেনবাবু সরভাজা ভালোবাসেন। রাখাল দত্ত ঠিক সেটা মনে রেখেছেন। সরভাজায় একটা কামড় বসিয়ে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “ভালোকথা, পত্রিকায় মাথাফাটা রতনের কথা পড়লাম। লোকটি কে? তার সঙ্গে বিকাশবাবুর দহরম মহরমের ব্যাপারটা কী? উনি কি আর কোনো ঝামেলায় পড়েছিলেন?” একেনবাবু ইচ্ছে করেই নার্সিং হোমের ব্যাপারটা চেপে গেলেন।

“মাথাফাটা রতনের আসল নাম সুদেব কুন্ডু। হ্যাঁ, সুদেবকেও আমরা জেরা করেছি। সুদেবের বক্তব্য পত্রপত্রিকাগুলো ওর পিছনে লাগার জন্যে অকারণে ঝামেলা পাকাচ্ছে। ও যাদবপুর অঞ্চলে বাড়িজমির দালালি করে। বিকাশবাবু জমির খোঁজ করছিলেন। সেই সুবাদে কথা বলার জন্যে মাঝেমধ্যে ওকে রেস্টুরেন্টে খেতে ডাকতেন।”

“তুমি ভাই, এটা বিশ্বাস করো?”

“পুরোপুরি করি না, তবে এ নিয়ে সুদেবকে ঘাঁটাতে চাই না। পলিটিক্যাল কানেকশনের জন্যে লালবাজারের বড়ো বড়ো কর্তাদের ওপর ওর অনেক হোল্ড আছে। খামোকা হ্যারাস করছি বলে আমার কেরিয়ারের দফারফা করে ছাড়বে।”

“বুঝলাম। আমার অবশ্য এখন কেরিয়ারের সমস্যা নেই। তা তুমি এই মাথাফাটা রতন, মানে সুদেবের ঠেকটা কোথায় বলতে পারবে? ভালোকথা, নামটা তো সুদেব ‘মাথাফাটা রতন’ এল কোত্থেকে... মাথা ফেটেছিল?”

“না, ফাটিয়েছিল। কয়েক বছর আগে জায়গা দখল নিয়ে গড়িয়ার সন্তোষ গুন্ডার দলবলের সঙ্গে মারামারির সময় বেশ কয়েকটা মাথা। রতন ওর ডাকনাম।”

“আই সি। একটা প্রশ্ন ভাই, এই সুদেববাবুর সঙ্গে কি সোনাগাছির কোনো কানেকশন আছে?”

“আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের কোথায় কী কানেকশন জোর করে বলা কঠিন। এমনিতে সুদেব

মেয়েছেলে নিয়ে কারবার করে বলে তো শুনিনি, তবে হু নোজ? ঠিক নিষিদ্ধপল্লী বলতে যা বোঝায় সেটা ওর এরিয়াতে নেই। কল গার্লস আছে, সেটা কলকাতার কোথায় নেই! তবে সেখান থেকে যা রোজগার সম্ভব, তার থেকে অনেক বেশি মেলে জমিবাড়ির কারবারে।"

"সুদেববাবু কি প্রমোটারি করেন?"

"না, তবে প্রমোটারদের প্রোটেকশন দেয়। ওর রোজগারের বেশির ভাগই আসে প্রোটেকশন মানি থেকে। শুধু প্রমোটার নয়, দোকানপাট, জবর-দখলি বাড়ি সবাইকেই ও প্রোটেকশন দেয়।"

একেনবাবু মনে মনে ভাবলেন, বিকাশবাবু ঠিক লোককেই পাকড়েছিলেন। হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা এল। "আচ্ছা ভাই, বিকাশবাবুর সঙ্গে সুদেববাবুর রেস্টুরেন্টে খাওয়ার কথা বললে এটা কি অনেক দিন ধরে চলছে না ইদানীং কালের ঘটনা।"

"ইদানীং বলতে কী মিন করছেন জানি না স্যার, তবে খোঁজ যা পেয়েছি তা থেকে বলতে পারি প্রায় মাস চারেক হল।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং ভাই," একেনবাবু বললেন।

"ইন্টারেস্টিং কেন?" রাখাল দত্ত একটু অবাক হয়ে প্রশ্নটা করলেন।

একেনবাবুর মাথায় ঘুরছিল ওঁর সঙ্গে অবনী গুপ্তের নার্সিং হোম নিয়ে আলোচনা। এই নিয়ে আলোচনাটা ঘটেছিল দু-মাসও হয়নি। সুতরাং বিকাশের সঙ্গে মাথাফাটা রতনের প্রথম যোগাযোগের কারণ আর যাইহোক, নার্সিং হোম নিয়ে নয়। রাখাল দত্তকে ব্যাপারটা বলেই ফেললেন একেনবাবু।

"আমি ভেবেছিলাম একটা নার্সিং হোমের প্রোটেকশনের ব্যাপারে বিকাশবাবু সুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, সেটা তাহলে পুরো ঠিক নয়।"

"ঠিক বুঝলাম না এটা কেন বলছেন?"

"বিকাশবাবু এক নার্সিং হোমের পাবলিক রিলেশনস, প্রোমোশন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই নার্সিং হোমের মালিকের বেশ দুশ্চিন্তা ছিল ভুল চিকিৎসার অজুহাতে লোকাল গুন্ডাদের ভাঙচুর করা নিয়ে। এটা মাত্র মাস দেড়েক আগের ব্যাপার।"

"বুঝেছি, আপনি এবিজি নার্সিং হোমের কথা বলছেন নিশ্চয়। ওটা নিয়েও জল ঘোলা হয়েছে লাইসেন্স, পারমিট সংক্রান্ত ইরেগুলারিটি। বিকাশ সেন ওয়াজ এ গো-গেটার, কলকাতায় কিছু করাতে চাইলে ওই রকম লোককেই বিজনেসম্যানরা খোঁজে। আমার বিশ্বাস, সুদেব স্বীকার না করলেও নার্সিং হোম প্রোটেকশনের কথাও ওদের মধ্যে হয়েছে। আর কী হয়েছে সেটাই আমি ভাবছি। জমি, প্রমোটারি এগুলো সব ডেঞ্জারাস বিজনেস। তবে যেহেতু ওঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে সোনাগাছিতে ইট পয়েন্টস টু সামথিং এল্স।"

একেনবাবু বুঝতে পারলেন রাখাল দত্ত কী বলতে চান, তাও প্রশ্ন করলেন, "পয়েন্টস্ টু হোয়ার ভাই?"

"বিকাশ সেন সুদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন অন্য একটা কারণে। সেই ব্যাপারটাও নারীঘটিত।"

"দ্যাটস ইন্টারেস্টিং, নারীটি কে? তুমি তো বলছ সোনাগাছিতে উনি কখনোই যাননি, আর এই সুদেববাবুও নিষিদ্ধপল্লীর সঙ্গে তেমন ভাবে যুক্ত নন!"

"না, না, সোনাগাছির কেউ নয়। হয়তো কারোর সুন্দরী স্ত্রী, যার স্বামী হিংস্র ভয়ঙ্কর চরিত্রের। বিকাশ সেনের চার্মে স্ত্রীকে স্বৈরিণী হতে দেখে সহ্য করতে পারেনি, গুলি করে খতম করেছে। আর এই লোকটির হাত থেকে বাঁচতেই বিকাশ সেন হয়তো সুদেবের

সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, পুলিশের সাহায্য তো এ ব্যাপারে চাওয়া যায় না।"

"সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু রাগের মাথায় খুন করে লাশটা বয়ে নিয়ে সোনাগাছিতে ফেলে রাখা...।"

"হয়তো সুপারি কিলার দিয়ে খুন করিয়েছে। লাশটা সোনাগাছিতে ফেলার পিছনে একটা মেসেজ রয়েছে। শুধু খুন করে রাগ মেটানো নয়, বিকাশ সেনের চরিত্রও পাবলিকলি হনন করা হল।"

"ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট ভাই।" একেনবাবু স্বীকার করলেন।

"বিকাশ সেনের যা ট্র্যাক রেকর্ড, তাতে এটা ঘটা বিচিত্র নয়। সম্প্রতি কোনো মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল কিনা তারই খোঁজখবর এখন নিচ্ছি। অ্যাট লিস্ট এটা একটা অ্যাঙ্গেল যেটা ফলো করা যেতে পারে। ঠিক কিনা?"

"অবশ্যই এটা ফলো করার মতো অ্যাঙ্গেল। সুপারি কিলার দিয়ে খুন করানোর প্রসঙ্গে আরেকটা সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায় না। বিকাশবাবুর লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসির অঙ্কটা কত?"

"বিশাল। প্রায় আড়াই কোটি টাকা।"

"ওঁর স্ত্রী কি...?"

একেনবাবু কথাটা শেষ করতে পারলেন না। রাখালবাবু বললেন, "সেদিকটাও দেখছি। স্বামীর পরনারী আসক্তি সহ্য করতে না পেরে তাকে হত্যা করিয়ে ইন্সিওরেন্স ক্লেম করার ঘটনাও আগে ঘটেছে।"

এর পর মিসেস দত্ত গল্প করতে এলেন, ফলে এ নিয়ে আর কোনো কথা হল না। বাড়ি ফেরার আগে একেনবাবু মাথাফাটা রতনের ঠেকটা কোথায় সেটা রাখাল দত্তের কাছ থেকে জেনে নিলেন। বিকাশবাবুর বাড়ির ঠিকানা অবনী গুপ্ত দিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা রাখাল দত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে একটা ভুল পাওয়া গেল। ডাঃ গুপ্ত বলেছিলেন ২৪ কেয়াতলা লেন, আসলে হবে ২৪ কেয়াতলা বাইলেন। ফোন নম্বরটা অবশ্য ডাঃ গুপ্ত ঠিকই দিয়েছিলেন।

।। ৪ ।।

একেনবাবুকে ডাঃ গুপ্ত বার বার বলেছিলেন কলকাতায় গিয়েই বিকাশ সেনের স্ত্রী মনীষা সেনের সঙ্গে দেখা করতে। সমবেদনা জানানো ছাড়াও ডাঃ গুপ্ত যে সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত সে কথা জানাতে। কলকাতার নার্সিং হোম-এ মিসেস সেনের জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা যে থাকবে সেটাও ডাঃ গুপ্ত একাধিক বার জানাতে বলেছেন। সমবেদনা জানানোর ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই। তবে চাকরির কথা একেনবাবু কখনোই বিকাশবাবুর স্ত্রীকে বলতে পারেন না। তিনি তো আর চাকরিদাতা নন। ডাঃ গুপ্ত আবেগের বশে যা বলেছেন, তা কয়েক মাস বাদে মনে রাখবেন কিনা স্থিরতা নেই। খামোখা একেনবাবু সেটা বলতে যাবেন কেন? তবে বিকাশ সেনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাটা খুবই প্রয়োজনীয়। একবার কেন, একাধিক বার দরকার হতে পারে।

একেনবাবু ফোন করলেন। মনীষা সেন নিজেই ফোন ধরেছিলেন। একেনবাবুর কথা তিনি ডাঃ গুপ্তের কাছে শুনেছেন। একেনবাবু দেখা করতে চান জেনে বললেন বাড়িতেই

থাকবেন, তবে বিকেল পাঁচটা বা পাঁচটার একটু পরে এলে সুবিধা হয়।

একেনবাবু সেই মতন পাঁচটা নাগাদই গেলেন।

চারতলা বাড়ি। সিঁড়িতে ঢোকার মুখে দারোয়ান গোছের একটা লোক টুলে বসে পত্রিকা পড়ছিল। বিকাশ সেনের নাম বলাতে কোনো কথা না বলে উপরের দিকে আঙুল তুলে আবার পাঠে মনঃসংযোগ করল। চমৎকার সিকিউরিটি!

দোতলা, তিনতলা, চারতলা তিনটেই তো উপরের দিকে। লিফটের বোতাম টিপে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লোকটাকে। "কোন তলায়?"

উত্তর পাবার আগেই লেটার-বক্সগুলোর দিকে একেনবাবুর চোখ পড়ল। বিকাশ সেন, ১-এ। তারমানে দোতলা। লিফট নেমে আসার অপেক্ষা না করে সিঁড়ি ভেঙেই উঠলেন। দোতলায় তিনটে দরজা। তার একটাতে ১-এ দেখে বেল বাজালেন। কমবয়সি একটি কাজের মেয়ে এসে দরজা খুলল। তার পিছনে বয়স্কা এক মহিলা। একেনবাবু নিজের নাম বলতেই বললেন, "আসুন, বেবিকে ডেকে দিচ্ছি।"

বাইরের ঘরটা বেশ বড়ো। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা সোফা। সামনে জাম্বো সাইজের কফি টেবিল। তার একপাশে লাভ-সিট, অন্যদিকে ম্যাচিং চেয়ার। তিন দেয়ালে তিনটে ছবি টাঙানো। একটা মনে হল অয়েল পেন্টিং, অন্য দুটো অ্যাক্রিলিক বা অন্য কিছু দিয়ে আঁকা। কফি টেবিলে কাপ-ডিশের ছড়াছড়ি। নিশ্চয় বহুলোকের আনাগোনা চলছে। শোকের মধ্যেও আপ্যায়নের জন্যে চা-বিস্কুট দিতে হয়।

রাস্তার দিকের জানলার পাশে দুটো বেতের চেয়ার। তার একটাতে কাঁচাপাকা চুলের এক বয়স্ক ভদ্রলোক বসে বই পড়ছিলেন। ভদ্রলোকের চেহারাতে বেশ একটা আভিজাত্য আছে। উঠে এসে একেনবাবুকে বসতে বললেন। মনীষার বাবা। ওঁর সঙ্গে একেনবাবুর দু-একটা কথাও হল। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন মেয়ে আর নাতি-নাতনিদের সামলাতে। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল ডাঃ গুপ্তকে মনীষার বাবা ভালো করেই চেনেন। উনি যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়াতেন, তখন ডাঃ গুপ্ত ছাত্র ছিলেন। এখন আর পড়ান না, রিটায়ার করেছেন। কয়েক বছর আগে পড়ানো, রোগী দেখা ইত্যাদি থেকে ছুটি নিয়ে শেষ জীবনটা শান্তিনিকেতনে নিরিবিলিতে কাটাতে গিয়েছিলেন। বিকাশ সেনের মৃত্যুতে সেটায় ছেদ পড়েছে। মনীষা ওঁদের একমাত্র সন্তান। জীবনটা এক খাতে বইছিল, এখন কিছুটা পরিবর্তন হতে বাধ্য।

এইসব কথাবার্তার মাঝে মনীষা এলেন। বয়স তিরিশের কোঠায়, চমৎকার ফিগার। ক'দিনের অযত্নে চুলগুলো রুক্ষ। অগোছালো শাড়ি, চোখের লাল ঢাকার জন্যে ঘরের মধ্যেই কালো চশমা পরে আছেন। মুখটা ম্লান, কিন্তু নিঃসন্দেহে সুন্দরী। এমন সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বিকাশবাবুর পরনারী আসক্তিটা একেনবাবুর কেমন জানি লাগল। কাম সত্যি আদিম রিপু। যুক্তি-বুদ্ধি-সংস্কার কিছুই মানে না।

একেনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নমস্কার ম্যাডাম, এ ভাবে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে খুব খারাপ লাগছে।"

"বিরক্তির কি আছে, আপনি বসুন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।" একেনবাবু বসতে বসতে বললেন, "ডাঃ গুপ্ত বিশেষ করে আমাকে বলেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করে ওঁর সমবেদনা জানাতে।"

মনীষা মৃদুস্বরে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

একেনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, "যিনি গেছেন ম্যাডাম, তাঁকে ফিরিয়ে আনা

যাবে না। যেটা বলতে চাই, আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরাধীদের খুঁজে বার করার ব্যাপারে সাহায্য করতে।”

“আমি জানি।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। এই নিয়ে কি দু-একটা প্রশ্ন করতে পারি?”

“কী প্রশ্ন, বলুন?”

“আপনার কি ম্যাডাম কাউকে সন্দেহ হয়? মানে কাউকে কি আপনি জানেন যিনি আপনার স্বামীর শত্রু ছিলেন?”

“না, তেমন কেউ ছিল বলে তো আমি জানি না। পরিচিত যাদের আমি চিনি সবাই ওর বন্ধু।” তারপর একটু থেমে বললেন, “পত্র-পত্রিকায় তো ওকে নিয়ে শুধু নোংরামি চলছে, কিন্তু সেটা আসল বিকাশ নয়...” বলতে বলতে মনীষা সেনের গলা প্রায় বুজে এল।

“ম্যাডাম, ওগুলো থাক। ওসব বেশির ভাগই বানানো।”

একেনবাবুর কথা মনীষা সেনের কানে ঢুকল না। উনি বলে চললেন, “বিকাশ ওয়াজ ভেরি হ্যান্ডসাম এন্ড চার্মিং, আই ক্যান ইম্যাজিন অনেকেই হয়তো ওর কাছে আসার চেষ্টা করেছে, বাট হি ওনলি কেয়ারড ফর মি এন্ড হিজ চিলড্রেন।”

“আই অ্যাম শিওর ম্যাডাম। আপনি শুধু বলুন, রিসেন্টলি ওঁকে কি আপনি কোনো ব্যাপারে চিন্তিত দেখেছিলেন? অচেনা কোনো লোক কি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বা ফোন করেছিলেন কিছুদিনের মধ্যে?”

“না, সে-রকম তো কিছু মনে পড়ছে না।”

“যে-দিন উনি মারা যান, সেদিন ওঁর রুটিন কি নর্মাল ছিল?”

“হ্যাঁ। যে-রকম সকালে বেরোয় সে-রকমই বেরিয়েছিল। ফিরতে ফিরতে অনেক সময় রাত হয়, অফিশিয়াল কোনো ডিনার থাকলে সেটা সেরে বাড়ি ফেরে। সেদিনও ওর একটা ডিনার ছিল।”

“কোথায় ডিনার করার কথা ছিল জানতেন?”

“না, পুলিশ খোঁজ নিয়ে জেনেছে পার্ক স্ট্রিটের পিটার ক্যাট-এ।”

“রাতে আর কোনো ফোন পাননি?”

“না, এসবই আমি পুলিশকে বলেছি।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আমি ওদের কাছেই জেনে নেব, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। তবে আমার নম্বরটা আপনি রেখে দিন।” বলে একেনবাবু ওঁর কার্ড বার করে তার পিছনে কলকাতার ফোন নম্বরটা লিখে দিলেন।

মনীষা কার্ডটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললেন, “আপনি নিউ ইয়র্কেই থাকেন?”

“হ্যাঁ, ম্যাডাম। শুধু এই কাজের জন্যেই আমি কলকাতায় এসেছি। পুলিশ তাদের রুটিন কাজ করছে। ডাঃ গুপ্ত চান আমি প্রাইভেটলি ব্যাপারটার তদন্ত করি।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।”

“চলি ম্যাডাম, যদি হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় আমাকে জানাবেন। ও হ্যাঁ,” যেতে গিয়েও একেনবাবু থামলেন, “এপ্রিল মাসের এক তারিখে এমন কি কোনো ঘটনা ঘটেছিল যেটা বলার মতন?”

মনীষা অবাক হয়ে তাকালেন। “না, সে-রকম কিছু তো মনে পড়ছে না! কেন বলুন তো?”

“এমনি ম্যাডাম।” মনীষা সেনকে কিছুটা হতভম্ব অবস্থায় রেখে একেনবাবু বিদায়

নিলেন।

ঠিক নতুন কোনো তথ্য পাবার আশা একেনবাবু করেননি। তবে একটা চিন্তা মাথায় নিয়ে ফিরলেন। বিকাশবাবুর মৃত্যুতে ইন্সিওরেন্সের কাছ থেকে মনীষা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পাবেন এই তথ্যটা জানা ছিল। যেটা জানা ছিল না, সেটা হল মনীষা এত সুন্দরী! এই রকম অসামান্য সুন্দরীর প্রেমে কি কেউ পড়েনি? মনীষা কি তাতে সাড়া দিয়েছেন? ওঁর কি কোনো প্রেমিক আছে? টাকা ছাড়াও খুনের সঙ্গে অবৈধ প্রেমেরও যোগ থাকতে পারে। রাখাল নিশ্চয় এটা নিয়েও খোঁজখবর করছে।

বাড়ি ফিরে একেনবউদিকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেলেন একেনবাবু। বউয়ের ইচ্ছেতেই যেতে হল। একেনবউদির থিয়েটার দেখার নেশা। একেনবাবুর আবার থিয়েটার দেখতে বসলেই ঘুম পেতে শুরু করে। তার ওপর জেটল্যাগ। এসে অবধি সাতটা বাজতে না বাজতে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙে যাচ্ছে ভোর চারটেরও আগে। পুরো থিয়েটারটা প্রায় চোখ বুজেই কাটালেন। ফিরে এসে ঘুম ঘুম চোখে খাচ্ছেন, একটা ফোন।

একেনবউদি বললেন, "তোমার সঙ্গে ব্রজেন রায় বলে কেউ কথা বলতে চান।"

ব্রজেন রায়! ভদ্রলোকটি কে? একেনবাবু মনে করতে পারলেন না। 'হ্যালো' বলার পর যখন শুনলেন, 'বেবির কাছ থেকে আপনার নম্বরটা পেয়েছি' বুঝলেন, নিশ্চয় মনীষার বাবা।

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি স্যার মনীষা ম্যাডামের বাবা?"

"হ্যাঁ।"

"বলুন স্যার।"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"আমার সঙ্গে? নিশ্চয় স্যার, কবে আপনাদের বাড়িতে আসব বলুন?"

"না, বাড়িতে নয়, আমি সকালে রবীন্দ্র সরোবরে একটু বেড়াই। ওখানে কাল সকাল সাতটা নাগাদ আসতে পারবেন? ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিংস সোসাইটির সামনে?"

"আসব, স্যার।"

সাতটায় লেকে পৌঁছোনো একেনবাবুর পক্ষে কোনো সমস্যা নয়। উনি শুধু ভাবছিলেন কী এমন কথা যেটা মনীষার বাবা বাড়িতে বলতে চান না!

"কার ফোন?" একেনবউদির প্রশ্ন।

"মনীষা ম্যাডামের বাবার।"

বিকাশ সেনের সুন্দরী স্ত্রী মনীষার কথা একেনবউদি শুনেছেন। বিকাশ সেন প্রসঙ্গে পত্রিকাতেও নামটা দেখেছেন। "তোমার সঙ্গে ওঁর কী দরকার?"

"নো ক্লু ম্যাডাম, নো ক্লু।"

"ফাজলামি রাখো, তোমার ওই মনীষা সেনকেই ম্যাডাম বোলো, আমাকে বলতে হবে না।"

"রাইট," বলে একেনবাবু দাঁত মাজতে গেলেন। বেসুরো গলায় একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে হঠাৎ থেমে বললেন, "বুঝলে মিনু (মিনতি একেনবউদির ভালো নাম আগে হয়তো এটা কোথাও লিখিনি), ভাগ্যিস তুমি খুব সুন্দরী নও।"

একেনবউদি একটা পান মুখে পুরতে যাচ্ছিলেন। স্বামীর এসব বকবকানিতে একেনবউদি তেমন কান দেন না। আজ অবশ্য বললেন, "এতদিন বাদে কি সেই নিয়ে আফশোস হচ্ছে?"

"আহা, কী মুশকিল, সেইজন্যেই তো 'ভাগ্যিস' বললাম!"

"কী যে তোমার মাথায় ঘোরে কে জানে! না হয় আমি সুন্দরী নই, যদি সুন্দরী হতাম, তাহলে কি তোমায় বিয়ে করতাম!"

"তা ঠিক, তা ঠিক।" মাথা নাড়লেন একেনবাবু! "তেমন সুন্দরী হলে, তোমার অনেক প্রেমিক জুটে যেত, আমিও হয়তো খুন হয়ে যেতাম।"

"যত সব বাজে কথা! বাপিবাবু, প্রমথবাবু ঠিকই বলেন, মাথাটা তোমার গেছে!" একেনবউদি মুখে পান দিলেন।

"পসিবিলিটি, বুঝলে মিনু পসিবিলিটি। টু মেনি পসিবিলিটিজ, ভেরি কনফিউসিং।"

"বুঝলাম, এবার শুয়ে পড়ো। আমিও নিশ্চিন্তে বসে একটু টিভি দেখি।"

"কেন ম্যাডাম, আমি জেগে থাকলে কি টিভি দেখা যায় না?"

"না, যায় না, বকবক করে কান ঝালাপালা করো!"

"গুড নাইট," বলে একেনবাবু শুতে গেলেন। বিছানায় শোয়ার আগে ড্রাইভারকে ফোন করে সাড়ে ছ'টা নাগাদ আসতে বললেন। ছেলেটা ভালো, যখনই আসতে বলেন এসে হাজির হয়।

।। ৫।।

ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি রবীন্দ্র সরোবরের এক প্রান্তে। গোলপার্ক দিয়ে রবীন্দ্র সরোবরের দিকে গেলে রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল সেন্টারের পরে আসে সাউথ এন্ড পার্কে ঢোকার রাস্তা। তার সঙ্গে প্রায় লাগোয়া যে রাস্তাটা রবীন্দ্র সরোবরের দিকে গেছে সেটা একটু বাদেই আলাদা হয়ে দু-দিকে চলে গেছে। বাঁ-দিকের রাস্তা দিয়ে দুশো গজের মতন গেলেই ক্লাবটা ডানদিকে পড়বে। কলকাতায় এসে ছুটোছুটি করতে হবে বলে একেনবাবু দু-সপ্তাহের জন্যে একটা ভাড়ার গাড়ি নিয়েছেন। গ্যাঁটের পয়সা খরচা করে কখনোই নিতেন না। নিয়েছেন পরস্মৈপদী বলে ডাঃ গুপ্তের কলকাতা অফিস বিল মেটাচ্ছে।

গাড়িটা রবীন্দ্র সরোবরে ঢুকতেই একেনবাবু ব্রজেন রায়কে দেখতে পেলেন। রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছেন। ড্রাইভারকে কাছাকাছি কোথাও পার্ক করতে বলে একেনবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন।

ব্রজেন রায় বেশ অন্যমনস্ক। একেনবাবু কাছে আসা সত্ত্বেও দেখতে পেলেন না।

"নমস্কার স্যার।"

ব্রজেনবাবু সচকিত হয়ে হাতের ঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন, "ও আপনি এসে গেছেন! এর মধ্যেই যে সাতটা বেজে গেছে বুঝিনি। চলুন, কোথাও গিয়ে বসা যাক।"

একেনবাবু এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছেন দেখে বললেন, "ক্লাবের ওদিকে কতগুলো বেঞ্চি আছে, সকালে হাঁটতে এসে মাঝে মাঝে ওখানে বসে একটু জিরিয়ে নিই। বেঞ্চিগুলো এই সময়ে ফাঁকাই থাকে। সেখানে গিয়ে বসবেন?"

"বেশ তো স্যার, চলুন।"

"আপনি হয়তো ভাবছেন, বাড়িতে না দেখা করে এখানে কেন আসতে বললাম।"

হাঁটতে হাঁটতে বললেন ডাঃ ব্রজেন রায়।

"তা একটু ভাবছিলাম স্যার। নিশ্চয় কথা বলতে এখানে সুবিধা হবে বলেই ডেকেছেন।"

"এক্স্যাক্টলি। আমি চাই না মনীষা বা মনীষার মা কথাগুলো শুনুক। নাতিনাতনিরাও এখন অনেক কিছু বোঝে।"

"তা তো বটেই স্যার।"

"ব্যাপারটা কী জানেন, কতগুলো জিনিস আপনার জানা দরকার। মনীষা সেগুলো বলতে পারবে না, কারণ ও নিজেও অনেক কিছু জানে না। যদি জেনেও থাকে, মন থেকে সেগুলো মানে না। বুঝতে পারছেন কি বলছি?"

"আপনার পয়েন্টগুলো বুঝতে পারছি স্যার, তবে ব্যাপারটা নয়।"

"সেটা স্বাভাবিক, কারণ সেটা আপনাকে এখনও বলিনি।"

"রাইট স্যার।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাঃ ব্রজেন রায় বললেন, "বিকাশকে নিয়ে এখন যে সব কেচ্ছা-কাহিনি বেরোচ্ছে তার বেশির ভাগই হয়তো বানানো। খুনের পর যেটা এখন চলছে, সেটা হল ওর ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশন। তবে এটাও ঠিক, ও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল না। কয়েকবার নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে ঝামেলা বাধিয়েছিল। একবার আমাকেও তার জট কাটাতে হয়েছিল□ মনীষা সে ঘটনার কথা জানেও না।"

হঠাৎ কথা থামিয়ে কী জানি একটু ভাবলেন ব্রজেন রায়। দু-চার পা আরও এগোনোর পরে বললেন, "আসল ব্যাপার কী জানো," বলেই একটু লজ্জা পেলেন, "এই দেখুন, আপনাকে 'তুমি' বলে ফেললাম।"

"কী যে বলেন স্যার, তুমি করেই তো বলবেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। কী করব, আমার একমাত্র মেয়ের স্বামী□ তাকে তো ফেলে দিতে পারি না! আসলে বিকাশকে নিয়ে আমি একটা গিল্টি কমপ্লেক্সে ভুগছি।"

"গিল্টি কমপ্লেক্স স্যার!" একেনবাবু বিস্মিত হয়ে তাকালেন।

"হ্যাঁ। বিকাশের সঙ্গে মনীষার বিয়ে দিয়েছিলাম অনেকটা জোর করেই। বছর চোদ্দ আগে, বিকাশ তখন সবে এম.বি.এ পাশ করে একটা ব্যাঙ্কে কাজ করছিল অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ হিসেবে। সাধারণ ফ্যামিলির ছেলে, কিন্তু ওর মধ্যে আমি একটা স্পার্ক দেখেছিলাম। আমার ভায়রার বিয়েটাতে আপত্তি ছিল। ও রাঁচিতে থাকত, ওদের কিছুটা চিনত। বিকাশ যখন স্কুল বা কলেজে পড়ে তখন কোনো একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। আমার শালি, স্ত্রী□ সবাই ভায়রার পক্ষ নিয়েছিল। আমিই ওদের আপত্তি কানে তুলিনি। ওসব ছেলেবেলার ব্যাপার। ছেলেবেলায় আমিও কিছু ধোয়া তুলসী পাতা ছিলাম না। ব্রাইট ছেলে, সুন্দর চেহারা, ভালো কেরিয়ার□ আমার সুন্দরী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। এখন বুঝছি মর্নিং শোজ দ্য ডে। মেয়েটা যে এখন এত কষ্ট পাচ্ছে, আমারই গোঁয়ার্তুমির ফল।"

"একটা কথা বলব স্যার..."

"কী?"

"পত্র-পত্রিকার খবরগুলোর তেমন মূল্য নেই। বিকাশবাবুর হত্যাকারী কে এখনও আমরা জানি না। আপনি স্যার অনেক কিছু কল্পনা করে খামোখা কষ্ট পাচ্ছেন।"

"তুমি তাই বলছ?" আন্তরিক ভাবেই প্রশ্নটা করলেন ব্রজেন রায়।

"হ্যাঁ, স্যার।"

একেনবাবুর কথায় কতটা আশ্বস্ত হলেন ব্রজেন রায় বলা শক্ত। এরমধ্যে একটা ফাঁকা বেঞ্চি পেয়ে দু-জনে বসলেন।

"একটা কথা স্যার, আমি মনীষা ম্যাডামকে বলার সুযোগ পাইনি। ডাঃ গুপ্ত আমাকে বলতে বলেছিলেন যে, ওঁর নার্সিং হোম-এ মনীষা ম্যাডামের জন্যে উপযুক্ত একটা পদ উনি রেখে দেবেন। আর কিছু না হোক স্যার, ফাইনানশিয়াল ব্যাপারটা তো উপেক্ষা করা যায় না।"

"তা যায় না।"

"ভালো কথা স্যার, বিকাশবাবুর লাইফ ইন্সিওরেন্স নিশ্চয় কিছুটা ছিল?"

ব্রজেন রায় কথাটার উত্তর দিলেন না। বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিলেন। একেনবাবু সূত্রটা আবার ধরিয়ে দিলেন। "মনীষা ম্যাডামের এখন যা মানসিক অবস্থা, টাকাকড়ির কথা মনে না আসাই স্বাভাবিক। ধরে নিচ্ছি স্যার, আপনি বা আর কেউ ইন্সিওরেন্সের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এসবে তো সময় লাগে।"

"ও হ্যাঁ, এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে," ব্রজেন রায় বললেন। "ও আমার একমাত্র সন্তান, টাকাকড়ির জন্যে ওর কোনো সমস্যা হবে না।"

"তা তো বটেই স্যার।"

"আপনাকে আমি সাতসকালে ডাকলাম, তার কারণ এক ভদ্রলোকের আজ সাড়ে আটটার সময় আসার কথা আছে," বলে ঘড়ির দিকে তাকালেন ব্রজেন রায়।

"তাহলে চলুন স্যার, যাওয়া যাক। আপনার গাড়ি আছে সঙ্গে?"

"না, এইটুকু পথ, হেঁটেই এসেছি।"

"দাঁড়ান স্যার, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।" বলে ড্রাইভারকে মোবাইলে ধরলেন একেনবাবু। কাছেই ছিল সে। ব্রজেন রায়কে ওঁর বাড়িতে নামিয়ে এলোমেলো চিন্তা শুরু হল। ব্রজেন রায় হঠাৎ এই কথাগুলো বলার জন্য সাতসকালে কেন ডাকলেন? অকারণে নিশ্চয় নয়! আরও কিছু হয়তো ওঁর মাথায় ছিল, শেষ পর্যন্ত বলেননি। কী হতে পারে সেটা? নাঃ, কিছুই মাথায় এল না...।

পাড়ার মোড়ে যখন গাড়িটা ঘুরছে, তখন দেখলেন গোবিন্দের দোকানে হিং-এর কচুরি ভাজা হচ্ছে। গাড়িটা থামাতে বলে একেনবউদিকে ফোন করলেন। "কচুরি নিয়ে আসছি, ব্রেকফাস্ট বানাতে যেও না।"

কচুরি একেনবউদির প্রিয়। ওই একটা জিনিস কিনলে, ঝামেলা হবার চান্স নেই। বাড়িতে নানান রকমের জিনিস রান্না করলেও, কচুরি একেনবউদি করেন না। গোবিন্দের দোকান থেকেই সেটা আসে। সকালের খাওয়া অনেক সময়েই কচুরি আর চা দিয়ে সারা হয়। আজকের এই কচুরি খাওয়াটা অবশ্য 'আনপ্ল্যানড', কারণ একেনবাবু বাড়ি ফেরার সময়টা ছিল অনিশ্চিত।

ড্রাইভারকে বিকেলে আসতে বলে গাড়িটা ছেড়ে দিলেন একেনবাবু।

কচুরি খেতে খেতেও ব্রজেনবাবুর কথাই মাথায় ঘুরছিল।

"কী এত ভাবছ?" একেনবউদি জিজ্ঞেস করলেন।

"বুঝলে মিনু, ভেরি কনফিউসিং।"

"কী কনফিউসিং?"

"এই রবীন্দ্র সরোবরে আসতে বলে দু-চার মিনিটে কথা সারা।"

"উনি বুড়ো মানুষ, অতশত কি ভেবেছেন?"

"ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট, ভেরি গুড পয়েন্ট," একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। "তাও একটু কনফিউসিং।"

"কী বললেন উনি?"

একেনবাবুর কাছে ব্যাপারটা শুনে একেনবউদি বললেন, "মানুষের মনে যখন দুঃখভার চাপে তখন কাউকে বলে বুক হালকা করতে হয়। উনি তাই করেছেন। অত হিসেব করেননি কতটা পেট্রল পুড়িয়ে তুমি ওখানে গিয়েছ।"

"না, তোমরা মেয়েরাই এসব ফাইন ব্যাপারগুলো ভালো বোঝো।" একেনবাবু মানলেন। "আই ওয়াজ কনফিউসড, কারণ উনি একজন বড়ো ডাক্তার ছিলেন, ইন্ট্যালিজেন্ট ম্যান।"

"ইন্ট্যালিজেন্ট লোকদের কি দুঃখকষ্ট হতে নেই?"

"না মিনু, ইউ উইন।" বলে একেনবাবু খবরের কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পড়তে বসলেন। একটু বাদেই রাখাল দত্তের ফোন।

"দুটো খবর আছে স্যার। সেগুলো চা খেতে খেতে বললেই ভালো হয়। বউদি কি রাগ করবেন চা চাইলে?"

"কী যে বল তুমি! আর ভাই পুলিশে চাকরি করতে গেলে অত ভয় করলে কি চলে? চলে এসো।"

"আপনার বাড়ির কাছেই আছি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আসছি।"

ফোনটা নামিয়ে একেনবাবু পত্রিকার পাতা উলটোতে উলটোতে চেঁচিয়ে বললেন, "মিনু এক্ষুনি রাখাল আসছে, চা খাবে।"

"এক্ষুনি মানে?"

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

রাখাল দত্ত ঘরে ঢুকে বললেন, "বেশিক্ষণ বসতে পারব না স্যার, ডিসি একটা মিটিং ডেকেছেন। তাও ভাবলাম খবর দুটো আপনাকে দিয়েই যাই।"

"কী খবর?"

"এক নম্বর হল, বিকাশ সেন ওয়াজ ইনভলভড উইথ এ কল গার্ল। ইন ফ্যাক্ট, দ্যাট গার্ল গট প্রেগনেন্ট। বিকাশ সেন কুড ভেরি ওয়েল বি দ্য ফাদার।"

এই ধরনের কোনো খবর দিতে হলে রাখাল দত্ত ইংরেজিতেই দেয়, বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে অসুবিধা বোধ করে।

"তা তোমার এই কল গার্লটি কে?"

"মক্ষিরানির নাম মল্লিকা। মাথাফাটা রতনের খাস তালুক, মানে যাদবপুর এরিয়াতে থাকে। বিকাশবাবুর সঙ্গে মাথাফাটা রতনের ইদানীং এই মাখামাখির মূলে হয়তো এটাই। এনিওয়ে আমার লোক গেছে খোঁজখবর করতে। ডিটেলস পেলেই আপনাকে জানাব।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং, আর দ্বিতীয় খবরটা?"

"বিকাশের স্ত্রী মনীষা হ্যাড এ বয়-ফ্রেন্ড। শুধু চেনাজানার ব্যাপার নয়। অন্তরঙ্গতাটা একটু বেশি।"

"এটাও তো দারুণ খবর!"

"এক্স্যাক্টলি। আমরা ইন্সিওরেন্সের অ্যাঙ্গেলটা দেখতে একটু এগোচ্ছিলাম, তখনই বার হল। বিকাশ আগে যে কোম্পানিতে কাজ করতেন, সেখানকার একজন এক্সিকিউটিভ

শেখর চৌধুরীর সঙ্গে মনীষা সেনের একটা সম্পর্ক আছে। শেখর চৌধুরী এখন দিল্লিতে পোস্টেড। কলকাতায় আলিপুরে এলে ফাইভ স্টার হোটেলে ওঠেন। সেখানে মনীষা সেন শেখর চৌধুরীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রাতও কাটিয়েছেন।"

"মাই গুডনেস! আর ইউ শিওর?"

"অ্যাবসলুটলি। হোটেলের সিকিউরিটি ক্যামেরায় ওদের একসঙ্গে রাতে ঢুকতে দেখা গেছে আর সকালেও বেরিয়েছেন একসঙ্গে। রিসেপশানিস্টদের একজন ছবি দেখে মনীষা সেনকে আইডেন্টিফাইও করেছে শেখর চৌধুরীর সঙ্গিনী বলে।"

"আজ সকালের ব্যাপারটা তাহলে একটু যেন পরিষ্কার হচ্ছে," একেনবাবু পা নাচাতে নাচাতে বললেন।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে, সেই সঙ্গে নিমকি আর সন্দেশ। ওগুলো একেনবউদি বাড়িতে সব সময়েই মজুত রাখেন।

"সকালের ব্যাপারটা কী?" চায়ে চুমুক দিয়ে একেনবাবুর দিকে সপ্রশ্নে তাকালেন রাখাল দত্ত।

"আজ সকালে মনীষা ম্যাডামের বাবা ডাঃ ব্রজেন রায় আমাকে ডেকেছিলেন। বাড়িতে নয়, রবীন্দ্র সরোবরে একটা ক্লাবের কাছে। বিকাশ সেন যে ছোটোবেলা থেকেই দুশ্চরিত্র লোক সেটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনাচ্ছিলেন। আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কেন? কেন নিজের জামাই সম্পর্কে এসব কথা একজন অজানা, অচেনা লোককে অযাচিত ভাবে উনি শোনালেন। নাউ ইট মেকস সেন্স। উনি বোধহয় নিজের মেয়েকেও কিছুটা সন্দেহ করেন। তাই আমাদের ফোকাসটা যেন শুধু বিকাশের ওপরেই থাকে তারই চেষ্টা।"

"বলেন কি স্যার, আমি একটু অবাকই হচ্ছি! ডাঃ রায় এক সময়ে মেডিক্যাল কলেজে পড়াতেন। ভালো কার্ডিওলজিস্ট বলে নাম আছে। এখন বোধহয় পেশেন্ট আর দেখেন না। যখন সোদপুরে পোস্টেড ছিলাম, তখন একবার বাবার হার্টের সমস্যা হওয়ায় ওঁর কাছে বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। খুব ভদ্র ব্যবহার। একজন ভালো, অনেস্ট ডাক্তার হিসেবে সুখ্যাতিই শুধু শুনেছি।"

"স্নেহ অতি বিষম বস্তু ভাই।"

"এখন আপনার প্ল্যান কী স্যার?"

"ভাবছি, তোমাদের সুদেব কুন্ডু, মানে মাথাফাটা রতনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করব। তবে তোমার রেফারেন্স পেলে বোধহয় ভালো হয়।"

"আমি বলে দেব। তবে সাবধান স্যার। আপনাকে আর কী বলব, একটু সাবধানে ডিল করবেন।"

"তা তো বটেই। পারলে আজকেই খবর পাঠিও। আমি কাল সকালের দিকে ওকে ধরার চেষ্টা করব।"

"ঠিক আছে।"

"আরকটা কাজ তুমি করতে পারবে? এটা কিন্তু সময় লাগবে।"

"বলুন না স্যার।"

"বিকাশ সেন যখন রাঁচিতে স্কুল বা কলেজে পড়ে তখন কোনো একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। ধরে নিচ্ছি সেটা নারীঘটিত... সেটা সম্পর্কে যদি কোনো খবর জোগাড় করতে পারো।"

"পুলিশ কেস-এর ব্যাপার?"

"তা জানি না।"

"সেটা না হলে এই খবর কি আর পাওয়া যাবে! তাও খোঁজ করব স্যার। অর্ধেন্দুদার বাড়ি রাঁচিতে, ওঁর অনেক কানেকশন আছে। ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি□ যদি কিছু জোগাড় করতে পারেন।"

অর্ধেন্দুদাকে একেনবাবু চিনতেন। সাব-ইন্সপেক্টর থেকে প্রমোশন পেয়ে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার হয়ে অবসর নিয়েছেন।

রাখাল দত্ত চলে যাবার পর একেনবউদি বললেন, "তুমি এখন আর পুলিশে চাকরি কর না, পিছনে বিশাল পুলিশ বাহিনী নেই। তার ওপর এখানে ওঁরাও (ওঁরা মানে আমি আর প্রমথ) সঙ্গে নেই, তুমি একা একা এসব গুন্ডা-লোকদের কাছে যাচ্ছ কেন?" (এই কথাটা একেনবউদি সত্যিই বলেছিলেন, না একেনবাবু আমাদের ইগো-বুস্ট করার জন্য বলেছিলেন□ বলতে পারব না) ।

"আরে মিনু ভেব না। দুটো কথা বলতে যাচ্ছি, তাতে বিপদ হবে কেন? আর যাচ্ছি তো রাখালের রেফারেন্সে।

।। ৬।।

মাথাফাটা রতনের ডেরা হল যাদবপুর অঞ্চলে একটা রাজনৈতিক দলের পার্টি-অফিসের পাশে ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে। এসব জায়গার ঠিকানা থাকে না। রাস্তার ধারে জবরদখল জমিতে বাঁশ আর দরমা দিয়ে বানানো অফিস। ওপরে টিনের চালা। পার্টি ফ্ল্যাগের আধিক্যই অফিসটা চেনার একমাত্র উপায়। পাশে চায়ের দোকানের পিছনটা একটা দরমা দিয়ে ঢাকা যাতে পিছনের নালাটা চোখে না পড়ে। দরমা ঘেঁষে জনা তিনেকের বসার মতো ছোটো কাঠের বেঞ্চ। এ ছাড়া লম্বা একটা বেঞ্চ সাইড দেয়ালে গা-ঠেকিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বসানো। দোকানের সামনে একটা রং-চটা কাঠের কাউন্টার। সেখানে দুটো বড় বয়াম আর একটা ঝুড়ি। বয়ামে বিস্কুট, কাপ-কেক ইত্যাদি। ঝুড়িতে কিছু শিঙাড়া। কাউন্টারের পাশে একটা গ্যাসের স্টোভে চায়ের কেটলি বসানো। আরও একটা বড়ো উনুন দোকানের পিছন দিকে। সেটা বোধহয় শিঙাড়া বা ভাজাভুজির জন্য।

একেনবাবু যখন সেখানে পৌঁছোলেন তখন সকাল দশটা। দোকানের মালিকের কাছে সুদেব কুন্ডুর খোঁজ করতেই ইশারায় দেখিয়ে দিল।

বেশ কয়েকটা গুন্ডা টাইপ লোকের মাঝখানে বসে গোল্ডফ্রেমের চশমা পরা কালো হুমদো লোক। খোঁচাখোঁচা দাড়ি, ব্যাকব্রাশ করা চুল, গলায় সোনার চেন। সোয়েটশার্টের রঙ ক্যাটকেটে হলুদ, পরনে জিনসের একটা প্যান্ট।

একেনবাবু এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলেন। "নমস্কার স্যার, আমার নাম একেন সেন। আপনি কি সুদেববাবু?"

"এখানে নতুন?"

"কী করে বুঝলেন স্যার?"

"নইলে প্রশ্নটা করতেন না।" তারপর হাঁক দিয়ে দোকানিকে, "ওরে রেমো, এক কাপ চা দে, বাবু আলাপ করতে এসেছেন।" এবার একেনবাবুকে, "থাকা হয় কোথায়?"

"আপাতত স্যার, নিউ ইয়র্কে।"

"নিউ ইয়র্ক? মানে আমেরিকায়!" মাথাফাটা রতনের চোখে অবিশ্বাস। "আপনার চেহারা আর জামাকাপড় দেখে তো তা মনে হচ্ছে না!"

"সালা ঝুট বলছে," পাশের লোকটা মন্তব্য করল।

একেনবাবু অ্যাস ইউস্যুয়াল ইস্তিরি ছাড়া কোঁচকানো একটা শার্ট আর ওঁর ফেভারিট রঙ-চটা ঘিয়ে রঙের প্যান্ট পরেছেন। আমেরিকায় থাকলে সাধারণত চেহারায় একটা জেল্লা আসে যা দেশে গিয়েও কিছুদিন পর্যন্ত থাকে। একেনবাবু শুধু তার ব্যতিক্রম।

"আসলে স্যার আমার চেহারাটাই এই রকম, গড্স গিফট। আপনি কেন স্যার, সবাই ওই একই কথা বলে। তবে নিউ ইয়র্ক যাবার আগে আমি এখানে পুলিশে ছিলাম, রাখাল দত্তের সঙ্গে কাজ করতাম।"

রাখাল দত্ত-র নামটা শুনে মাথাফাটা রতনের আচরণে একটা পরিবর্তন হল।

"ও, তাহলে আপনার কথাই সি-আই-ডি-র বড়োবাবু বলছিলেন।"

রাখাল দত্ত বড়ো না মেজোবাবু তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ। আসলে আমি বিকাশ সেনের মৃত্যু নিয়ে একটু খোঁজখবর করছি। রাখাল বলল আপনি বিকাশ সেনকে চিনতেন।"

মাথাফাটা রতনের ভুরুটা কোঁচকাল। "এ তো পুলিশের ব্যাপার, আপনি ফিল্ডে নেমেছেন কেন?"

চায়ের কাপে সশব্দে চুমুক দিয়ে একেনবাবু বললেন, "কারণটা একটু প্রাইভেটলি বলতে চাই স্যার।"

একেনবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত রতন আরেকবার দেখল। তারপর চেলাদের বলল, "এই সাইডে গিয়ে দাঁড়া তো।"

শুধু চেলারা নয়, দোকানিও একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

একেনবাবু গলাটা নামিয়ে বললেন, "নিউ ইয়র্কে বিকাশবাবুর যিনি বস, তিনি চান না যে বিকাশবাবুর খুন নিয়ে বেশি ঝুটঝামেলা হয়। এই যে আপনার সঙ্গে নার্সিং হোমের প্রোটেকশন নিয়ে বিকাশবাবুর যা কথাবার্তা হয়েছে, সেটা পাবলিক যেন জানতে না পারে।"

একেনবাবুর মনে হল কথাটা শুনে রতন একটু যেন বিচলিত। মুখে বলল, "এসব কী বলছেন আপনি!"

"ভুলে যান স্যার, এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। পরে বিকাশবাবুর বস এসে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি শুধু বলছি ব্যাপারটা যেন চাপা থাকে।"

"আমি কাউকেই কিছু বলিনি।" রতন মুখ ফসকেই বলে ফেলল।

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। পরিবর্তনের যে-রকম হাওয়া বইছে চারিদিকে, পুলিশকে এগুলো বললে নানান ফ্যাসাদ হবে। আপনার থেকে বেশি হবে নার্সিং হোমের মালিকদের।"

রতন কী জানি ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এই বস আসছেন কবে?"

"মাস দুয়েকের মধ্যেই। এলেই যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। আমিই স্যার যোগাযোগ করিয়ে দেব, ঠিক আছে?"

"বেশ। আপনার নামটা কী জানি বললেন?"

"একেন সেন। রাখালবাবু তো আমার নাম বলেছেন আপনাকে!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বলেছেন।"

"ঠিক আছে স্যার, আমি তাহলে চলি," বলে এক পা এগিয়ে আবার ঘুরে এসে বললেন, "একটা কথা স্যার, এই নার্সিং হোম নিয়ে কথাবার্তা তো মাত্র এক মাস আগের

ব্যাপার, বিকাশবাবু তো আপনার সঙ্গে আগেও একটা ঝামেলা নিয়ে কথা বলেছিলেন□ তাই না?”

“ও এক জমির ব্যাপারে।” রতন ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল।

“ওসব স্যার, আপনি পুলিশকে বোঝান। বিকাশবাবু যে নানা ঝামেলা পাকিয়েছেন ওঁর বসের কাছেই আমি শুনেছি। এই তো কিছুদিন আগে একটা মেয়ের সঙ্গে গোলমাল পাকিয়েছিলেন... ওঁর বস সে নিয়েও দুর্ভাবনা করছিলেন।”

রতন কিছু বলল না।

“না স্যার, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। বুঝতে পারছি এ নিয়ে আপনি কিছু বলতে চান না।”

“লোকটা তো মরে গেছে, ওসব নিয়ে আর ভাবছেন কেন?” রতন ইতস্তত করে বলল।

“ভাবছি অন্য কারণে স্যার। বিকাশবাবুর বস খুব লায়ন হার্টেড, মানে খুব বড়ো মনের লোক। বারবার করে আমাকে বলেছেন, বিকাশের কাছে কারো যদি কোনো পাওনা-গন্ডা থাকে, মানে এই ধরনের ব্যাপারে□ সব কিছু মিটিয়ে দিতে। বিকাশের আত্মার যাতে শান্তি হয়। আপনার কোনো পাওনা না থাকলে তো চুকেই গেল। চলি স্যার।”

একেনবাবু হাঁটা দিতে না দিতেই রতন পিছু ডাকল, “শুনুন!”

একেনবাবু ফিরে তাকালেন।

“মিথ্যে বলব না, বিকাশ সেনের কাছ থেকে দু-হাজার টাকা পেতাম। নার্সিং হোমের ব্যাপারটা আসায় সেটা মাপ করে দিয়েছিলাম।”

“নার্সিং হোমের ব্যাপারটা আসবে, বসই ওটা নিয়ে কথা বলবেন। কিন্তু দু-হাজার টাকা পেতেন কেন?”

এবার রতন যা বলল, তা হল□

মলয় নামে রিজেন্ট পার্কের এক মাস্তান বিকাশ সেনকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছিল। বিকাশ সেন নাকি ওদের পাড়ায় মল্লিকা নামে একটি মেয়েকে প্রেগনেন্ট করেছে। মোটা অঙ্কের টাকা না পেলে বিকাশ সেনকে ও এক্সপোজ করবে। বিকাশ সেন যখন তাতে রাজি হননি, তখন ভয় দেখাচ্ছিল মল্লিকার বাচ্চার দায়িত্ব না নিলে বিকাশ সেনকে খুন করবে। রতনের এলাকায় থেকে কেউ এ-রকম মাতব্বরি করবে সেটা তো মানা যায় না। তাই রতন চেলাদের দিয়ে মলয়কে একটু কড়কে দিয়েছিল।

“স্যার, এই মল্লিকা ম্যাডামের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?”

“কেন?”

“আমি স্যার, বিকাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। অনেক সময় অনেক কথা নিজের স্ত্রীকে না বললেও নিজের লাভারকে বলা যায়। যদি স্যার ওঁর সঙ্গে কথা বলে বিকাশবাবুর খুনি সম্পর্কে কিছু ক্লু পাই।”

“আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করবেন, ও কিছু জানে না,” রতন বলল।

“না জানলে তো চুকেই গেল, তবে একটা কথা বলি স্যার, আমি জানি বিকাশবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে আপনি কোনো ভাবেই জড়িত নন, কারণ আপনার সঙ্গে বিকাশবাবুর ডিল হয়েছিল। ওঁর মৃত্যুতে আপনারই ক্ষতি হবার কথা! মুশকিল হল স্যার পুলিশ তো তা জানে না। পুলিশ তো নানান কথা ভাববে।”

“কী ভাববে?”

“সেটা কি স্যার আমাকে বলবে! কিন্তু আমি যদি খুনের কিনারা করতে পারি, আপনার

লাভ বই ক্ষতি নেই স্যার।”

রতন কী জানি ভাবল একটু। “ঠিক আছে, কাল এই সময়ে একবার আসবেন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।”

বাড়ি ফিরে একেনবাবু দেখলেন একেনবউদি নেই। নিশ্চয় শাশুড়িকে দেখতে গেছে। মা-কে কিছুতেই নিজের কাছে এনে রাখতে পারেননি একেনবউদি। কোনো অবস্থাতেই উনি নিজের বাড়ি ছাড়বেন না। এখন নড়াচড়ারও প্রায় ক্ষমতা নেই □ তাও। তবে ওঁকে দেখার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা কেউ না কেউ থাকে। বাড়িও একই পাড়ায়। একেনবউদিও দিনের মধ্যে অন্তত তিন-চার বার করে দেখে আসেন, সব ঠিক চলছে কিনা।

একটু বাদেই একেনবউদি ঘরে ঢুকলেন।

“কোথায় গিয়েছিলে?”

“মা-র কাছে।”

“ওটা কী হাতে?”

“দেখো না খুলে।”

ব্রাউন কাগজে প্যাক করা একটা বড়ো প্যাকেট। একেনবাবু প্যাকেটটা খুলে দেখেন রশিদের তোলা ছবিটা, বিনয় দত্তের আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে উনি আর বিনয় দত্ত।

“আরে, এটা কোত্থেকে পেলে!” একেনবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন।

“প্রমথ ঠাকুরপো সেদিন ফোন করে ছবিটার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি বললাম, ‘আমায় তো দেখায়নি!’ তারপর তোমার বাক্স খুলে দেখি একদম নীচে রয়েছে ছবিটা। বাঁধানোর জন্যে দিয়ে এসেছিলাম।”

“শুধু শুধু খরচা করে বাঁধানোর কী দরকার ছিল?”

“কেন, বেশ তো ছবিটা□ চোর চোর মুখে দাঁড়িয়ে আছ একটা ত্রিভুজ আঁকা ছবির সামনে!”

“এই দেখো, তোমারও ওটাকে ত্রিভুজ মনে হচ্ছে না? সেদিন আর্টিস্টকে কথাটা বলতেই কয়েকটা লোক এত রেগে গেল যে কী বলব! চোখ দিয়েই আমাকে ভস্ম করে ফেলে!”

“ইনিই তো সেই আর্টিস্ট, তাই না?”

“হ্যাঁ, বিনয় দত্ত, খুবই বিখ্যাত।”

“ফটোর দোকানের ছেলেটাও এই নামটাই বলল। ও নিজেও ছবি-টবি আঁকে, চেনে। দেখো তো, প্রমথ ঠাকুরপো কত যত্ন করে এটা পাঠিয়েছেন। আমাকে বললেন তুমি নাকি ওঁর বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ পেন্টিং দেখবে বলে গিয়েছিলে! আচ্ছা, ওগুলো কী ধরনের পেন্টিং?”

“কী মুশকিল, আমি জানি নাকি!”

“প্রমথ ঠাকুরপো যে বললেন, তোমার কাছে জেনে নিতে!”

“প্রমথবাবু না সত্যি!” একেনবাবু স্বগতোক্তি করলেন।

“তোমার ভাগ্য এ-রকম সব বন্ধু পেয়েছ।”

“সেটা ঠিক,” একেনবাবু মাথা নেড়ে ছবিটা দেখতে দেখতে বললেন, “এক কাপ চা পেলে মন্দ হত না।”

“আমাকে দেখলেই বুঝি চায়ের কথা মনে পড়ে।”

“আরে না, আরো কতকিছু মনে পড়ে, কিন্তু নির্দোষ জিনিসটা দিয়েই শুরু করছি।”

"থাক, বুঝেছি," বলে একেনবউদি রান্নাঘরের দিকে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন। "ছবিটাকে বাইরের ঘরের দেয়ালে টাঙিও। বেশ হয়েছে ছবিটা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ টাঙাব।"

কী ঝামেলা! একেনবাবু মনে মনে ভাবলেন, এখন কোথায় হাতুড়ি, কোথায় পেরেক?

।। ৭।।

মাথাফাটা রতন কথার খেলাপ করে না। পরের দিন একেনবাবু যেতেই এক চেলাকে বলল, মল্লিকার বাড়ি নিয়ে যেতে।

"যান, ও বাড়িতেই আছে, দেখা করবে। তবে আমাকে বলেছে খুনের ব্যাপারে ও কিচ্ছু জানে না। যাওয়াটা আপনার বেকার হবে।"

নাকতলার এই অঞ্চলে একেনবাবু আগে আসেননি। বড়ো রাস্তা থেকে বেরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে বেশ কয়েকবার গিয়ে তারপর মল্লিকার বাড়ি। ছোটো গলির মতন রাস্তা, সেখানেও সারি সারি বহুতল বাড়ি। তারই একটার দোতলায় সামনের দিকে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানোর জায়গা নেই।

"এখানে গাড়ি রাখা যাবে না, লোকে এসে ঝামেলা করবে। আমি ওই মোড়ে দাঁড় করাচ্ছি," বলে ড্রাইভার একেনবাবুদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। এই ড্রাইভারটি নতুন, আজকেই প্রথম এসেছে। তবে হাবভাব দেখে মনে হয় এ চত্বরের হালচাল সব জানে।

দরজায় বেল বাজাতেই পারফিউমের সুগন্ধ ছড়িয়ে যিনি দরজা খুললেন তিনিই মল্লিকা। বয়স হয়তো বছর পঁচিশেক হবে। পরনে নেভি-ব্লু জিনস। শরীরটা একটু ভারীর দিকে। সুস্তনী, হালকা নীল আর কচি সবুজ রঙের টাই ডাই করা সিল্কের টপ। খেয়াল করলে বোঝা যায় মল্লিকা সন্তানসম্ভবা। গলায় ম্যাচ করা নীল-সবুজ পুঁথির নেকলেস। ঘাড় পর্যন্ত চুল, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, ঢলঢলে মুখে চোখ দুটো ছোটো একটু যেন বেমানান। সুন্দরী বলা যাবে না, কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে বেশ একটা অ্যাট্রাকটিভনেস আছে।

একেনবাবুর জন্যেই মল্লিকা অপেক্ষা করছিলেন। রতনের চেলা "এই সেই বাবু," বলে বিদায় নিল।

"ভেতরে আসুন," মল্লিকা বললেন।

একেনবাবু নিজের পরিচয় দিয়ে নমস্কার জানিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বিকাশ সেনের মৃত্যুর ব্যাপারে উনি তদন্ত করছেন সেটাও জানালেন।

"হঠাৎ করে চলে এসে বোধহয় ম্যাডামের অসুবিধা করলাম।"

"না না, ঠিক আছে। আসলে আজ শরীরটা ভালো নেই বলে কাজে যাইনি, নইলে এই সময় কাজে থাকি।"

একেনবাবু বসলেন না। "তাহলে কি ম্যাডাম, আরেক দিন আসব?"

"না, না, বসুন। চা খাবেন তো?"

"না ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক ইউ।"

বাইরের ঘরটা বড়ো নয়, তবে লম্বা। ঢোকার মুখে বেশ চওড়া, কারণ বাঁদিকে খাবার

জায়গা, গোটা তিনেক চেয়ার আর টেবিল সেখানে রয়েছে। তারপর ঘরটা সরু হয়ে গেছে, একদিকে রান্নাঘর থাকার জন্য। রান্নাঘরে ঢোকার দরজাটা হল খাবার জায়গা থেকে। বাইরের ঘরটা শেষ হয়েছে একটা জানলার সামনে। জানলা ঘেঁষে নিচু বুকশেলফে কয়েকটা বই আর কিউরিও। বেতের তৈরি গদি-বালিশ দেওয়া সোফাসেট আর সেন্টার টেবিল। খাবার জায়গা শুরু হবার মুখে ডানদিকে একটা প্যাসেজ ভেতরের দিকে চলে গেছে। বাথরুম, বেডরুম ইত্যাদি নিশ্চয় সেই প্যাসেজ দিয়েই যাওয়া যায়।

চেয়ারে বসতে বসতে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাজে যাননি বললেন ম্যাডাম, কোথায় কাজ করেন আপনি?"

ভুরুটা কুঁচকে উঠল মল্লিকার, "কেন বলুন তো?"

"কাজে যাননি শুনে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সরি ম্যাডাম।"

প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিলেন মল্লিকা। "গড়িয়াহাটে।" তারপর এক মুহূর্ত থেমে বললেন, "সেলস-এর চাকরি।"

কী ভাবে আলোচনাটা আরম্ভ করবেন ভাবছিলেন একেনবাবু। মল্লিকা রাতে কী কাজ করেন, সেটা ওঁর আচরণ বা ব্যবহার থেকে অনুমান করা অসম্ভব। দেখে মনে হয় পাশের বাড়ির ওই বয়সি আর দশ জনের মত। মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির শিক্ষিতা মেয়ে, সাজতে গুজতে ভালোবাসে, চাকরিবাকরি করে...

একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি ম্যাডাম এসেছি...।"

মল্লিকা ওঁকে থামিয়ে দিলেন, "আপনার কথা আমি শুনেছি রতনের কাছে। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। আপনি শুধু শুধু এসেছেন।"

'রতন' কথাটা খট করে কানে লাগল একেনবাবুর। সুদেববাবু বা সুদেবদা, অন্তত রতনদা আশা করেছিলেন। মল্লিকার থেকে মাথাফাটা রতন অন্তত বছর দশকের বড়ো হবে। আমেরিকায় এ-রকম নাম ধরে বলা চলে, আজকাল কলকাতাতেও মাঝেমধ্যে শোনেন। তাও কানে লাগে!

"সে তো বটেই ম্যাডাম, জানলে তো আপনি পুলিশকেই সেটা জানিয়ে দিতেন।"

"ঠিক। কিন্তু আমাকে 'ম্যাডাম' বলবেন না প্লিজ, শুনলে নিজেকে বুড়ি বুড়ি লাগে," মল্লিকা বললেন।

"ওটা আমার মুদ্রাদোষ ম্যাডাম, মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তাও চেষ্টা করব কথা দিচ্ছি। আমার শুধু কয়েকটাই প্রশ্ন আছে।"

একেনবাবুর বলার ভঙ্গি দেখে মল্লিকার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

"বলুন।"

"আপনি তো বিকাশবাবুকে চিনতেন ম্যাডাম, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিনের পরিচয়?"

"মাস ছয়েক আগে একটা পার্টিতে ওই এসে আলাপ করে।"

"আই সি," একেনবাবু মাথা চুলকে বললেন, "কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, কী ধরনের আলাপ? আপনি কি ওঁকে খুব ভালো করে চিনতেন?"

মল্লিকা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "এতে ঢাকা চাপার কিছু নেই। আমাদের ইন্টিমেট রিলেশন হয়েছিল। ইনফ্যাক্ট ওর জন্যেই আমি প্রেগন্যান্ট হই। তারপর কী হল জানতে চান?"

মল্লিকার মুখ ভাবলেশহীন। এমনিতেই মহিলাদের সঙ্গে এ ধরনের কথাবার্তায়

একেনবাবুর অসুবিধা হয়। এই কথায় তো একেবারে থতোমতো!

"মানে...।"

"মানে, সেটা জেনেই ও অদৃশ্য হয়। ফোন করলে ফোন ধরত না। দেখা করতে চাইলে দেখা করত না। ভাবটা আমাকে চেনেই না। তখন বুঝলাম, হি জাস্ট ওয়ান্টেড টু ইউজ মি... এন্ড অফ স্টোরি।"

"সরি ম্যাডাম।" একেনবাবু আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

মল্লিকা বোধহয় একেনবাবুর এই চুপ হয়ে যাওয়াটা উপভোগ করলেন। তারপর নিজের থেকেই বললেন, "আমার সম্বন্ধে আপনি কী শুনেছেন জানি না, আমি সত্যিই বিকাশকে ভালোবাসতাম। ভেবেছিলাম ও-ও আমাকে ভালোবাসে।"

ইতিমধ্যে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছেন একেনবাবু। "উনি আপনাকে এভাবে..." 'ডাম্প' শব্দটা প্রায় মুখে এসে যাচ্ছিল, সেটা আটকে বললেন, "ছেড়ে চলে গেলেন, আর আপনি চুপচাপ সহ্য করলেন ম্যাডাম?"

"তাছাড়া উপায়?"

একেনবাবু মাথা চুলকে বললেন, "আমি একটু কনফিউসড ম্যাডাম, আমি তো শুনেছিলাম আপনি বিকাশবাবুকে খুন করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছিলেন।"

"আমি! কার কাছে শুনেছিলেন?"

"মানে শুনেছিলাম মলয়বাবু..." কোত্থেকে শুনেছেন সেটা একেনবাবু বিশদ করলেন না।

"মলয় আমার বন্ধু, সে আমার কষ্ট দেখে বিকাশকে বলেছিল আমার টেক কেয়ার করতে। বিকাশ সেই কথায় আমল না দেওয়াতে হয়তো ভয় দেখিয়েছিল। জাস্ট ভয় দেখানো।"

"আই সি। কিন্তু যেটা ফ্যাক্ট, সেটা হল বিকাশবাবু খুন হয়েছেন।"

এবার মল্লিকা চুপ।

"বিকাশ সেনের কোনো শত্রু ছিল কিনা আপনি জানেন?"

"না।"

"মলয়বাবু যে খুন করেননি আপনি কী করে জানলেন?"

"কারণ খুন করার ছেলে সে নয়।"

"মলয়বাবু কোথায় থাকেন?"

"জানি না।"

"আমি আবার কনফিউসড ম্যাডাম, আপনার বন্ধু কোথায় থাকেন আপনি জানেন না?"

"জানতাম, এখন সেখানে থাকে কিনা জানি না।"

"শেষ কবে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"রতনের দল ওকে খুব মারধোর করায় যখন হাসপাতালে কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল, তখন।"

"সেটা কতদিন আগে?"

"প্রায় দিন কুড়ি।"

"তারপর ওঁকে দেখতে যাননি?"

"না, রতন আমাকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বারণ করেছে।"

"রতনবাবুকে আপনি কতদিন চেনেন?"

"বেশি দিন নয়।"

"মলয়বাবু ওঁর দলবলের হাতে মার খাবার আগে চিনতেন?"
"না, তবে নাম শুনেছিলাম। এ তল্লাটে সবাই ওর নাম জানে।"
"আই সি, কবে আপনার সঙ্গে রতনবাবুর পরিচয় হয়?"
"মলয় হাসপাতালে যাবার দু-দিন বাদে হঠাৎ রাত্রিবেলায় রতন আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসে। নিজের পরিচয় দিয়ে জোর খাটিয়ে আমার সঙ্গে শোয়।"
মল্লিকা এত স্বচ্ছন্দে চোখে চোখ রেখে কথাটা বললেন, যেন গড়িয়াহাট বাজারে কারোর সঙ্গে দেখা হয়েছে সেটাই জানাচ্ছেন। এটা কি শুধু অকপট ভাষণ, না একেনবাবুকে 'শক' দিয়ে অপদস্ত করার চেষ্টা। চক্ষুলজ্জা থাকলে ভদ্রলোক বেশি প্রশ্ন না করে যাতে সরে পড়েন তার ব্যবস্থা।
একেনবাবু নড়েচড়ে চেয়ারে একটু ভালো করে বসলেন। মুখটা একটু নিচু করে গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, "বুঝলাম ম্যাডাম।"
"আর কিছু জানতে চান? তাও কেন রতনের সঙ্গে আমি সম্পর্ক রেখেছি?"
একেনবাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করে মল্লিকা বললেন, "রতন আপনাকে কী বলেছে জানি না, আমি কিন্তু রতন বা কারোর রক্ষিতা নই। প্রেগন্যান্ট হয়ে যাবার পর লাইনের কাজ আমি করি না। রতন মাঝেমধ্যে আসে। জলে থাকলে কুমিরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করতে হয়, এই পর্যন্ত।"
"ম্যাডাম, রতনবাবু আমায় কিছুই বলেননি।" মুখটা তুলে মল্লিকার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বেশ দৃঢ় ভাবে একেনবাবু বললেন। "আমি এসেছি অন্য দু-একটা প্রশ্ন করতে।"
"আপনি তো এর মধ্যেই অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেললেন, আর কী প্রশ্ন?" মনে হল মল্লিকা একটু বিরক্ত।
"মলয়বাবুকে রতনবাবুর লোকেরা কেন মেরেছিলেন?"
"জানি না।"
"মলয়বাবু আপনার বন্ধু ম্যাডাম, তিনি রতনবাবুর দলের হাতে মার খেলেন, অথচ আপনি রতনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন না কথাটা?"
"না, সাহস হয়নি। ধরে নিয়েছিলাম আমার জন্যে।"
"কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আপনাকে কিন্তু খুব ভিতু বলে মনে হয় না।"
"তাহলে কী মনে হয়?" চোখে চোখ রেখে প্রশ্নটা করলেন মল্লিকা।
মল্লিকার প্রশ্নের ফাঁদে পা দিলেন না একেনবাবু। উত্তর না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন করলেন, "বিকাশবাবুর সঙ্গে রতনবাবুর কোনো গণ্ডগোলের কথা আপনি শুনেছেন?"
"না। বরং বিকাশ মারা যাওয়ায় ওর ক্ষতি হয়েছে, কথায় কথায় ক'দিন আগে রতন বলেছিল। এবার আমি আপনাকে একটা সিরিয়াস প্রশ্ন করি?"
"করুন, ম্যাডাম।"
"আমি বিকাশের স্ত্রী না হতে পারি, কিন্তু বিকাশের সম্পত্তিতে তো অধিকার ওর অবৈধ সন্তানেরও আছে। সেই অধিকার থেকে আমার বাচ্চা কেন বঞ্চিত হবে? আপনি তো আমেরিকায় থাকেন□ বড়ো বড়ো লোকদের চেনেন, এ ব্যাপারে একটা কিছু করতে পারেন না?"
"আমি বড়ো বড়ো লোকদের চিনি ম্যাডাম!" একেনবাবু একটু অবাক হয়েই বললেন।
"বিকাশের বস তো আপনার বন্ধু।"
মল্লিকা ইতিমধ্যে রতনের কাছ থেকে একেনবাবু সম্পর্কে নিশ্চয় অনেক কিছু

শুনেছেন। কী শুনেছেন সেটা জানার আর চেষ্টা করলেন না একেনবাবু। বললেন, "এটা তো সিভিল কেস। আপনার সন্তান জন্মাবার পর সিভিল কোর্টে গিয়ে এর ফয়সলা করতে হবে।"

"আমি নিজে টাকা চাই না, কিন্তু আমার বাচ্চার যা প্রাপ্য সেটা সে পাবে না কেন?" একই প্রশ্ন আবার করল মল্লিকা।

"ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট ম্যাডাম। রতনবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে আপনার কোনো কথা হয়েছে?"

"না।"

"আপনার বাবা-মা বা আত্মীয়স্বজন কেউ জানেন বিকাশবাবুর সঙ্গে আপনার এই রিলেশনের ব্যাপারটা?"

"আমার সঙ্গে আমার আত্মীয়স্বজনের কোনো যোগ নেই।"

মল্লিকার কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু জানা গেল না। বেশ ঘোড়েল শক্ত মেয়ে, এটুকুই বুঝলেন একেনবাবু। মলয়ের একটা ঠিকানা মল্লিকার কাছ থেকে পেলেন। তবে সেখানে মলয়কে পাওয়ার সম্ভাবনা কমই।

।। ৮ ।।

মল্লিকার বাড়ি থেকে ফেরার পথে একেনবাবু ভাবছিলেন অর্থ আর শক্তি কী ভাবে সমাজের বাধা-নিষেধের পাঁচিলগুলো ভেঙে দিচ্ছে! মল্লিকার কথাবার্তায় শিক্ষাদীক্ষার ছাপ। কাচের আলমারিতে কিউরিওগুলোর নীচে বেশ কয়েকটা বইয়ের মধ্যে সঞ্চয়িতা আর গীতবিতান একেনবাবুর নজর এড়ায়নি। এ-রকম একটা মেয়ে রতনের মতো অশিক্ষিত গুন্ডা ক্যারেক্টারের শয্যাসঙ্গিনী ভাবতেও ওঁর খারাপ লাগছিল। এখন তো গুন্ডাদেরই রাজত্ব। দাউদ ইব্রাহিম থেকে শুরু করে পাড়ার বিশু গুন্ডা। এইসব লোকেদের হাতেই পৃথিবী!

আসলে একেনবাবু মুখে যতই বলুন, 'মানুষ স্যার, মানুষ,' উনি ক্লাস সিস্টেমে প্রবল বিশ্বাসী। 'ভদ্রলোক' আর 'ছোটোলোক' □ এই দুইয়ের মেলামেশায় ওঁর প্রচণ্ড সমস্যা হয়। কে 'ভদ্রলোক' আর কে 'ছোটোলোক' তার একটা ডেফিনেশনও ওঁর মাথায় আছে, যেটা আবার স্থান-কাল-পাত্রে একটু পালটায়। যেমন, ম্যানহাটানে প্লাম্বারের সঙ্গে কলেজ প্রফেসরের প্রেম বা বিয়ে□ একটু খুঁতখুঁত করলেও সেটা চলে। তা বলে দেশে? কলের মিস্ত্রির সঙ্গে শিক্ষিত অধ্যাপিকা ঘর করছে, এটা কি মানা যায়? একেনবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে আমার আর প্রমথর প্রায়ই লাগে। তর্কে কোণঠাসা হয়ে একেনবাবু তাঁর শেষ অস্ত্র ছাড়েন, "যাই বলুন স্যার, তেলেজলে মিশ খায় না।"

নাকতলা থেকে বেরিয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক রোড ধরতে গিয়ে একেনবাবু দেখলেন অ্যাকসিডেন্টে রাস্তা জ্যাম।

"বাইপাস ধরা যাবে?" ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন একেনবাবু।

ড্রাইভারটি রাস্তাঘাট ভালো চেনে। অন্য একটা সহজ পথ ধরে পাটুলির রাস্তায় নিয়ে এসে বাইপাসে পড়ল। একটু ঘুরপথ হবে, তবে সময় মনে হয় কমই লাগবে।

"আজ দুপুরের মেনু কী?" একেনবউদিকে মোবাইল থেকে ফোন করলেন।

"ডাল, পাঁচমেশালি তরকারি, আলু-পটল দিয়ে মাছের ঝোল, একটা ভাজা। ভাজা কী হবে এখনও ঠিক করিনি। কখন আসছ তুমি?"

"আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাব। কীসের ডাল?"

"ভাজা মুগের।"

"বাড়িতে গন্ধরাজ লেবু আছে?"

"না। খেতে ইচ্ছে করলে নিয়ে এসো।"

"দেখি।"

এই গন্ধরাজ লেবুটা ম্যানহাটানে মেলে না। একেনবাবু অনেক খুঁজেছেন, পাননি। হয়তো আছে, চাইলে তো লোকে বলে বাঘের দুধও নিউ ইয়র্কে পাওয়া যায়।

"একবার গড়িয়াহাট বাজারে একটু থামবেন।" ড্রাইভারকে বললেন একেনবাবু।

"গন্ধরাজ লেবু তো মুকুন্দপুর মার্কেটেই পেয়ে যাবেন, শুধু শুধু পার্কিং-এর পয়সা দেবেন কেন?"

চোখ-কান খোলা ড্রাইভার, তার ওপর একেনবাবুর পয়সা বাঁচাচ্ছে। খুশি হলেন একেনবাবু।

"তাহলে সেখানেই চলুন।"

এ দিকটায় বহুবছর একেনবাবু আসেননি। তদন্তের কাজে একবার আসতে হয়েছিল। বাইপাস দিয়ে মুকুন্দপুরে ঢোকার রাস্তাটা তখনও পাকা হয়নি। টিনের চালের নীচে ঘুপচি সাইজের একটা থানা ছিল। সেখানে বসে গাদা গাদা মশার কামড় খেয়েছিলেন এখনও মনে আছে। রাস্তার ধারে যে থানাটা এখন দেখলেন, আগের তুলনায় সেটা প্রাসাদ। মুকুন্দপুরও সে মুকুন্দপুর নেই। লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। ডেভালপমেন্ট হচ্ছে দ্রুত গতিতে। সব কিছু যে খুব প্ল্যান করে হচ্ছে তা নয়। রাস্তার দু-ধারে যেসব দোকান, বেশির ভাগই মনে হয় জবরদখল করা জমি। থানার গা-ঘেঁষেই দরমা দিয়ে ঘেরা কয়েকটা দোকান। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ চা খাচ্ছে। সেগুলো পার হতেই একটা বড়ো স্পেশালিটি হাসপাতাল। লবিতে ঢোকার মুখে বিশাল কাচের দরজা। দারুণ মডার্ন আর্কিটেকচার, দেখার মতন বাড়ি! সেটা পার হলে পর পর বেশ কয়েকটা বাড়ি বা গেস্ট হাউস। তারপর আরেকটা বিশাল হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের পাশ দিয়ে রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরে গেছে। ঘোরার মুখে একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, তার প্রায় পাশ দিয়েই বাজারে ঢোকার গলি। ড্রাইভার অবশ্য বাজারের মুখ পর্যন্ত গেল না। তার আগেই বাঁদিকে যে ছোটো রাস্তাটা গেছে সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একেনবাবুকে বলল, "ওই গলি দিয়ে ঢুকে যান। ঢুকেই ডানদিকে গেলে বাঁ-দিকে সব্জির দোকান পাবেন।

আলু-পেঁয়াজের একটা দোকানের পর বেশ কয়েকটা সব্জির দোকান। সব্জির চেহারাগুলো সত্যি চমৎকার, একেবারে চকচকে ফ্রেশ। নিউ ইয়র্কে চায়না টাউনেও এত ফ্রেশ জিনিস দেখেননি একেনবাবু। গন্ধরাজ লেবুও মিলল। দুটো লেবু কিনে যখন পয়সা দিচ্ছেন, তখন পাশে দাঁড়ানো এক বয়স্ক খরিদ্দার দোকানিকে বললেন, "হ্যাঁরে ভোলা, এই বেগুন-টম্যাটোতে আর কত রঙ লাগাবি?"

"আমরা কোনো রঙ লাগাই না, কাকু।" ভোলা প্রতিবাদ করল।

"তুই লাগিয়েছিস তো বলছি না। যার কাছ থেকে কিনেছিস, সে লাগিয়েছে।"

ভোলা কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

ভদ্রলোক একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে অযাচিত ভাবেই বললেন, "বুঝলেন, সব

ভেজাল। এইসব টক্সিক রং-টং লাগানোর কী দরকার? মেট্রো-তে যান, ওখানে এসব পাবেন না। টম্যাটো দেখলে ম্যাড়ম্যাড়ে লাগবে, কিন্তু খাঁটি জিনিস। জার্মান মাল্টি-ন্যাশেনাল, ওরা এইসব রিস্ক নেয় না।”

‘মেট্রো’ কী একেনবাবুর কোনো ধারণাই নেই। অন্য সময় হলে একেনবাবু জ্ঞানটা বাড়িয়ে নিতেন, আজকে দাঁড়ালেন না। বাইপাসে ঢুকে গড়িয়াহাট কানেক্টারের দিকে একটু এগোতেই ডানদিকে একটা দোকানের সামনে হলুদ শালুতে লেখা, এই মাসে সব কিছু ২৫% ছাড় ৩ টাকায় ৪ টাকার জিনিস কিনুন। পাছে ২৫% কেউ যদি না বোঝে তাই সেটা ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। দোকানটা এক তলা কিন্তু বিশাল। ওপরে লেখা ‘মেট্রো’ একদিকে ইংরেজিতে, অন্যদিকে বাংলায়। মেট্রো! এটাই কি সেই জায়গা?

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে বলল, “সুপার স্টোর, সবকিছু পাওয়া যায়। তবে সবাইকে ঢুকতে দেয় না।”

“কেন?”

“তা ঠিক জানি না, কীসব আইন আছে।”

ড্রাইভারটি তার বেশি কিছু জানে না। একেনবাবুর মনে হল নিশ্চয় আমেরিকার ‘বিজে-স’ বা কস্টকো’-র মতন কোনো দোকান, মেম্বারশিপ থাকলে সস্তায় জিনিস কেনা যায়।

কলকাতায় আসার একটা বড়ো আকর্ষণ হল খাওয়াদাওয়া। দই-মিষ্টির কথা বাদই দেওয়া যাক। এখানকার তরিতরকারি বা মাছের যা স্বাদ, তার সঙ্গে আমেরিকার শাকসব্জি বা মাছের তুলনা হয় না। তবে হ্যাঁ, মুরগি আর গোট মিট, মানে পাঁঠার মাংসের ব্যাপারে আমেরিকা কিন্তু টপে। খান মার্কেট থেকে কেনা গোট মিটের কোয়ালিটি এখন পর্যন্ত কলকাতায় কোথাও দেখেননি। কলকাতায় যেদিন এলেন সেদিন বিকেলে মাসতুতো শালি দোলা-র বাড়িতে খেতে গিয়েছিলেন। ভায়রা একেনবাবুকে ইম্প্রেস করার জন্যে টেরিটি বাজারের কোন এক চাচাজির দোকান থেকে পাঁঠার মাংস এনেছিলেন। নো কম্পারিজন। মুরগির প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। আমেরিকায় মুরগির রোস্ট, ফ্রাই ইত্যাদি খাবার পর কলকাতার চিকেন মুখেই তোলা যায় না। এসব অবশ্য একেনবাবুর পার্সোনাল মত। কিন্তু তাতে একেনবউদির সুবিধা। তিনি নিজে মাংস পছন্দ করেন না। বাড়িতে শুধু মাছই হচ্ছে।

দুপুরের খাওয়াটা দিব্বি হল। আজকে দুপুরে আর বিশ্রাম নয়। একেনবাবুর আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। প্রথমে বিকাশ সেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি নীলাঞ্জনা মিত্রের সঙ্গে। রাখাল দত্ত নীলাঞ্জনাকে জানিয়েও রেখেছেন একেনবাবু যাবেন বলে। তারপর সময় থাকলে মনীষা সেনের সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হবে।

রাখাল দত্তকে ফোন করে বিকাশ সেনের অফিসের ঠিকানাটা নিয়ে নিলেন একেনবাবু। শেখর চৌধুরীকে কবে কথা বলার জন্য পাওয়া যেতে পারে, সেই খোঁজটাও নিতে বললেন। ইতিমধ্যে ড্রাইভার লাঞ্চ খেয়ে চলে এসেছে।

বিকাশ সেনের অফিসটা পূর্ণদাস রোডে, একটা মাল্টি-স্টোরি বিল্ডিং-এর এক তলায় কয়েকটা ঘর নিয়ে পাবলিক রিলেশন্স-এর ফার্ম। কিছুদিন আগেও এ ধরনের ফার্মের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পাবলিক রিলেশন্স ব্যাপারটা ঠিক কী, একেনবাবুর এখনও স্পষ্ট ধারণা নেই। কোম্পানিগুলোর জনসংযোগ করার কাজ তো অ্যাড এজেন্সির। মক্কেলদের

প্রডাক্টগুলোর জন্য বিজ্ঞাপন বানিয়ে তারা পত্র-পত্রিকায় ছাপায়। এক কালে তো এটা কিনুন, ওটা কিনুন বলে রাস্তার থামে থামে পোস্টারও সেঁটে দিত, এখন হোর্ডিং বানায়। পুরো ব্যাপারটাই নাকি আর্টের পর্যায় চলে গেছে, যাকে বলে ক্রিয়েটিভ আর্ট। এক-একটা অ্যাড ক্যাম্পেনের পিছনে নাকি অনেক গবেষণা থাকে! কী এত গবেষণা কে জানে!

একেনবাবুর দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে অ্যাড এজেন্সিতে কাজ করত। দিদির সর্বদা অভিযোগ ছেলে নাকি রাত তিনটের আগে বাড়ি ফেরে না! জামাইবাবু বাইরে পোস্টেড, কলকাতায় কী হচ্ছে কিছুই খোঁজ রাখেন না। একেনবাবু তখন কলকাতা পুলিশে। কী একটা কাজে গড়িয়াহাটে গিয়েছিলেন। কাছেই ভাগ্নের অ্যাড এজেন্সির অফিস, ভাবলেন একবার 'হ্যালো' বলে যাবেন। তিনটে বাজে, অফিসে প্রায় কেউই নেই। কাছেই এক কফিহাউসে ভাগ্নের সাক্ষাৎ পেলেন। কয়েকজন মিলে সিগারেট ফুঁকছে, আর কফি খাচ্ছে। একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কীরে, তুই এখানে! তোদের অফিস টাইম কখন?"

"টাইম একটা আছে, কিন্তু সেই টাইমে কাজ হয় না।"

"তার মানে?"

"আমরা ক্রিয়েটিভ কাজ করি মামা, রাত ন' টা-দশটার আগে ক্রিয়েটিভ জুস-ই ফ্লো করে না।"

ভেরি ইন্টারেস্টিং! ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ এযুগে জন্মাননি! তখন মেন্টালিটি বোধহয় অন্য রকম ছিল, নইলে এত লিখতেন কী করে? শান্তিনিকেতনে তো তখন ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না, হ্যারিকেনের আলো। ন'টা-দশটার আগেই নিশ্চয় শুয়ে পড়তেন। এই ভাগ্নেটির ক্রিয়েটিভ কাজ অবশ্য একেনবাবু দেখেননি। তার আগেই জামাইবাবু ছোঁড়াকে নিজের কোম্পানিতে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। এখন টাকা-পয়সার হিসেব কষে।

যাক সে কথা। পাবলিক রিলেশন্সের কাজটা ঠিক কী, বিকাশ সেনের অফিসে ঢুকে জানা গেল। লবিতে বড়ো বড়ো পোস্টারে পরিষ্কার করে লেখা □ রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট কম্যুনিকেশন, মিডিয়া রিলেশন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলোর ইংরেজি ব্যাখ্যাও রয়েছে, একেনবাবুর মাথায় সবগুলো ঢুকল না। যাদের বোঝার দরকার তারা নিশ্চয় বোঝে। ঝাঁ চকচকে অফিস তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

রিসেপশানিস্টকে নিজের পরিচয় দিয়ে নীলাঞ্জনা মিত্রের খোঁজ করতেই ভিতরের কোনো একটা ঘর থেকে নীলাঞ্জনা বেরিয়ে এলেন। ফ্যাশানেবল সালোয়ার কামিজ পরা লম্বা একটি মেয়ে, চোখটা কটা□ ঠিক বাঙালি বাঙালি চেহারা নয়। একেনবাবুকে নিয়ে রিসেপশানিস্টের ডেস্ক থেকে একটু দূরে লবির একটা কোণে দাঁড়ালেন। নীলাঞ্জনার হাবভাবে একেনবাবু বুঝলেন বিকাশবাবু সম্পর্কে কিছু বলার ইচ্ছে তাঁর নেই। ইংরেজিতে বললেন, "অফিসের কনফারেন্স রুমে ক্লায়েন্ট আছে, বিকাশ সেনের পুরোনো অফিস ঘরেও একটা মিটিং চলছে, সুতরাং প্রাইভেটলি কথা বলার কোনো জায়গা নেই।"

একেনবাবু বললেন, "ঠিক আছে ম্যাডাম, কখন মিটিং শেষ হবে বলুন, আমি তখন আসব।"

"কখন মিটিং শেষ হবে বলা শক্ত।" আবার ইংরেজিতেই বললেন নীলাঞ্জনা।

"কালকে আপনার সময় হবে?"

"দেখুন, আমি সব সময়েই ব্যস্ত। আর এ ব্যাপারে আমার কিছু বলারও নেই।"

একেনবাবু তখন অন্য পথ ধরলেন। বললেন, "ম্যাডাম, আপনি যদি কিছু না বলতে চান, বলবেন না। তবে তদন্তটা খুনের। আপনার নাম কিন্তু জড়াবে, আপনি চান বা না

চান।”
এই কথায় নীলাঞ্জনার বোধহয় টনক নড়ল। এবার বাংলায় বললেন, “আমার সংসারে অনেক সমস্যা হয়েছে, সেটাকে আর বাড়াতে চাই না।”
“নিশ্চয় ম্যাডাম,” একেনবাবু নীলাঞ্জনাকে আশ্বস্ত করলেন। “সত্যি কথা বলতে কী, আপনার সঙ্গে বিকাশবাবুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কী ছিল, সে নিয়ে আমার চিন্তা নেই।”
“তাহলে?”
“যেটা আমি বোঝার চেষ্টা করছি ম্যাডাম, বিকাশবাবুর খুন হওয়ার সঙ্গে সেই সম্পর্কটা জড়িত কিনা।”
একেনবাবুর এই কথাগুলো নীলাঞ্জনা পছন্দ হল না। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, “আপনি কী ইমপ্লাই করছেন?”
“কিছুই না ম্যাডাম, শুধু বোঝার চেষ্টা করছি।”
এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, “এখানে আমি কোনো কথা বলতে পারব না।”
“বেশ ম্যাডাম, তাহলে কোথায় বলতে পারবেন বলুন। আপনার বাড়িতে আসতে পারি?”
“না না বাড়িতে নয়।” আপত্তি জানাল নীলাঞ্জনা।
একেনবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।
“ঠিক আছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি অফিসে বলে আসছি।”
খানিক বাদে একটা চাবি হাতে ফিরে এসে নীলাঞ্জনা বললেন, “দোতালায় আমাদের স্টোর রুম আছে, সেখানে কিছুক্ষণ বসতে পারি।”
ঘুপচি স্টোর রুম। ফাইলপত্র, কাগজ আর পোস্টারে ঠাসা। তারই মাঝখানে একটা টেবিল আর গুটিকতক চেয়ার।
“বসুন,” বলে একটা চেয়ার টেনে নীলাঞ্জনাও বসলেন। “কী জানতে চান বলুন?”
“বিকাশবাবুর সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গতা হয়েছিল ম্যাডাম?”
“উনি আমার বস ও বন্ধু দুই-ই ছিলেন। অন্তরঙ্গ কথাটা ব্যবহার করতে চাই না।”
“আপনি কিন্তু বললেন ম্যাডাম, আপনার সংসারে এ নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছে...।”
একেনবাবুকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না নীলঞ্জনা। “হ্যাঁ, হয়েছে। তার কারণ আমার স্বামী একটু সন্দেহপ্রবণ। মাঝে মাঝে কাজের সূত্রে আমার বাড়ি যেতে দেরি হত বা ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরতাম, ওর তাতে অসুবিধা হত।”
“আই সি। একটা প্রশ্ন করি ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না, বিকাশবাবু কি আপনার বন্ধুত্বের সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিলেন, আই মিন...।”
আবার একেনবাবুকে থামিয়ে দিলেন নীলাঞ্জনা। “একবারই চেষ্টা করেছিল, বাট আই নিপড ইট ইন দ্য বাড। আফটার দ্যাট হি নেভার ট্রায়েড।”
“আপনার স্বামী কি সেটা জানতেন?”
“না, এটা গল্প করার কোনো ব্যাপার নয়।”
“আর কারোর কাছে কি উনি শুনে থাকতে পারেন?”
“কার কাছ থেকে শুনবে! আর শোনার মতো তো কিছু ঘটেনি! কিছু যদি ও শুনতে পেত আমায় বলত।”
“দাঁড়ান ম্যাডাম, আমার একটু গুলিয়ে যাচ্ছে। এই ‘নিপড ইন দ্য বাড’ কথাটা বললেন, এটা কতদিন আগেকার ঘটনা?”
“আমার মনে নেই।” একটু বিরক্তিভরে নীলাঞ্জনা উত্তরটা দিলেন।

“আই সি,” মাথা চুলকোলেন একেনবাবু। “কিন্তু তারপর থেকে ম্যাডাম আপনি সময় মতোই বাড়ি ফিরছেন, তাই তো?”

“না, তা ঠিক না। আপনি ঠিক কী জানতে চাইছেন বলুন তো?”

“আসলে ম্যাডাম, আমি বোঝার চেষ্টা করছি। আপনার স্বামীর সন্দেহটা গেল কী ভাবে! আপনি তো সেই দেরি করেই বাড়ি ফিরছেন, বাইরে ডিনারও খাচ্ছেন!”

“তার কারণ আমি ওকে বলেছি, ও যা মাইনে পায় তা দিয়ে সংসার চলবে না। আই নিড দিস জব আমাদের দু-জনের জন্যেই। আর এটা একটা ডেস্ক জব নয়। এই চাকরিতে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ডিনার খেতে হবে, কাজের চাপ বেশি পড়লে রাত্রি পর্যন্ত কাজও করতে হবে। হি উইল হ্যাভ টু ট্রাস্ট মি।”

“বুঝেছি ম্যাডাম, উনি সেটা মেনে নিয়েছেন।”

“মেনে নেওয়া মানে আমার চাকরির সমস্যাটা অন্তত বুঝেছেন।”

“বিকাশবাবুর বিরুদ্ধে তো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের চার্জও আছে?”

“তা আছে, কিন্তু সেটা আমার তরফ থেকে নয়।” তারপর একটু চুপ করে বললেন, “লোকটা মরে গেছে, অনেক কিছুই এখন অবান্তর। ও যে নিষ্পাপ শুদ্ধ চরিত্রের লোক কখনোই আমি বলব না, তবে মনে রাখবেন এক হাতে তালি বাজে না। তালে তাল না দিয়েও যে লোককে ম্যানেজ করা যায় তার প্রমাণ আমি।”

“তা তো বটেই ম্যাডাম। ভালো কথা, যেদিন বিকাশবাবু মারা যান, সেদিন কি আপনি ওঁর সঙ্গে ডিনার মিটিং-এ গিয়েছিলেন?”

“না।”

“ওঁর নাকি অফিশিয়াল ডিনার ছিল সেদিন?”

“থাকতে পারে। ওর সব অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা আমি জানতাম না।”

“কিন্তু ম্যাডাম, আপনি তো ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি!”

“তা বলেই আমি সব কথা জানব সেটা কেন ভাবছেন? হয়তো ওটা একটা কনফিডেনশিয়াল মিটিং, ইচ্ছে করেই আমাকে জানায়নি।”

“আই সি।” আবার মাথা চুলকোলেন একেনবাবু।

“আর কী জানতে চান?”

“ও হ্যাঁ, বিকাশবাবুর সঙ্গে কারো কোনো গণ্ডগোল চলছিল টাকা-পয়সা বা অন্য কোনো ব্যাপারে?”

“তেমন তো কিছু শুনিনি। আর কিছু?” নীলাঞ্জনা মনে হল এবার অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

“এক্ষুনি আর কিছু নয়, ম্যাডাম। শুধু একটা কথা, পয়লা এপ্রিল বা জানুয়ারির চার তারিখে এমন কি কিছু ঘটেছিল যার সঙ্গে বিকাশবাবু জড়িত?”

নীলাঞ্জনা অবাক হয়ে তাকালেন। একটু ভেবে বললেন, “না, তেমন তো কিছু মনে পড়ছে না।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর টাইম।”

নীলাঞ্জনার কাছ থেকে ফেরার পথে ওঁর একটা কথা একেনবাবুর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল ‘এক হাতে তালি বাজে না। তালে তাল না দিয়েও ম্যানেজ করা যায়’। নীলাঞ্জনার দাবি বিকাশ সেন মেড অ্যাডভান্সেস, নীলাঞ্জনা স্টপড দ্যাট। সত্যিই কি তাই? বাধা পেয়েই কি বিকাশ সেন সুবোধ বালক হয়ে গিয়েছিলেন না সেই সম্পর্ক তলে তলে

চলছিল সতর্কভাবে? স্বামী আর বিকাশ সেন দু-জনকেই ম্যানেজ করে তিনি চালাচ্ছিলেন। একটা জিনিস পরিষ্কার, সোজাসুজি অকপট ভাবে স্বামীর সঙ্গে বিকাশবাবুকে নিয়ে ওঁর আলোচনা হয়নি। হয়ে থাকলে নিজের বাড়িতে একেনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এত আপত্তি হত না। দ্যাট মেকস সেন্স, কিন্তু তাতে ধাঁধার উত্তর মিলছে না। জেলাস হাসব্যান্ড হিতাহিত শূন্য হয়ে স্ত্রীর প্রেমিককে খুন করতে পারে, কিন্তু সেই বডি টেনে নিয়ে সোনাগাছিতে ফেলে আসা অবিশ্বাস্য! সেটা করতে পারে একমাত্র কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার। নীলাঞ্জনার স্বামী যদি সে-রকম চরিত্রের হতেন তাহলে এ ব্যাপার নিয়ে শুধু অশান্তি করে এতদিন কাটিয়ে দিতেন না। নীলাঞ্জনাও অক্ষত থাকতেন না।

এখন পর্যন্ত একেনবাবু ক্লুলেস। শুধু নীলাঞ্জনা নয়, মল্লিকার কাছ থেকেও তেমন কোনো তথ্য উদ্ধার হয়নি যার থেকে খুনের মোটিভটা আঁচ করা যায়। মল্লিকার প্রেগন্যান্ট হবার ব্যাপারটাই ধরা যাক। ঠিক আছে, বিকাশ সেন না হয় তার দায়িত্ব এড়াচ্ছিলেন, তাহলেও মলয় বা আর কাউকে দিয়ে এভাবে খুন করে লাভটা কী? গাত্রদাহ মেটানো? নাঃ, তাতে অঙ্কটা ঠিক মেলে না। সন্তান বড়ো করার জন্যে মল্লিকার প্রয়োজন অর্থের। এতে কোনো অর্থপ্রাপ্তি নেই। বিকাশবাবুকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা মল্লিকা হয়তো করেছিল বন্ধু মলয়কে দিয়ে, এই পর্যন্তই। মাথাফাটা রতনের দিক থেকেও বিকাশবাবুকে মারার কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, একজনই শুধু আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয়েছেন তিনি হলেন বিকাশ সেনের স্ত্রী মনীষা। আড়াই কোটি টাকা আজকের যুগে এমন কিছু বড়ো অঙ্ক নয়। বিকাশবাবু খতম হলে প্রেমিককে পাওয়া যাবে সেটা নিশ্চয় আর একটা ইনসেন্টিভ। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই তো দিব্বি পরকীয়া চালাচ্ছিলেন, অসুবিধাটা কোথায়? যদি বিকাশবাবুকে ছেড়ে প্রেমিকের ঘর করতে চাইতেন, তাহলে তো আইনের পথেও এগোতে পারতেন! তবে জানা নেই মনীষা সেন ডিভোর্স চেয়েছিলেন কি না, আর বিকাশবাবুর তাতে আপত্তি ছিল কিনা। সেক্ষেত্রেও সোনাগাছির ব্যাপারটা মিলছে না। নাঃ, একেনবাবু সত্যিই কনফিউসড।

[আমি প্রতিদিনই যতটুকু লিখি রাত্রে খাবার সময় প্রমথকে শোনাই। প্রমথ শোনে, তবে ভাব দেখায় আমি যেন ওর সময় নষ্ট করছি!

একদিন রাগ করে বললাম, “শুনতে চাস, না চাস না?”

“চাই না, তবু শুনব একেনবাবুর কথা ভেবে। তুই যাতে ওঁকে না ডোবাস সেটা তো কাউকে দেখতে হবে।”

এতদিন পর্যন্ত নিজের থেকে কোনো মন্তব্যই প্রমথ করেনি। আজকে হঠাৎ বলল, “এই যে তুই লিখেছিস, একেনবাবু ক্লুলেস, কী করে জানলি? একেনবাবু তোকে বলেছেন?”

“ওটা পোয়েটিক লাইসেন্স, একেনবাবু ঠিক কী ভাবছেন, সেটা কী করে জানব?”

“তোর পোয়েটিক লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, তুই এগুলো ভাবতে পারিস, কারণ তোর মাথায় আর যাই থাক গ্রে ম্যাটারের অভাব আছে। কোনো ইন্ট্যালিজেন্ট লোক এভাবে জিনিসটাকে অ্যানালাইজ করবে না।”

“চুপ কর! এ অবস্থায় তুই কী ভাবতিস?”

“নাম্বার ওয়ান, তুই লিখেছিস... ‘নীলাঞ্জনার স্বামী যদি সে-রকম চরিত্রের লোক হতেন’... কী করে একেনবাবু জানলেন নীলাঞ্জনার স্বামীর চরিত্র? একেনবাবুকে যদ্দুর জানি, ভালো করে যাচাই না করে কারোর সম্পর্কে কোনো ধারণা উনি করেন না।

নীলাঞ্জনার সঙ্গে কথা বলেই স্বামীর চরিত্র উনি বুঝে গেলেন? আরও লিখেছিস 'নীলাঞ্জনাও অক্ষত থাকতেন না'। কী আশা করেছিলি তুই, নীলাঞ্জনার সারা গায়ে কালশিটে থাকবে, না ছুরির কাটা দাগ? নাম্বার টু, তোর মনে হয়েছে বিকাশ মারা গেলে মল্লিকার অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, আর সেটা তুই একেনবাবুর নামে চালিয়েছিস। কেন নেই? ডি-এন-এ অ্যানালিসিস করিয়ে ছেলের পিতৃত্ব প্রমাণ করিয়ে তার জন্যে ও ভরণপোষণ দাবি করতে পারত! বিকাশ বেঁচে থাকলে বরং সেটা করানো সহজ হত না। নাম্বার থ্রি, মনীষার মতো মহিলার ক্ষেত্রেও আড়াই কোটি টাকা তুচ্ছ করার মতো ব্যাপার নয়। আর আড়াই কোটি তো শুধু ইন্সিওরেন্সের টাকা। এ ছাড়াও বাড়ি ও অন্যান্য অ্যাসেট নিশ্চয় আছে। এই টাকা প্লাস যদি প্রেমিককে পাওয়া যায়, তাহলে মন্দ কি? ডিভোর্স করে বিকাশকে ছেড়ে প্রেমিককে বিয়ে করা মানে এর অনেকটাই হারাতে হবে!"

প্রমথর যুক্তি অস্বীকার যায় না। তবে হার মানতে আমি রাজি নই। জিজ্ঞেস করলাম, "হোয়াট অ্যাবাউট সোনাগাছি?"

"দোজ আর ডিটেলস," বলে প্রমথ শুতে চলে গেল!]

।। ৯।।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একেনবাবু চা-য়ে একটা চুমুক দিতে যাচ্ছেন, মোবাইল বেজে উঠল। রাখাল দত্ত।

"স্যার, আপনি এখন কোথায়?"

"বাড়িতে।"

"একটু ওয়াটগঞ্জ এরিয়াতে আসতে পারবেন?"

"এখন?"

"হ্যাঁ স্যার, আরেকটা মার্ডার!"

"আমার গাড়ি তো দশটার সময় আসবে।"

"আপনি স্যার, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসুন। বডিটা সরানোর আগে আপনাকে দেখাতে চাই।"

"ঠিক আছে ভাই, আসছি।"

"সোজা ওয়াটগঞ্জ থানায় আসুন স্যার, আমি অপেক্ষা করছি।"

থানায় পৌঁছোতেই রাখাল দত্ত বললেন, "আমি স্যার, ডিসি সাহেবের পারমিশন নিয়ে নিয়েছি আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করবার জন্যে। আপনি এখন সেমি-অফিশিয়ালি এই তদন্তে আছেন, মানে কাগজপত্রে কিছু সই থাকছে না, কিন্তু লুকোচুরি করে কিছু করতে হবে না।"

"বাঃ, এটা তো গুড নিউজ। এবার বলো কী ব্যাপার?"

"গাড়িতে উঠুন স্যার, বলছি।"

পুলিশের জিপটা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার একেনবাবুর পরিচিত। লম্বা একটা সেলাম ঠুকল। একেনবাবু আর রাখাল দত্ত পিছনে বসলেন। ড্রাইভারের পাশে বসলেন ওয়াটগঞ্জ থানার এক সাব-ইনস্পেক্টর। রাখাল দত্ত বললেন, "মনে হচ্ছে বিকাশ সেনের

আইডেন্টিক্যাল কেস। ২২ ক্যালিবারের হ্যান্ডগান দিয়ে মাথায় গুলি করে খুন করা হয়েছে। ডেডবডি পাওয়া গেছে ওয়াটগঞ্জের লালবাতি এলাকায়। হয়তো সোনাগাছিতেই বডিটা ফেলে আসার প্ল্যান ছিল, কিন্তু গত আট দিন হল সোনাগাছিতে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ টহল চলছে।"

"ইন্টারেস্টিং। কিন্তু সোনাগাছিতে বডি ফেলে আসবে ভাবছিলে কেন?"

"বলছি। তার আগে বলি, যিনি খুন হয়েছেন তার নাম তন্ময় দত্ত। খুনটা কোথায় করা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে ঘড়ি, মোবাইল, পয়সাকড়ি সবকিছুই হাওয়া। খুনি বা খুনিরা, অথবা অন্য কেউ পরে ওগুলো সরিয়েছে। ভাগ্যক্রমে প্যান্টের একটা গুপ্ত পকেটে রাখা ক্রেডিট কার্ড, লাইব্রেরি কার্ড আর ড্রাইভার্স লাইসেন্স সবার চোখ এড়িয়ে গেছে। যাইহোক, খোঁজখবর করে এখনও পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, সেটা হল ভদ্রলোক একজন এন.আর.আই। নিউ ইয়র্কের কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। যাদবপুরের ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে মাস ছয়েক আগে এসেছিলেন।"

"এর মধ্যেই এতগুলো খবর জেনে ফেললে? যাই বলো ভাই, অ্যামেজিং!"

"তা নয় স্যার। ওয়াটগঞ্জ থানার ওসি-র সঙ্গে যাদবপুরের এক মাস্টারমশাইয়ের খুবই চেনাজানা। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি কার্ড দেখে ওসি সেই মাস্টারমশাইকে ফোন করেন। লাকিলি সেই মাস্টারমশাই তন্ময় দত্তকে চিনতেন। তাঁর কাছ থেকেই খবরগুলো পাওয়া গেছে।"

"তিনি কি বডি আইডেন্টিফাই করেছেন?"

"না, এখনও করেননি। কেন, আপনি কি ভাবছেন তন্ময় দত্তের আইডেন্টিটি কেউ ডেডবডির পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে?"

"সবই সম্ভব। তন্ময়বাবু ম্যারেড না সিঙ্গল?"

"বোধহয় ম্যারেড, কিন্তু মাস্টারমশাই সে ব্যাপারে শিওর নন। কোথায় কার সঙ্গে থাকতেন তার খোঁজ চলছে। যেটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং, সেটা হল বুকপকেটে একটা কাগজ পাওয়া গেছে তাতে লেখা 'your number 1/2'।"

"1/2? বিকাশ সেনের পকেটে তো 1/4 পাওয়া গিয়েছিল!"

"এক্স্যাক্টলি। সেই একই ভাবে কাগজ থেকে কেটে সংখ্যাগুলো আঠা দিয়ে সাঁটা হয়েছে। ছাপা অক্ষরগুলো দেখতে একই রকম, তবে কাগজের কোয়ালিটি মনে হয় আলাদা।"

"কোন কাগজের কোয়ালিটি? যে কাগজের টুকরো আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে, না যার ওপর লাগানো হয়েছে?"

"যেগুলো লাগানো হয়েছে। আগের কাগজের কোয়ালিটি ভালো ছিল। এটা কাটা হয়েছে সাধারণ কোনো কাগজ থেকে, সম্ভবত জেরক্স করা কাগজ।"

"ইন্টারেস্টিং। ধরে নিচ্ছি এই কাগজেও কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওনি।"

"না, পাওয়া যায়নি। গুলিটা ব্যালিস্টিক টেস্টের জন্যে পাঠানো হয়েছে, বিকাশ সেন আর তন্ময় দত্তকে একই হ্যান্ডগান দিয়ে খুন করা হয়েছে কিনা জানতে।"

"আই সি, তা তুমি এখন কী ভাবছ?"

"ভাবছিলাম কপিক্যাট মার্ডার হতে পারে কিনা, সেইজন্যেই বলছিলাম সোনাগাছির কথা।।"

"কপিক্যাট মার্ডার ভাবছ কেন? কাগজ থেকে কেটে আঠা দিয়ে সংখ্যা আটকানোর ব্যাপারটা তো বাইরের লোকদের জানার কথা নয়, ভিতরের লোক হলে অবশ্য অন্য

কথা। যাইহোক, ব্যালিস্টিক টেস্টের রেজাল্ট পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এখন বলো, টাইম অফ ডেথ কখন?”

“রাত্রে কোনো একটা সময়,” এবার সামনে বসা সাব-ইনস্পেক্টরটি উত্তর দিলেন। “ভোর পাঁচটা নাগাদ বডিটা দেখতে পেয়ে লোকাল চায়ের দোকানের একটা ছেলে আমাদের ফোন করে। এসে দেখি রাইগার শুরু হয়ে গেছে, তারমানে অন্তত ঘণ্টা তিন-চার আগে মারা গেছে।”

“ছেলেটা ওখানে কী করছিল?”

“সকালে ওই সময়ে এসে নোংরা কাপ-ডিশগুলো ধোয়, একটু ঝাঁট-ফাট দেয়। মালিক আসে ছ’টা নাগাদ।”

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই ওঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছোলেন। রাখাল দত্তের সঙ্গে একেনবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন লাশটাকে। দামি ড্রেস শার্ট আর প্যান্ট পরা বছর পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে একজন লোকের দেহ রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে নোংরা একটা গলিতে নর্দমার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথার পিছনে চাপ চাপ রক্ত জমাট বাঁধা, সেখানে মাছি ভনভন করছে। এক পায়ে জুতো নেই। জুতোটা একটু দূরে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। কাছেই রক্তের কালো কালো দাগ। বড়ো রাস্তা থেকে ডেডবডিকে টেনে এনে নর্দমার পাশে ফেলা হয়েছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আশেপাশের লোকদের ইতিমধ্যেই পুলিশ অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, অস্বাভাবিক কিছুই পাওয়া যায়নি। চায়ের দোকানের মালিকের ছোটো ভাই দোকানেই ঘুমোয়। গভীর রাত্রে সে নাকি একটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, লোকের পায়ের আওয়াজও। কিন্তু এ-রকম আগেও দু-একবার শুনেছে, তাই উঠে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। কখন গাড়ির আওয়াজ শুনেছে অবশ্য বলতে পারেনি, তবে সে ঘুমাতে গেছে রাত এগারোটা নাগাদ। অতএব, গাড়িটা তার পরে এসেছিল।

বডিটা যে তন্ময় দত্তের সেটা পুলিশ সেই দিন দুপুরেই নিশ্চিত হল। ওয়াটগঞ্জের ওসি-র পরিচিত সেই অধ্যাপক মর্গে এসে দেহটা শনাক্ত করে গেলেন। তন্ময় দত্তের মোবাইল নম্বর অধ্যাপক জানতেন। মোবাইল কোম্পানির রেকর্ড দেখে জানা গেল ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ টলি ক্লাবের কাছাকাছি কোনো জায়গায়। তারপর থেকে সেটা আর চালু করা হয়নি। টলি ক্লাবের কাছাকাছি কোথাও খুন করা হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় একাধিক দুষ্কৃতি এর সঙ্গে জড়িত। নালার ধারে যেখানে বডি ফেলা হয়েছে, সেখানে কাদায় কয়েকটা জুতোর ছাপ। তবে ভিড় করে আসা জনতার পায়ের চাপে সেগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তার মধ্য থেকেই অন্তত দুটো আলাদা জুতোর ছাপ পুলিশ উদ্ধার করেছে। ছাপগুলো গভীর। এখন পর্যন্ত পুলিশের যা থিওরি সেটা হল বডিটা সম্ভবত দু-জন দুষ্কৃতি মিলে চ্যাংদোলা করে নিয়ে নালার ধারে ফেলেছে। বডির এক্সট্রা ভারে তাদের জুতো কাদার মধ্যে বেশি ডেবে গেছে। দলে হয়তো আরও একজন ছিল, গাড়ির চালক। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, কেন বডিটা টেনে নিয়ে অত দূরে ফেলার অকারণ রিস্কটা ওরা নিল! গাড়ি থেকে নেমে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে যেতে হয়েছে। রাস্তায় ফেলে দিলেই তো চুকে যেত! তা না করে অতগুলো বস্তিঘরের পিছনে আবর্জনা ভর্তি নোংরা নালায় কেন ফেলতে হল! ঘরগুলোতে যৌনকর্মীরা খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করে। গভীর রাতেও সেখানে অনেক সময়ে খদ্দের থাকে। কারোর নজরে পড়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা। একেনবাবু এখন প্রায় নিশ্চিত হলেন এটা কপিক্যাট মার্ডার নয়, রিস্কটা বাড়াবাড়ি রকমের বেশি।

সন্ধ্যার সময়ে রাখাল দত্তের ফোন পেলেন একেনবাবু। ব্যালিস্টিক টেস্ট পজিটিভ। অর্থাৎ একই হ্যান্ডগান দিয়ে বিকাশ সেন আর তন্ময় দত্তকে খুন করা হয়েছে। আর কাগজে ছাপা অক্ষরে যে সংখ্যাদুটো পাওয়া গেছে, সেগুলোর সঙ্গে বিকাশ সেনের পকেটে পাওয়া ছাপা অক্ষরগুলোর কোনো তফাৎ নেই। মনে হয় জেরক্স করা হয়েছে একই ম্যাগাজিন বা কাগজ থেকে। অর্থাৎ সন্দেহ নেই যে দু-জনেই খুন হয়েছেন একই দলের হাতে। কিন্তু 1/4 আর 1/2 — এই দুটো ভগ্নাংশের অর্থটা কী? বোঝাই যাচ্ছে একটা মেসেজ, কিন্তু কী মেসেজ? এটা তারিখ নয়, বাড়ির ঠিকানাও নয়। ইংরেজি অক্ষর A-কে 1, B-কে 2, ইত্যাদি ধরলে 1/4 আর 1/2 হবে A/D আর A/B । কী অর্থ হতে পারে সেগুলোর? একেনবাবু আকাশ-পাতাল ভেবেও হদিশ পেলেন না।

পরদিন থেকে টিভি এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এই নিয়ে তুমুল আলোড়ন শুরু হল। তন্ময় দত্ত নিরীহ অধ্যাপক, বইপত্র ও ছাত্রদের নিয়ে সময় কাটাতেন। চোদ্দ বছর বিদেশে ছিলেন। সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো, বিবাহ, অধ্যাপনা—সবকিছু। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ বলতে ছিল বছরে একবার কয়েক সপ্তাহের জন্য মা-কে দেখে যাওয়া। এইবারই মা খুব অসুস্থ বলে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি থেকে স্যাবাটিক্যাল নিয়ে যাদবপুরে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে এসেছিলেন। আমেরিকান বউ, দুই ছেলেকে নিয়ে নিউ ইয়র্কেই আছেন। পুলিশ করছেটা কী? বুঝছে না যে, কলকাতার লালবাতি অঞ্চল এখন শুধু রমরমিয়ে দেহব্যবসা, চোলাই মদের ঠেক আর গুন্ডা-বদমায়েশদের রাজত্ব নয়, বিকৃতমনস্ক খুনিদেরও তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে! খুনির দলের একটা নামকরণও হয়ে গেল, 'রেডলাইট কিলারস'। এদের টার্গেট বিকাশ সেন, তন্ময় দত্তের মতো স্বচ্ছল সফল প্রতিষ্ঠিত বাঙালি যুব সমাজ।

মাত্র দুটো খুন থেকে এতবড়ো সিদ্ধান্তে কী ভাবে আসা হল, সে নিয়ে অবশ্য দু-একজন প্রশ্ন তুললেন। তাদের উলটে প্রশ্ন করা হল, প্রথমে 1/4, তারপর 1/2— এই সংখ্যাগুলোর অর্থ কী? এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে অশনি সংকেত! এইসব চেঁচামেচির যা স্বাভাবিক ফল সেটাই হল, রাখাল দত্ত অস্বাভাবিক চাপের মধ্যে পড়লেন। মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র-সচিব, কমিশনার, ডিসি সবাই চাপ দিচ্ছেন, কয়েকদিনের মধ্যে দোষীকে অ্যারেস্ট করতে হবে— বাস্তবে যেটা অসম্ভব!

এরমধ্যে তন্ময় দত্তের স্ত্রী লিজ দত্তের ছবি বড়ো করে কয়েকটা পত্রিকায় উঠল। প্লেন থেকে নামছেন, স্বামীর শেষকৃত্য ও অন্যান্য করণীয় কাজগুলি করতে। একাই এসেছেন, বাচ্চাদের দাদু-দিদিমার কাছে রেখে। পরদিন একটা পত্রিকায় ছোট্ট ইন্টারভিউও ছাপা হল। লিজের কোনো সময়েই কলকাতা ভালো লাগত না। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে শুধু একবার এসেছেন। এবার দ্বিতীয়বার এবং নিঃসন্দেহে এটাই শেষ। লিজের বক্তব্য, একমাত্র মায়ের টানেই তন্ময় আসত, কলকাতার প্রতি ওরও কোনো আকর্ষণ ছিল না।

এটা কতটা সত্য না স্বামীকে সদ্য হারিয়ে শোকার্ত স্ত্রীর বিলাপ, কে বলতে পারে! একেনবাবুর মাথায় এখন ঘুরছে... প্রতি বছরই তন্ময় দত্ত আসতেন, মাকে দেখতেই নিশ্চয় আসতেন। এসে আর কী করতেন, যার জন্যে ওঁর এই পরিণতি হল? বিকাশ সেনের হত্যাকাণ্ড আর তন্ময় দত্তের খুন হওয়া কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, না এর মধ্যে যোগ আছে? সেক্ষেত্রে ওঁদের পরিচিত জগতে কে বা কারা আছে যারা দু-জনকেই চিনত! এ নিয়ে নিশ্চয় পুলিশ খোঁজখবর শুরু করেছে, পরে রাখাল দত্তের কাছ থেকে উদ্ধার করতে

হবে। আপাতত একেনবাবুর প্রথম কাজ হল তন্ময় দত্তের মা-র সঙ্গে যোগাযোগ করা। ঠিকানাটা রাখালবাবুর কাছে পেয়ে গেলেন।

তন্ময় দত্তের মা একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। হার্টের রুগী, তার ওপর কোমর ভেঙে প্রায় এক বছর ধরে শয্যাশায়ী। ছেলের মৃত্যুর নিদারুণ সংবাদ ছাড়াও নিজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা ভেবে তিনি প্রায় বাকশক্তি রহিত। একেনবাবু ওঁর কাছে যতক্ষণ ছিলেন, প্রায় পুরো সময়টাই উনি কেঁদে গেলেন। অসংলগ্ন ভাবে ছেলের স্মৃতিচারণ করলেন। ছোটোবেলায় স্বামী জোর করে ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তারপর বেনারসে ফার্মাসি পড়তে চলে গেল। সেখান থেকে আমেরিকা। ছেলেকে কাছে পাননি সারা জীবন। নাতি-নাতনিকেও শুধু একবারই দেখেছেন বৃদ্ধা। হিন্দুস্থান পার্কে যে বাড়িতে বৃদ্ধা আছেন, সেটা উনি ছেলেকে গিফট করে দিয়েছেন গত বছর। পুরোনো আমলের বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি। আশেপাশে সবগুলোই এখন চারতলা অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে গেছে। মায়ের শরীরের কথা ভেবে তন্ময় দত্ত বাড়িটাকে প্রোমোটারের কাছে দেওয়ার কথা ভাবেননি। ছেলের বউ এখন কী করবে কে জানে! বউ লিজ দত্ত কলকাতায় এসেছে সেটা বৃদ্ধা শুনেছেন। তবে কলকাতায় এসে লিজ শাশুড়ির সঙ্গে একবারও দেখা করেননি। আছেন একটা ফাইভ স্টার হোটেলে।

হিন্দুস্থান পার্ক থেকে একেনবাবু যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে গেলেন। সেখানে তন্ময় দত্তের বেশ কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা হল। সকলেই শকড। শুনলেন উনি সকাল সকাল ইউনিভার্সিটিতে আসতেন, নিজের রিসার্চ আর পড়ানো নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে মিশতেন না তা নয়। বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় তা কারোর সঙ্গেই ছিল না। একজনের কথায় 'হি ওয়াজ এ লোনার'। ইউনিভার্সিটির বাইরে কী করতেন, কেউই জানে না। তবে মাঝে মাঝে বাড়িতে বেশ দেরি করে ফিরতেন, সেটা ওঁর মায়ের থেকে একেনবাবু উদ্ধার করেছিলেন। কোথায় যেতেন মা জানতেন না। নিশ্চয় কোনো বন্ধু-টন্ধু হবে। তবে ইউনিভার্সিটির কেউ নয়, সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে এটাই একেনবাবুর মনে হল। ওঁর আন্ডারে রিসার্চ করছিল একটি ছাত্রী, বেশ মিষ্টি চেহারা। তাকেও প্রশ্ন করলেন কিছুক্ষণ। স্যারের প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই উদ্ধার হল না। ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে গাড়ি ভাড়া করলে জানা যেত কোথায় কোথায় ওঁর যাতায়াত ছিল। কিন্তু উনি ঘুরতেন ট্যাক্সি নিয়ে।

রাখালবাবু অনুরোধ করলেও তন্ময় দত্তের মৃত্যু নিয়ে একেনবাবু মাথা ঘামাতেন না। উনি এসেছেন বিকাশ সেনের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে, কলকাতা পুলিশের সমস্যা মেটাতে নয়। ঘটনাচক্রে এখন যা মনে হচ্ছে দুটো রহস্যের সমাধানই হয়তো এক। একটা ব্যাপার নিয়ে একেনবাবু এতদিন তেমন ভাবেননি। তন্ময় দত্তের খুনের পরে সেটা নিয়েও ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন। হিন্দুস্থান পার্কের মতো প্রাইম লোকেশনে একটা বাড়ি থাকা মানে প্রোমোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অসাধু প্রোমোটারদের এখন রমরমা। তন্ময় দত্তের মৃত্যুতে প্রোমোটারদের হাত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তন্ময়বাবুর মায়ের অবশ্য ধারণা কোনো প্রোমোটারের সঙ্গে তন্ময়বাবুর যোগাযোগ হয়নি। সব কথা ওঁর পক্ষে জানা বা এই অবস্থায় মনে রাখা সম্ভব নয়। প্রোমোটারদের সঙ্গে কথা না হলেও জমি-বাড়ির মালিককে খুন করে সেটা দখল করার ঘটনা আগে ঘটেছে। তন্ময় দত্তকে সরিয়ে দিলে তার বিদেশি বউ জমিবাড়ি দখল নিয়ে কলকাতায় এসে কোর্টকাছারি করতে পারবে না, এটা যে-কেউ বুঝবে। এখন প্রশ্ন হল, বিকাশ সেনের

মৃত্যুর সঙ্গেও কি কোনো প্রোমোটার যুক্ত? কিন্তু সেক্ষেত্রে সোনাগাছি বা ওয়াটগঞ্জের নিষিদ্ধ পাড়ার ব্যাপারটা আসছে কেন? পুলিশকে ভুল পথে চালাবার চেষ্টা?

এদিকে একেনবউদি ভীষণ রেগে গেছেন। কলকাতায় এসে পর্যন্ত একেনবাবু নিজের কাজে দৌড়োদৌড়ি করছেন, একদিন থিয়েটার দেখা ছাড়া একসঙ্গে কোথাও বেড়াতেও বেরোননি।

"আজ তুমি সন্ধ্যায় কোথাও যাবে না। আমার সঙ্গে বেরোবে।"

"কোথায়?"

"অরবিন্দ অ্যাসোসিয়েশনের মেলায়।"

"অন্য কোথাও চলো না!"

"না, মেলায়।"

মেলা-টেলায় যেতে একেনবাবু একেবারেই পছন্দ করেন না। একেনবউদির একটা স্বভাব আছে মেলায় গেলেই বাড়ি সাজানোর জন্যে টুকিটাকি নানান জিনিস কেনা। কেন ওগুলো কিনতে হয় অনেক ভেবেও একেনবাবু তার সদুত্তর পাননি। আলমারি, আলমারির মাথা, ড্রেসিং টেবিল, দেয়াল, বই রাখার তাক যেখানেই রাখার এতটুকু জায়গা আছে, সেখানেই একটা না একটা কিছু হ্যান্ডিক্র্যাফট শোভা পাচ্ছে! নতুন যা আসবে সেখানেই গুঁতোগুঁতি করে রাখতে হবে। তাতে একেনবাবুর কোনো সমস্যা নেই। হাবিজাবির মধ্যেও তিনি দিব্বি শিব হয়ে থাকতে পারেন। মুশকিল হল ধুলোবালি নিয়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই জিনিসগুলোর উপরে ধুলোর একটা আস্তরণ পড়ে যায়। একেনবউদির ঘর সাজানোর জিনিস বলে কাজের মেয়েটি ওগুলো মুছতে ভয় পায়। বিরক্ত হয়ে শেষে একেনবউদিই কাজটা করেন। যেদিন সে কর্মকাণ্ডটি হয় সেদিনটা একেনবাবুর কাছে ভয়াবহ। একেনবউদি একেবারে ফায়ার হয়ে থাকেন। ভাগ্যক্রমে এখন নিউ ইয়র্কে আছেন বলে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কম। কলকাতায় থাকার সময়ে দু-একবার মোছামুছির ব্যাপারে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে ভালোর থেকে মন্দ হয়েছিল বেশি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে একেনবাবুকে 'সি' গ্রেডের বেশি দেওয়া যায় না, আর একেনবউদি চান 'এ-প্লাস' গ্রেড-এর হেল্পার।

একেনবউদিকে সন্তুষ্ট করতেই ছ'টা নাগাদ বউদিকে নিয়ে একেনবাবু মেলার দিকে রওনা দিলেন। জায়গাটা খুব দূরে নয়। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা থাকলে গাড়িতে বড়োজোর মিনিট কুড়ি। যাবার পথেই শুনলেন দোলা ওখানে একটা বুটিকের দোকান দিয়েছে, সেটাকে পেট্রোনাইজ করতে হবে। একেনবাবু ওঁর এই মাসতুতো শালি দোলাকে পছন্দ করেন, ভারি হাসিখুশি। উৎসাহে সবসময়ে টগবগ করছে আর অজস্র কথা বলে। স্বামী অনির্বাণ ঠিক তার উলটো, ঘরে আছে কি নেই বোঝা যায় না। অনির্বাণ ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করে। দোলার কোনো কাজ না করলেও চলত। আগে দোলা শুধু সমাজসেবাই করত, এখন বেলতলা রোডে নিজের বাড়ির একতলায় একটা বুটিক খুলেছে। ডিজাইন ওর, কিন্তু দুঃস্থ মেয়েদের দিয়ে শাড়ি, ব্লাউজ, কামিজ, টেবিল সেটিং হরেক রকমের জিনিস তৈরি করায়। দোলা যে আজকাল মেলাতেও দোকান দিচ্ছে সেটা একেনবাবু জানতেন না।

মেলার বেশির ভাগ দোকানই মাঠে। বাঁশের কাঠামোর ওপর ত্রিপল খাটিয়ে দোকানগুলো সাজানো। কয়েকটা দোকান পাকা দালানের ভেতরে, খেয়াল না করলে সেগুলো চোখে পড়বে না। দোলার দোকানটা ওই পাকা দালানের একটা কোণের ঘরে। দোকানটা সাজিয়েছে চমৎকার। পিছনে সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের দুলাই টাঙানো। ওটাই

নাকি দোলার স্পেশালিটি। সামনের টেবিলে থরে থরে ন্যাপকিন, ক্যারি ব্যাগ, টেবিল ক্লথ, প্লেসম্যাট ইত্যাদি রয়েছে। বাচ্চা ও বড়োদের কিছু কামিজ, ফ্রক আর ব্লাউজও চোখে পড়ল। কিন্তু বাজে লোকেশনের জন্যে মেলার আসল ভিড়টা মনে হয় পাচ্ছে না।

"দেখতে খুব ভালো লাগছে তোর দোকানটা, বিশেষ করে পিছনের দুলাইগুলোর জন্য," একেনবউদি বললেন।

"ওই সাজিয়েছে," ওর হেল্পার মেয়েটিকে দেখাল দোলা। "আমার হাত অতদূর যায় না। কিন্তু এত সাজিয়ে লাভটা কী হচ্ছে দিদি?"

"কেন, একেবারেই বিক্রি হচ্ছে না?"

দোলার কথা শুনে একেনবাবু বুঝলেন, একেবারেই যে কিছু বিক্রি হচ্ছে না, তা নয়। তবে স্টল নিতে যে ভাড়াটা গুনতে হয়েছে, সেটা উঠবে কিনা তা নিয়ে বেচারা চিন্তিত। একেনবউদি দোলার দোকান থেকে একটা ন্যাপকিন সেট আর একটা দুলাই কিনলেন। জিনিসগুলো দোলার জিম্মায় রেখে দু-জনে দালান বাড়ি থেকে নেমে মেলার মাঠের দিকে এগোলেন। এমন সময়ে একেনবাবুর চোখে পড়ল কাছেই একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে হাত-ভাঙা একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটির মুখ চেনা-চেনা। একেনবাবুর সঙ্গে মেয়েটির চোখাচোখি হতেই থতোমতো খেয়ে চকিতে সেখান থেকে অদৃশ্য হল। আরে, মেয়েটা তো মল্লিকা! ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে মল্লিকাকে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করার সুযোগ একেনবাবু পেলেন না। লোকটিও অন্যদিকে হাঁটা দিয়েছে। যে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল, সেটা একটা জামাকাপড়ের বুটিক। দোকানে মধ্যবয়সি একজন মহিলা বসে। পাশের বেঞ্চে একটি বাচ্চা ছেলে, খাতার ওপর কী-সব আঁকিবুকি কাটছে! পিছনে দাঁড়িয়ে চেক-শার্ট পরা যে ছেলেটি জামাকাপড় গুছিয়ে তুলে রাখছিল, তার বয়সও বেশি নয়। একেনবাবু মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম। একটু আগে এখানে দাঁড়িয়ে যে দু-জন গল্প করছিলেন, তাঁদের আপনি চেনেন?"

"কার কথা বলছেন?"

"ওই যে ভদ্রলোক যাঁর হাত ভাঙা।"

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন। দোকানের হেল্পার ছেলেটি সামনে এগিয়ে এল, "কার খোঁজ করছেন, মলয়দার?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে আমার একটা দরকার ছিল। আমি এদিকে আসতে আসতেই উনি চলে গেলেন। তুমি জানো ভাই, কোথায় ওঁর দেখা পাব?" ছেলেটা বয়সে অনেক ছোটো বলেই 'স্যার' কথাটা মুখে এল না।

"আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। ক'দিন হল চলে গেছেন।"

"কোথায় গেছেন?"

"তা তো জানি না।"

"পাড়ার কেউ কি জানেন কোথায় গেছেন?"

"বলতে পারব না, বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। আজকে অনেকক্ষণ এখানে ঘোরাঘুরি করছিলেন, হয়তো আবার আসবেন। যদি অপেক্ষা করেন এখানেই দেখা পেয়ে যাবেন।"

"বাড়িওয়ালার ঠিকানাটা কী ভাই?"

"বাড়ি চিনি, ঠিকানা তো বলতে পারব না।"

"রাস্তার নামটা?"

যে রাস্তার নামটা ছেলেটি বলল, সেই রাস্তার ঠিকানাই মল্লিকা দিয়েছিল।

একেনবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন মলয়কে খোঁজার চেষ্টা করবেন না। এখন মনে হচ্ছে করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে হঠাৎ করে মল্লিকার সঙ্গে মলয়ের এখানে দেখা হয়নি। নইলে একেনবাবুকে দেখে মল্লিকা এভাবে অদৃশ্য হত না, মলয়ও নয়। মল্লিকার জন্যেই মলয় এখানে অপেক্ষা করছিল। কেন? এর উত্তরটা জানা দরকার। এইসব কথাবার্তার ফাঁকে একেনবাবু খেয়াল করছিলেন বাচ্চা ছেলেটা বারবার ওঁর দিকে তাকাচ্ছে আর টুকটুক করে কী জানি খাতায় লিখছে। একটু মজাই লাগল, কী লিখছে ছেলেটা! মুখ ফিরিয়ে ভালো করে ওর দিকে তাকাতেই খাতা নিয়ে ছুট লাগাল।

"দেখ তো কোথায় পালাল? ছেলেটাকে এনে হয়েছে এক জ্বালা!" দোকানি মহিলা একটু বিরক্ত হয়ে একেনবাবুকে এক ঝলক দেখে হেল্পার ছেলেটিকে বললেন।

"দেখছি মাসিমা," বলে সেও ছুটল।

একেনবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন। ও ভাবে বাচ্চাটার দিকে তাকানোটা বোধহয় ঠিক হয়নি।

এইসবের মধ্যে একেনবউদি কোথায় চলে গেছেন কে জানে! ভিড়ের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেতেই অনেকটা সময় কেটে গেল। তারপর দু-জনে মিলে দোকানে দোকানে কিছুক্ষণ ঘুরলেন। এক জায়গায় গান-বাজনা হচ্ছিল সেখানেও দাঁড়ালেন। বেশ কিছু চেয়ার ফাঁকা পড়েছিল।

"বসবে নাকি? একেনবউদিকে জিজ্ঞেস করলেন।

"না। চলো, জিনিসগুলো নিয়ে বাড়ি যাই।"

দোলার দোকানে জিনিসগুলো তুলতে এসে দেখলেন দোকানের সামনে একটি লোকও দাঁড়িয়ে নেই। কাজের মেয়েটিও অদৃশ্য। বুথে অবশ্য দোলা একা নয়। পাশে যে বসে আছে, তাকে দেখে একেনবাবু আশ্চর্য হলেন! খাতা হাতে সেই ছোট্ট ছেলেটি! একেনবাবুকে দেখা মাত্র ছেলেটা আবার পড়ি কি মরি করে দৌড় লাগাল!

"ছেলেটা কে?"

"বুনুদি-র ছেলে। মাথায় একটু গোলমাল, কিন্তু ভারি লক্ষ্মী। ছবি আঁকতে ভালোবাসে বলে বুনুদি ওর দোকানে আজ নিয়ে এসেছে। এক জায়গায় বসিয়ে রাখে কার সাধ্যি!"

"পালাল যে! হারিয়ে যাবে না তো?"

"হারাবে কেন, ওই তো ছোটোন ওর পিছন পিছন গেল।"

ছোটোন হয়তো সেই হেল্পার ছেলেটি। এ নিয়ে আর ভাবলেন না একেনবাবু। শালিকে জিজ্ঞেস করলেন, "একেবারে একা যে ম্যাডাম দোলা, তোমার কাজের মেয়েটি গেল কোথায়?"

"খেতে গেছে।"

"বিক্রিবাটা কিছু হল?"

"কিচ্ছু বিক্রি হচ্ছে না, জামাইবাবু। দু-হাজার টাকা দিয়ে স্টল ভাড়া করেছি, আপনাদের কেনাটা বাদ দিয়ে সারা দিনে আটশো টাকার জিনিস বিক্রি হয়েছে কিনা সন্দেহ।"

"ওরে বাবা, স্টলের জন্যে দু-হাজার টাকা দিতে হয়!" এত টাকা দিয়ে স্টল ভাড়া করতে হয় একেনবাবুর ধারণাই ছিল না।

"তাও তো এখানে কম।"

"টাকা ওঠে কী করে, কত টাকার জিনিস বেচতে হয়?"

"অন্তত সাত-আট হাজার টাকার। নইলে কিছুই হাতে থাকে না, পরিশ্রমই সার। তিনটে বড়ো বড়ো স্যুটকেসে মাল নিয়ে ট্যাক্সি করে এসেছি। যেগুলো বিক্রি হবে না, সেগুলো নিয়ে আবার ট্যাক্সি করে ফিরতে হবে। দুটো মেয়ে পালা করে আমার সঙ্গে এখানে বসে, তাদের টাকা দিতে হবে। এবার অনির্বাণ ভীষণ রাগারাগি করবে। বার বার আমায় বলে মেলায় দোকান না দিতে।"

"ঠিকই তো বলে, দিস কেন?" একেনবউদি বোনকে একটু বকলেন।

"কী যে বলো দিদি, মাস তিনেক আগে বিজয়গড়ের মেলায় কী দারুণ বিক্রি হয়েছিল বিশ্বাস করতে পারবে না!

"কত হয়েছিল?" একেনবাবু প্রশ্ন করলেন।

"প্রথম দিনই পনেরো হাজার টাকার ক্যাশ-সেল, একটা চার হাজার টাকার হ্যান্ড-পেন্টেড কামিজ বিক্রি করেছিলাম ওখানে।"

বিস্মিত একেনবউদি বললে, "সেকি রে, তুই এত দামের কামিজ এইসব মেলায় বিক্রি করার জন্য আনিস?"

"বিক্রির জন্য আনি না, আনি ডিসপ্লে করার জন্য। এক ভদ্রলোক দেখে বললেন, 'এটা কার ডিজাইন?' বললাম, 'আমার।' একটু খ্যাপা লোকটা। বললেন, 'সত্যি বলছেন?' তখন সত্যি কথাটাই বললাম, 'ডিজাইনটা আমি পেয়েছি দুঃস্থ আশ্রমের এক মেয়ের কাছ থেকে।' জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দাম?' বাড়িয়েই বললাম, 'চার হাজার টাকা।' ভেবেছিলাম দাম শুনে পালাবে। মোটেও না। ক্যাশ টাকা দিলেন, তবে সেই সঙ্গে আরও প্রশ্ন। 'মেয়েটি কোথায় থাকে?' বললাম, 'সে আর বেঁচে নেই।' 'কোথায় থাকত?' 'নারী-উদ্ধার আশ্রমে।' 'আপনাকে কেন ডিজাইনটা দিল?' এইরকম কত যে প্রশ্ন, বিশ্বাস করবে না।"

"একটা কামিজ কিনতে এত প্রশ্ন?" একেনবউদি একটু অবাক হয়ে বললেন।

"কত রকমের লোক যে আসে দোকানে! আর চার হাজার টাকা দিয়ে কিনছে, একটু না হয় বললামই কথা তার সঙ্গে।"

"তা এই মহিলাটি কে, যার দৌলতে তুই চার হাজার টাকার কামিজ বিক্রি করতে পারলি?"

"রাস্তা থেকে তুলে আনা এক এইডসের রোগিণী, একেবারে শেষ অবস্থায় ছিল। নারী-উদ্ধার আশ্রমে যখন ভলেন্টিয়ারি করতাম, তখন মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে গিয়ে গল্প করতাম যাতে কষ্ট ভুলে থাকতে পারে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আমি বুটিকের জিনিস তৈরি করি শুনে বলল, 'আমার কাছে একটা সুন্দর ডিজাইন আছে, তোমাকে সেটা দিতে পারি।' একটা কামিজের উপর হ্যান্ড-পেন্ট করা ডিজাইন। কামিজটা বহু পুরোনো। কিন্তু যত্ন করে রাখা ছিল বলে ডিজাইনটা নষ্ট হয়নি। সেটাই কপি করে কামিজটা বানাই। কেউ যে চার হাজার টাকা দিয়ে ওটা কিনবে কল্পনাই করিনি!"

একেনবউদি বললেন, "টাকা থাকলে, অনেক কিছুই করা যায়। আমাদের নেই বলেই পারি না। কামিজের কথা ছেড়ে দে, চার হাজার টাকার শাড়ি পরতে কি ইচ্ছে হয় না?"

দোলা বলল, "কেন চার হাজার টাকার শাড়ি নিশ্চয় জামাইবাবু তোমায় একটা দিতে পারে।"

একেনবাবু দেখলেন, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মোড় নিচ্ছে। একেনবাবুর বহু জুনিয়র কলিগ কারণে অকারণে বউদের ঢালাও উপহার দেয়। একেনবাবুর সে ক্ষমতা

নেই। কেন নেই, সেটা একেনবউদি জানেন না তা নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কষ্ট পান যখন দেখেন জুনিয়ার অফিসারের বউয়ের গলায় ঝকঝকে হিরের নেকলেস। ওঁর তো বিয়েতে পাওয়া সেই সিকি ভরি সোনার হার।

ভাগ্যিস এই সময়ে রাখাল দত্তের একটা ফোন আসায় ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ল। আবার মার্ডার! এবার খুন হয়েছেন রেস্টুরেন্টের এক মালিক, ইনিও বয়সে ইয়াং। ক'দিন অন্তর অন্তর কলকাতায় উচ্চবিত্ত যুবকরা খুন হচ্ছে, অথচ অপরাধীদের ধরা যাচ্ছে না। রাখাল দত্ত বলতে গেলে একেবারে 'অ্যাট হিস উইটস এন্ড'।

"আপনি এখন কোথায়?"

"একটা মেলায়।"

"কখন বাড়ি ফিরছেন?"

ফোনের মুখে হাত রেখে একেনবাবু কাঁচুমাচু মুখে একেনবউদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কখন আমরা বাড়ি ফিরছি?"

"কেন?"

"রাখাল জানতে চাইছে।"

"দেখছিস তো, এই হল ওর মেলায় আসা!" দোলাকে কথাটা বলে একেনবাবুকে বললেন, "বলো আমরা আসছি।"

"আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরছি।" রাখালকে জানিয়ে দিলেন একেনবাবু।

"তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমি ডিনার সেরে আপনার ওখানে একবার ঢুঁ মারব।"

দোলা একটা ব্যাগে দুলাই আর ন্যাপকিন সেটটা ভরে রেখেছিল। সেটা নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দু-জনে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

[রাত্রে যখন প্রমথকে এই পরিচ্ছেদটা শোনালাম ও বলল, "তুই এখনও ঝেড়ে কাশতে শিখলি না। লিখলেই পারতিস একেনবাবুর সমস্যাটা আর্থিক নয়, ঘুষ না নিয়েও উনি বউকে হিরের হার কিনে দিতে পারেন। সমস্যা হল উনি হাড় কেপ্পন! আরেকটা কথা, তুই লিখেছিস মেলা হচ্ছে বাড়ি থেকে কুড়ি মিনিটের পথ। একেনবাবুর বাড়ি কোথায় সেটা তো কোথাও লিখিসনি।"

"লেখার দরকার আছে কি? আমি তো আগেই বলেছি, জায়গার নাম পালটেছি, একটার ঘাড়ে আরেকটা চাপিয়েছি।"

"ননসেন্স! তাহলে তো সবকিছু নিউ ইয়র্কে ঘটছে লিখলেই পারতিস। এদিকে সবিস্তারে মেলার বর্ণনা দিচ্ছিস, লিখছিস কে কোথায় থাকে, কোথায় একেনবাবু গেলেন, অথচ একেনবাবুর বাড়ি কোথায়, কোত্থেকে তিনি নানান জায়গায় যাচ্ছেন পাঠকদের জানার উপায় নেই। এটা তো ফান্ডামেন্টাল ফ্ল। ভালোকথা, অরবিন্দ অ্যাসোসিয়েশনের মেলাটা কোথায় হচ্ছিল?"

"অরবিন্দ সামথিং, অ্যাসোসিয়েশন কিনা মনে নেই। তবে মেলাটা হচ্ছিল রিজেন্ট পার্কে, ডায়েরিটা একবার চেক করতে হবে।"

"ঠিক আছে, চেক করে সেটা লেখ। আর সেই সঙ্গে লিখে দে, একেনবাবু মনোহর পুকুরে থাকেন। ঠিকানা না দিতে চাস, দিস না।"

আমি কিছু বললাম না, কিন্তু বয়েই গেছে ওর কথা শুনতে।]

।। ১০ ।।

রাত ন'টা নাগাদ রাখাল দত্ত এলেন। তার আগেই অবশ্য একেনবাবু খুনের খবরটা টিভি-তে পেয়ে গেছেন। ভবানীপুরে কদমতলা বাইলেনে একজন খুন হয়েছে। কে খুন হয়েছে এখনও জানা যায়নি। কারণ খুন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে জায়গাটা ব্লক করে দিয়েছে, কোনো রিপোর্টারকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। বডি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত যিনি খুন হয়েছেন, মিডিয়ার কাছে তিনি অপরিচিত নন। সেইজন্যেই এই লুকোচুরি। তদন্তের স্বার্থে এখন কিছু বলা হবে না। কাল সকালে একটা প্রেস রিলিজ দেওয়া হবে।

এরমধ্যে মহানাগরিক সমিতির এক কর্তা জ্বালাময়ী ইন্টারভিউ দিয়েছেন। পর পর তিনটে খুন, আর আমাদের লালবাজারের পুলিশ এখন পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে আছে— শেম, শেম! নিষ্কর্মা পুলিশেরা জেনে রাখুক, জনগণ এটা বরদাস্ত করবে না। দুটো খুনের পর থেকে ওদের ওপর অভিযোগের যে ঝড় শুরু হয়েছে, সেটা এবার ভয়াবহ কালবৈশাখী হয়ে দাঁড়াবে। পুরো লালবাজার কাঁপবে, পুলিশের বহু কর্তা গদি হারাবেন, মন্ত্রীরাও ছাড় পাবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাখাল দত্ত যে প্রচণ্ড স্ট্রেসের মধ্যে আছেন বুঝতে অসুবিধা হয় না। চুল উশকোখুশকো, চোখ লাল। ওঁর ওই বিধ্বস্ত চেহারা দেখে একেনবাবু বললেন, "করেছ কী ভাই, ইনভেস্টিগেশন শেষ করার আগে, তুমিই তো ফিনিশ হয়ে যাবে। বসো বসো, একটু চা খাও।"

"এই রাতে চা খাব না, বরং এক গ্লাস জল দিন বউদি।"

পুরো এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে খেয়ে রাখাল দত্ত বসলেন।

"যিনি খুন হয়েছেন তাঁর নাম অরূপ চৌধুরী। অরূপ ওয়াজ এ সাকসেসফুল ম্যান। বয়স বছর আটতিরিশ। তিন-তিনটে রেস্টুরেন্টের মালিক, তারমধ্যে একটা হল 'দ্য নাইট'— পার্ক স্ট্রিটে কলকাতার নামিদামি লোকদের রাঁদেভ্যুর জায়গা। ডিজি সাহেবও তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে বহুবার সেখানে খেতে গেছেন। অরূপকে উনি পার্সোনালি চেনেন। তাই আমাদের ওপর হুকুম সাত দিনের মধ্যে খুনিকে ধরা চাই। বলুন স্যার, এটা কি সম্ভব! যাকে তাকে তো খুনি বলে ফাঁসিতে লটকানো যায় না!"

"এখন বুঝছি ভাই, মিডিয়া নয়— এটাই হল তোমার আসল সমস্যা।" সহানুভূতি দেখিয়ে একেনবাবু বললেন।

রাখাল দত্ত চুপ করে রইলেন।

"ডিজি সাহেবের সঙ্গে অরূপবাবুর এত চেনাজানা হল কী করে?"

"ঠিক বলতে পারব না, মনে হয় আলাপ হয়েছিল ওই রেস্টুরেন্টেই। রেস্টুরেন্টের পাশেই অরূপের অফিস। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই রেস্টুরেন্টে অরূপ বসত।"

'বসতেন' না বলে 'বসত'? খটকা লাগল একেনবাবুর। নামের পিছনে 'বাবু' বাদ দিলেও রাখাল দত্ত এ-রকম ভুল করে না। কিন্তু সে নিয়ে মাথা ঘামালেন না। বললেন, "আই সি। কদমতলা বাইলেন রাস্তাটা কেমন জানি চেনা চেনা লাগছে। ওখানে অরূপবাবু কী করতে গিয়েছিলেন জানো?"

"জায়গাটার কাছেই ওর আরেকটা রেস্টুরেন্ট 'গরম ভাত'। সেটা অবশ্য 'দ্য নাইট'-এর মতো ফ্যান্সি নয়।"

"'গরম ভাত' মিস্টার চৌধুরীর! আমি তো ওটা দেখেছি, হাজরা আর নফর কুণ্ডু লেনের মোড়ে, তাই না?"

"এক্স্যাক্টলি। কদমতলা বাইলেন নফর কুণ্ডু লেন থেকে বেরিয়েছে।"

"ওই রেস্টুরেন্টে কি উনি নিয়মিত আসতেন?"

"যদ্দুর জানি, না। 'গরম ভাত'-এর দুটো ব্রাঞ্চ। একটা ভবানীপুরে, আরেকটা বেহালায়। দুটোই দেবু বলে এক ম্যানেজার চালান। তাঁকেও এইমাত্র জেরা করে এসেছি। যেটুকু উদ্ধার করেছি, সেটা হল 'গরম ভাত' নিয়ে অরূপ খুব একটা মাথা ঘামাত না। ক্যাশ-ট্যাশগুলো দেবুই হ্যান্ডেল করতেন। প্রতি শনিবার সকালে দেবু অরূপের পার্ক স্ট্রিটের অফিসে গিয়ে হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিয়ে আসতেন। তবে অরূপ কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ করে হাজরা বা বেহালায় গিয়ে ওয়েটার, কুক, দারোয়ান সবার সঙ্গেই আলাদা ভাবে কথা বলত। দেবুকে কাজের ভার দিলেও অরূপ অবভিয়াসলি 'ট্রাস্ট বাট ভেরিফাই'-তে বিশ্বাসী ছিল।"

"আই সি। এটাও কি সে-রকম একটা সারপ্রাইজ ভিসিট ছিল?"

"তাই তো মনে হয়। অরূপ যে আসছে দেবু জানতেন না। দেবু নিজেও হাজরায় ছিলেন না, ছিলেন বেহালা ব্রাঞ্চে।"

"সেটা সত্যি কিনা খোঁজ নিয়েছ?"

"এখনও নেওয়া হয়নি, তবে নিচ্ছি। অবশ্য মনে হয় না দেবু মিথ্যে কথা বলছেন বলে।"

"ইন্টারেস্টিং। তারপর?"

"অরূপ রেস্টুরেন্টে ঢোকেনি। রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে নামতেই, একটা কালো রঙের টাটা সুমো উলটো দিক থেকে পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই গাড়ির ভেতর থেকেই কেউ ওকে গুলি করে। মাটিতে পড়ে যেতেই গাড়ি থেকে দু-জন নেমে ধরাধরি করে ওকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছিল। দূরে দুটো ছেলে দাঁড়িয়েছিল, তারা চেঁচিয়ে ওঠে। সেই শুনে লোকদুটো বডি ফেলে রেখে গাড়িতে উঠে চম্পট দেয়। ঠিক ওই সময়ে হাজরা রোড থেকে একটা পুলিশ পেট্রল নফর কুণ্ডু লেনে ঢুকছিল। তারা যখন কদমতলার মোড়ে আসে, গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

"গাড়ির নম্বর পাওয়া গেছে?" একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"না। অন্ধকারে দূর থেকে নম্বরটা দেখা যায়নি। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য নম্বর দেখেও বিশেষ লাভ হয় না। তবে গাড়িটা কালো রঙের টাটা সুমো, সে বিষয়ে দুটো ছেলেই নিশ্চিত। পুলিশের পেট্রল কার থেকে ফোন পেয়ে ভবানীপুর থানার লোক এসে সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা কর্ডন করে। আমি গিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখেছি। এবার কোনো এভিডেন্স নষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়নি।"

"কী বোঝা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত?"

"অরূপের মার্ডারের সঙ্গে আগের দুটো মার্ডারের এক দিক থেকে কোনো তফাৎ নেই। আততায়ী ২২ ক্যালিবারের হ্যান্ডগান ব্যবহার করেছে। গুলিটা সাইড থেকে মাথায় লেগেছে। আমার ধারণা একই হ্যান্ডগান থেকে গুলি করা হয়েছে, তবে ব্যালিস্টিক টেস্টের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কনফার্ম করা যাবে না। অবভিয়াসলি খুনিরা এবার ডেডবডি ডাম্প করার সুযোগ পায়নি। উদ্দেশ্য নিশ্চয় সেটাই ছিল, নইলে মৃতদেহটা গাড়িতে তোলার চেষ্টা করেছিল কেন!"

"পুলিশ যখন কাছে গেল ভদ্রলোক কি তখনও বেঁচে ছিলেন?"

"কয়েক মিনিট বেঁচে ছিল, তবে কথা বলার শক্তি ছিল না।"

"ধরে নিচ্ছি এবার কোনো কাগজ পাওয়া যায়নি।"

"না স্যার, পাওয়া গেছে। তবে পকেটে নয়, কাছেই রাস্তার ওপরে। সেটাই আমি খুঁজছিলাম, পেয়েও গেলাম। আগের মতো একই ভাবে কাগজ কেটে লাগানো। তাতে লেখা 'your number 75'। তাড়াহুড়োতে খুনিরা পকেটে ঢোকাতে পারেনি। গাড়ি নিয়ে পালাবার সময় ফেলে দিয়ে গেছে।"

"এটা তো কনফিউসিং ভাই, 75 কেন?"

"আমিও তাই ভাবছি স্যার। ভগ্নাংশ থেকে একেবারে দু-অঙ্কের সংখ্যা!"

"মেসেজ কিছু একটা নিশ্চয় আছে। কিন্তু কী, সেটাই প্রশ্ন। এই শেষ সংখ্যাটাই কেমন জানি গুলিয়ে দিচ্ছে।"

"আগের দুটোতে কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন নাকি স্যার?"

"মনে হচ্ছিল, এখন বুঝছি সেটা ভুল। ফ্র্যাঙ্কলি আমি লিটল কনফিউসড। ভালোকথা, তোমাদের ক্রাইম ল্যাব থেকে কোনো খবর পেয়েছ, কোত্থেকে আগের কাগজগুলো কাটা হয়েছে?"

"না স্যার, এখন পর্যন্ত কিছুই পাইনি।" উত্তরটা রাখালবাবু দিলেন ঠিকই, তবে ঠিক বুঝলেন না সেটা জেনে লাভ কী! ওঁর মাথায় তখন অন্য দুশ্চিন্তা।

"মাত্র সাত দিন সময় আছে স্যার। আমাদের এই ডিজি সাহেব যা লোক, তারপরেই জঙ্গলমহলে ট্র্যান্সফার।"

"দাঁড়াও ভাই, একটু ভাবি। বিকাশ সেনের হত্যাকাণ্ড আর শেষের এই দুটোও তো মনে হচ্ছে একই সূত্রে বাঁধা। একটার কিনারা হলে সুতো ধরে টান দিলে সবগুলোই বেরিয়ে আসবে। একটা জিনিস করবে ভাই?"

"বলুন।"

"একটু খোঁজ নিয়ে দেখো তো বিকাশ সেনের কোনো বাড়ি বা জমিজমা কলকাতায় আছে কিনা?"

"আপনি ভাবছেন, খুনের সঙ্গে প্রোমোটার জড়িত?"

"হয়তো নয়। তবু সম্ভাবনাটা বাদ দেবার আগে একটু খতিয়ে দেখা দরকার।"

"'হয়তো নয়' কেন?" উত্তরটা রাখাল দত্ত বোধহয় জানেন, তাও প্রশ্নটা করলেন।

"কারণ এই কাগজে লেখা সংখ্যাগুলো। প্রোমোটার এইভাবে কাগজে নম্বর সেঁটে খুন করতে যাবে কেন?"

"তা ঠিক। কিন্তু খুনি প্রোমোটার যদি আমাদের ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তো এই রকম কিছু একটা করেই ভুল পথে নিয়ে যাবে।"

"এটা মন্দ বলোনি ভাই," মাথা নাড়লেন একেনবাবু। "একেবারে মোক্ষম বলেছ! ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য ভালো অস্ত্র। যাইহোক, যে-তিনটে কাগজ পাওয়া গেছে, সবগুলো আমায় দেখাতে পারবে?"

"কালকেই নিয়ে আসব। কপি হলে চলবে?"

"আগে কপিটাই আনো। দরকার হলে পরে তোমাদের ক্রাইম ল্যাবে গিয়ে অরিজিন্যালটা দেখে আসব। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা□ কলকাতায় কতগুলো কালো রঙের টাটা সুমো আছে?"

"সেটার খোঁজ করা হচ্ছে। তবে গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন কলকাতার নাও হতে পারে।"

"ট্রু," একেনবাবু মাথা নাড়লেন। "আর একটা কাজ করো তো ভাই, খোঁজ নাও এই

ধরনের গাড়ি কেউ সোনাগাছি বা ওয়াটগঞ্জ এরিয়াতে দেখেছে কিনা।”

“সেটার খোঁজও করছি। মুশকিল হল, ওখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এখন পর্যন্ত প্রায় কিছুই জানা যায়নি। মনে হয় না বিশেষ কিছু জানা যাবে বলে। আসলে পুলিশের ওপর ওদের আস্থা নেই। কেউ যদি কিছু দেখেও থাকে, ভয়ে ভয়ে বলবে না, পাছে পুলিশ তাকে ফাঁসিয়ে দেয়।”

“যে-সব এন.জি.ও ওই এলাকাতে কাজ করে তাদের সাহায্য নাও না। তাদের কেউ যদি কিছু জানাতে পারে।”

রাখাল দত্ত এটা ভাবেননি। “ঠিক আছে স্যার, কয়েকটা গ্রুপকে চিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।”

“আর কী জেনেছ অরূপ চৌধুরী সম্পর্কে?”

“অরূপ সম্পর্কে অনেক খবর জানি,” রাখাল দত্ত বললেন। “এমনিতে মিশুকে লোক ছিল, কিন্তু তেমন ভাবে গভীর ঘনিষ্ঠতা কারোর সঙ্গে ছিল না। বাইপাসের উপর একটা মাল্টিস্টোরি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে একা থাকত। বিয়ে করেছিল, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যেই ডিভোর্স হয়ে যায়। রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় নেমেছিল বছর পাঁচেক আগে, তার আগে ইন্সিওরেন্স বেচত। ‘দ্য নাইট’ রেস্টুরেন্টটা এক সময়ে ওর মাসি-মেসোর ছিল। নামেই মাসি-মেসোর, আসলে মেসোর। মেসো ছিলেন বিহার ক্যাডারের আইপিএস অফিসার। টু-পাইস নিশ্চয় কামিয়েছিলেন, নইলে কলকাতায় ওরকম একটা ফাইভ-স্টার রেস্টুরেন্ট খোলার ক্ষমতা অরূপের হত না। যাইহোক, মাসির কোনো ছেলেপুলে না থাকায়, মাসির অংশটা অরূপকে দান করেন। মেসো বেশ কয়েক বছর হল রিটায়ার করেছেন। এখন বৃদ্ধ মাসি-মেসো কলকাতার লেক টাউনে একটা বাড়ি করে রয়েছেন।”

“আমি সত্যিই মুগ্ধ,” একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। “এর মধ্যেই তুমি এত সব খবর জেনে ফেলেছ!”

“তার কারণ ওঁর এক্স-ওয়াইফ ললিতা রায়কে আমি বিয়ের আগে থেকেই চিনি। আমাদের পাড়ায় এক সময়ে থাকত। প্রেম করে ওদের বিয়ে হয়েছিল। ডিভোর্সের পরে ওরা কেউই আর বিয়ে করেনি। ললিতা সল্টলেকে পৈতৃক বাড়িতেই আছে। বেচারা খুবই আপসেট। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও, ওদের মধ্যে খুব একটা তিক্ততা ছিল না।”

“ডিভোর্স হবার পরেও ভালো রিলেশন! সচরাচর এটা বেশি দেখা যায় না। ডিভোর্স হয়েছিল কেন?”

“মিউচুয়াল কনসেন্ট।” রাখাল দত্ত একেনবউদি কাছাকাছি আছেন কিনা দেখে একটু ইতস্তত করে বললেন, “আমার ধারণা অরূপ ওয়াজ ইম্পোটেন্ট।”

“ইম্পোটেন্ট!”

“কথায় কথায় ললিতা একবার ওরকমই একটা হিন্ট দিয়েছিল ফিজিক্যাল নয়, সাইকোলজিক্যাল কোনো প্রব্লেম।”

“তোমার সঙ্গে তো ভাই এই ললিতা ম্যাডামের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মনে হচ্ছে!” একেনবাবু একটু ফাজলামি করেই বললেন। রাখাল দত্ত লজ্জা পেলেন। “স্যার, আমরা ছোটোবেলা থেকে বন্ধু।”

“তারমানে তুমি অরূপকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনো।”

“চিনি মানে...।”

“উত্তর দিতে না চাইলে দিও না ভাই।”

"আসলে স্যার," রাখাল দত্ত আবার একটু ইতস্তত করলেন, "ললিতা যখন অরূপের সঙ্গে প্রেম করা শুরু করেছিল, তখন আমি ওর জীবন থেকে একটু সরে গিয়েছিলাম। ওর ডিভোর্সের পর আবার যোগাযোগ হয়।"

"আই সি।" একেনবাবু এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে রাখাল দত্তকে বিব্রত করলেন না। বললেন, "অরূপ চৌধুরীর বিয়ের আগের জীবন সম্পর্কে কিছু জানো?"

"ললিতার কাছ থেকে যতটুকু শুনেছি, অরূপ খুব ছোটো বয়সেই বাবা-মাকে হারায়। ওর স্কুল কলেজ সব কিছু কলকাতার বোর্ডিং স্কুল আর হস্টেলে থেকে। খরচ জোগাতেন মেসো। ছুটি-ছাটাতে ওঁদের কাছে গিয়ে অরূপ থাকত। মাসি-মেসো নিজের ছেলের মতো করেই ওকে বড়ো করেছিলেন। বাবা-মাকে হারানোর জন্যেই বোধহয় ছেলেবেলার স্মৃতি নিয়ে কোনো কথাই অরূপ বলত না।"

একেনবাবু কিছু বললেন না, চোখ বুজে পা নাচাতে লাগলেন।

"ও আরেকটা ব্যাপার," রাখাল দত্ত বললেন। "তবে মনে হয় না তেমন ইম্পর্টেন্ট বলে।"

"কী?" পা নাচানো থামিয়ে একেনবাবু চোখ খুললেন।

"ললিতার সঙ্গে অরূপের মাসি-মেসোর এখনও খুব যোগাযোগ আছে। মেসো বোধহয় ডিমেনশিয়া বা ওরকম কিছুতে ভুগছেন। ক্ষণে ক্ষণেই সব ভুলে যান। হঠাৎ ভীষণ ভয় পেতে শুরু করেছেন উনি খুন হবেন ভেবে। এরমধ্যে লেক টাউনের পুলিশকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছেন। কেন এই অহেতুক ভয়, সেটা অবশ্য বলতে পারেননি। ললিতাকেও ওঁর ভয়ের কথা জানিয়েছেন।"

"উনি খুন হবেন বলে ভয় পাচ্ছেন, অথচ খুন হলেন শালির ছেলে! দ্যাটস ইন্টারেস্টিং, বাট মেকস নো সেন্স!" একেনবাবু আবার পা নাচাতে শুরু করলেন।

"হ্যাঁ, তাই বলছি ব্যাপারটা মনে হয় আন-রিলেটেড। ডিমেনশিয়া বা ওই ধরনের রোগে ভুগলে অনেক সময়ে লোকে প্যারানয়াতেও ভোগে, ভাবে কেউ কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।"

"আমিও তাই শুনেছি। তাছাড়া যাঁরা খুন হয়েছেন সবাই এক বয়সি। অরূপবাবুর মেসো ডাজ নট ফল ইন দ্য সেইম ক্যাটেগোরি অফ ভিক্টিমস।" বলে চেয়ার থেকে উঠে সামনের দেরাজ খুলে একটা সিগারেট প্যাকেট নিয়ে এলেন একেনবাবু। একটা সিগারেট বের করে সেটা ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে বললেন, "ব্যাড হ্যাবিট ভায়া, ওদেশে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখানে এসে আবার একটা-দুটো খাচ্ছি।"

রাখাল দত্ত সিগারেটের ধোঁয়া একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। ধোঁয়ার সামনে থেকে মুখটা সরালেন, তাও কাশি এল।

একেনবাবু সেটা দেখে বললেন, "বদার করছ ভাই, তাই না?"

রাখাল দত্ত ভদ্রতা করে কিছু বললেন না।

"নাঃ, আর খাব না। নিউ ইয়র্কে গেলে তো সেই ছাড়তেই হবে। একটা শেষ টান দিয়ে একেনবাবু অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজতে গুঁজতে বললেন, "দেয়ার হ্যাস টু বি এ কানেকশন... এবারেও যদি ব্যালিস্টিক অ্যানালিসিসের রেজাল্ট এক হয়, তারমানে সবাই এক হ্যান্ডগানের গুলিতেই মারা গেছে... ভাই রাখাল, উই আর মিসিং সামথিং... মিসিং সামথিং বিগ! খুনগুলোর মধ্যে কানেকশনটা কোথায়? সেটা বার করতেই হবে। ভালোকথা, অরূপবাবুর মেসো-মাসি মারা গেলে ওঁদের বাড়িটা কে পাবে?"

"ললিতার কাছে যা শুনেছি, তাতে বেঁচে থাকলে অরূপই পেত। ললিতার সঙ্গে

অরূপের ছাড়াছাড়ি হবার পর ওঁরা একটা নতুন উইল করেছেন, তাতে ললিতার জন্যে কিছু ক্যাশ টাকার প্রভিশন আছে। বাদবাকি সব অরূপের।"

"নাউ হি ইজ গন, এখন কী হবে?"

"হয়তো নতুন করে একটা উইল করবেন। কে বলতে পারে?"

"আচ্ছা এই তিনজন বিকাশ সেন, তন্ময় দত্ত আর অরূপ চৌধুরী--- এঁরা কি সবাই বন্ধু?"

"সেটাই খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি। ললিতা বলেছে অরূপ বিকাশকে চিনত। ছেলেবেলায় যখন ও ছুটিতে মাসি-মেসোর কাছে যেত, তখনই হয়তো পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু বিকাশকে ও পছন্দ করত না, বলত বাজে ক্যারেক্টার। তাই দুই পরিবারের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হয়নি।"

"বাজে ক্যারেক্টার মানে?"

"সেটা ললিতা জানে না।"

"হাউ অ্যাবাউট তন্ময় দত্ত?"

"না, ওঁর কথা ললিতা শোনেনি।"

"মনীষা সেনকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছ?"

"এখনও করিনি। তবে আমি ভাবছি, যদি ওঁরা বন্ধুও হন, সো হোয়াট? আমাদের দরকার ওঁদের শত্রুর।"

"এটা মন্দ বলোনি ভাই, সো হোয়াট," একেনবাবু পা নাচাতে নাচাতে বললেন। "যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হল বিকাশবাবু আর অরূপবাবু দু-জনের মধ্যে ছেলেবেলায় হলেও একটা পরিচয় ছিল, যদিও পরে যোগাযোগটা আর থাকে না। কিন্তু তন্ময় দত্তের সঙ্গে ওঁদের কোনো যোগাযোগের সূত্র তো মিলছে না।"

"ঠিক।"

"কিন্তু জানো রাখাল, তুমি যা বললে সেটাই ঠিক।"

"তার মানে?"

"খুঁজতে হবে এঁদের কমন শত্রু। এঁরা পরিচিত না অপরিচিত বড়ো কথা নয়।"

রাখাল দত্ত চলে যাবার পর একেনবাবু ভাবতে থাকলেন ১/৪, ১/২, ৭৫ তিনটে সংখ্যার মধ্যে মিলটা কোথায়? বহু ভেবেও কূল কিনারা পেলেন না। নম্বরগুলো মাথার মধ্যে তালগোল পাকাতে লাগল।

"দেখেছ কাণ্ড!" একেনবউদির কথায় সম্বিত এল।

"কী কাণ্ড?"

"দোলা যে ব্যাগটা দিয়েছে তার মধ্যে একটা এক্সারসাইজ খাতা চলে এসেছে।"

"দেখি।"

খাতাটা হাতে নিয়ে দেখলেন সেখানে কাঁচা হাতে পেন্সিল দিয়ে চিত্র-বিচিত্র ছবি আঁকা। নিশ্চয় সেই বাচ্চা ছেলেটার আঁকা ছবি। দোলার কাছে যখন এসেছিল, নিশ্চয় ব্যাগের ওপর খাতাটা রেখেছিল। ব্যাগটা তোলার সময়ে সেটা ভেতরে ঢুকে গেছে। অন্যমনস্ক ভাবেই ছবিগুলো দেখতে লাগলেন একেনবাবু। হঠাৎ একটা ছবিতে এসে ওঁর চোখ আটকে গেল। হাওয়াই শার্ট পরা রোগা বেঁটে খাড়া খাড়া চুল একটা লোক চেক শার্ট পরা চশমা চোখে একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। আরে, এতো মনে হচ্ছে ওঁকে আঁকা হয়েছে! হেল্পার ছেলেটাকে যখন মলয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তার স্কেচ! উচ্চ স্তরের আঁকা নয়, তবে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটিয়েছে ঠিক। আগের পাতাটা খুললেন একেনবাবু।

একজন মেয়ে হ্যান্ডব্যাগ খুলে টাকা বার করছে বা ঢোকাচ্ছে। হাতে প্লাস্টার করা একটা ছেলে সামনে। যে হাতে প্লাস্টার নেই, সে হাতটা এগিয়ে ধরা। মাই গড! এটা নিশ্চয় মলয় আর মল্লিকার ছবি! হয় মল্লিকা মলয়কে টাকা দিচ্ছে অথবা মলয় দিচ্ছে মল্লিকাকে। মোস্ট ইন্টারেস্টিং!

গভীর রাতে নিউ ইয়র্ক থেকে ফোন এল। অবনী গুপ্তের ফোন। কদ্দুর প্রোগ্রেস হয়েছে জানতে চাইলেন। বিশেষ কিছু এগোয়নি, জানালেন একেনবাবু। তবে আরও দুটো খুনের জন্যে শুধু বিকাশ সেনকে নিয়ে পত্র-পত্রিকা মাথা ঘামাচ্ছে না। অ্যাটেনশানটা আপাতত শেষ খুনের ওপর। অবনী গুপ্তের পক্ষে সেটা অবশ্যই স্বস্তির কথা। ফোন শেষ হতেই ‘দুত্তোর’ বলে একেনবাবু শুয়ে পড়লেন। শুলেন বটে, কিন্তু রাত্রে ভালো ঘুম হল না। নানান চিন্তায় মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে গেল। সকালের দিকে চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে, যদি একটু ঘুম আসে। কিন্তু কলকাতায় কি সেটা হবার জো আছে! সকাল থেকে রাস্তায় চেঁচামেচি, বাড়িতে কাজের লোকদের তাণ্ডব, গাড়ির হর্ন, ফেরিওয়ালাদের চিৎকার। এক কালে হয়তো এর মধ্যেও ঘুমোতে পারতেন। ম্যানহাটানে কয়েক বছর থেকে সে অভ্যাস চলে গেছে।

।। ১১ ।।

[একেনবাবুর সঙ্গে আমাদের ফোনে প্রায়ই কথা হত আগেই বলেছি। ফোনটা আমরাই করতাম সাধারণত। নিউ ইয়র্কের রাত্রে ফোন করলে কলকাতায় সেটা সকাল। একেনবাবু তন্ময় দত্ত সম্পর্কে আমাদের খোঁজখবর নিতে বলেছিলেন। উনি নিউ ইয়র্কের সেন্ট জন’স ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন, সেটা আগেই বার করেছিলাম। যেটা নতুন আবিষ্কার সেটা হল নিউ ইয়র্ক স্টেট বোর্ড অফ ফার্মাসির একজন মেম্বার ছিলেন তন্ময় দত্ত। এই বোর্ডের কাজ হল ওষুধপত্রের দোকানগুলোর ওপর নজরদারি করা এবং যারা ওষুধগুলো বিক্রি করছে, তাদের যোগ্যতা যাচাই করা। সেই সূত্রে অবনী গুপ্তের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। একেনবাবুকে রাত্রে ফোন করলাম। মনে হল একেনবাবু খবরটা জেনে খুশি হলেন। বার বার জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি শিওর স্যার?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ।”

“ঠিক আছে স্যার, আমি একটু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে ফোন করি।” বলে হঠাৎ লাইনটা কেটে দিলেন।]

সকালে চা নিয়ে বিকাশ সেনের ব্যাপারটা একেনবাবু নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। এরমধ্যে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে একটু কথা হল। মারাত্মক একটা খবর! অবনী গুপ্তের দুটো ওষুধের দোকানে নানা রকম অনিয়ম ধরা পড়েছে। পুলিশ স্টেট বোর্ড অফ ফার্মেসির সঙ্গে যোগাযোগ করে এ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে কিছুদিন আগে। বোর্ড থেকে যিনি এ ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করেছিলেন তিনি হলেন তন্ময় দত্ত। ক্রেতাদের অভিযোগ পেয়ে বোর্ডের তরফ থেকে উনিই প্রথম তদন্ত শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনিই প্রধান সাক্ষী। ব্যাপারটা কোথায়

গড়াবে এক্ষুনি বলা যায় না, তবে যতদূরই গড়াক, অবনী গুপ্তের পক্ষে সেটা প্রীতিপ্রদ হবে না। তন্ময় দত্তের মৃত্যুতে অবনী গুপ্তের কিছুটা সুবিধা নিশ্চয় হল। কিন্তু তন্ময় দত্তের খুনে অবনী গুপ্তের হাত থাকা! একটা উদ্ভট চিন্তা। নিউ ইয়র্কে বসে অবনী গুপ্ত কলকাতায় তিন-তিনটে লোককে মারতে যাবেন কেন? বিকাশ সেন ওঁর কোম্পানিকে এখানে প্রোমোট করছে। তাঁকে মেরে লাভ কী? আর সোনাগাছিতে বডি ফেলে আসার যুক্তিটাই বা কী?

আচ্ছা, তন্ময় দত্তর কি অবনী গুপ্তের ওপর কোনো রাগ আছে□ আগের কোনো একটা ব্যাপারে, যার জন্য এত উদ্যম নিয়ে তন্ময়বাবু এই সব অনিয়ম খুঁজতে শুরু করেছিলেন? ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট কি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবেন? সেই অনুরোধটাই করলেন একেনবাবু। আর কিছু না হোক, দু-জনের রেসিউমি পেলে অন্তত বোঝা যাবে□ আগে কোথাও এদের যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিনা। যাইহোক, এই মুহূর্তে এটা অবশ্য এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট নয়।

এসব ভাবনা চিন্তার মাঝখানেই বাইরে কে জানি হর্ন বাজাল। একেনবাবু জানলা দিয়ে দিয়ে দেখলেন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসে গেছে। তখন মনে পড়ল, বড়োপিসি অসুস্থ হয়ে ভবানীপুরের এক নার্সিং হোমে। খবরটা রাত্রে যখন এসেছিল ভিজিটিং আওয়ার্স তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ফোন করে সকাল সকাল উনিই গাড়িটাকে আসতে বলেছিলেন। আমাদের ফোন পেয়ে আর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে কথা বলে সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন!

জামাকাপড় পরে যখন রেডি হচ্ছেন, তখন একেনবউদি বললেন, "তুমি যখন ওদিকে যাচ্ছ, তাহলে আরেকটা কাজ করো। দোলার কাছ থেকে দু-বছরের বাচ্চা মেয়ের জন্য সুন্দর দেখে একটা ফ্রক নিয়ে এসো।"

এই ধরনের অনুরোধকে একেনবাবু সবচেয়ে ভয় পান। প্রথমত সাইজ সম্পর্কে ওঁর কোনো ধারণাই নেই, আর সৌন্দর্যবোধও ওঁর স্ট্রং পয়েন্ট নয়। "ফ্রক নিয়ে কী করবে?"

"টুলুর মেয়ের জন্মদিন।"

টুলু কে? একেনবাবু ঠিক মনে করতে পারলেন না। "টাকা দিয়ে দিলে হত না? ওরা পছন্দমতো কিনে নিত।"

"টাকা দিলে আজকাল দুশো-তিনশো দেওয়া যায় নাকি? আর কিনবে তো দোলার কাছ থেকে, ও কম করে দাম নেবে।"

এই চালে একেনবাবু মাত হলেন।

"তোমায় ভাবতে হবে না, আমি দোলাকে বলে দিয়েছি, ও নিজে পছন্দ করে তোমাকে একটা কিছু দিয়ে দেবে। তুমি শুধু নিয়ে আসবে। পয়সা আমি পরে দিয়ে দেব।"

বাঁচা গেছে! একেনবাবু নিশ্চিন্ত হলেন। "তা এটা বললেই তো পারতে □ দোলার বাড়িতে গিয়ে একটা জিনিস নিয়ে এসো।"

"বললে তো তুমি কত শোনো! প্রমথবাবুর পাঠানো ছবিটা তো এখনও টাঙিয়ে উঠতে পারলে না!"

"এই যাঃ, একেবারেই খেয়াল ছিল না।"

"আমি ওটাকে বাইরের ঘরে টেবিলের ওপরে রেখে দিচ্ছি... যাতে তোমার খেয়াল হয়।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," বলে একেনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

নার্সিং হোমটা আশুতোষ মুখার্জী রোডে, বেলতলা আর হাজরা রোড ক্রসিং-এর মাঝামাঝি জায়গায়। পিসি ঘুমোচ্ছেন। পিসতুতো দুই ভাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে একেনবাবু হাজরা রোড ধরে দোলার বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। পথেই পড়ল নফর কুণ্ডু লেন। গাড়িটা সেখানে ঘুরিয়ে রাস্তায় দাঁড় করাতে বললেন একেনবাবু। 'গরম ভাত' রেস্টুরেন্টের সাইনটা বড়ো করে টাঙানো। রেস্টুরেন্টের সামনে রাস্তায় গোটা দুই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অরূপ চৌধুরীর মৃত্যুর পর রেস্টুরেন্টটা বন্ধ ছিল বলে পত্রিকায় পড়েছিলেন। হয়তো আবার খুলেছে। একেনবাবু ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে এগারোটা। একটু না হয় দেরিই হবে দোলার ওখানে যেতে। গাড়ি দুটোর পিছনে ড্রাইভারকে গাড়ি রাখতে বলে একেনবাবু নেমে পড়লেন। কাচের বড়ো দরজা। ভেতরটা দেখা যাচ্ছে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একেনবাবু সামনে যেতেই পাশে দাঁড়ানো দারোয়ান দরজা খুলে দিল। ভালো করে ব্রেকফাস্ট করে একেনবাবু বেরিয়েছেন খাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাও ঢুকে পড়লেন।

টেবিল বেশি নেই। সেগুলো হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায় মতন করে সাজানো, একটার ঘাড়ে আরেকটা নয়। ওয়েটার মেনু দিতে যাচ্ছিল সেটা হাতে না নিয়ে শুধু কফি অর্ডার করলেন। রেস্টুরেন্টটা একেবারেই ফাঁকা। দূরে কোণের টেবিলে এক কপোত-কপোতি বসে আছে, ব্যাস। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারের বয়স বড়োজোর বছর পঁচিশেক হবে। নাম সত্যব্রত, কথা বলতে ভালোবাসে। নিজেই এগিয়ে গল্প জুড়ল একেনবাবুর সঙ্গে।

"আপনি আগে এসেছেন এখানে?"

একেনবাবু মাথা নাড়লেন, "না। আসলে স্যার, বাইরে থেকে দেখে বেশ লাগল, তাই ঢুকে পড়লাম। খুব সাজানো গোছানো ভেতরটা।"

"আমাদের খাবার স্যার আরও ভালো। আরেকদিন এসে খেয়ে দেখবেন ঠিক বললাম কিনা। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব কিছুই পাবেন।"

"আসব স্যার, আসব। আপনিই এটার ম্যানেজার?"

"না, না, আমি অ্যাসিস্টেন্ট। তবে আমিই এটা চালাই।" কথায় গর্বের ভাব।

একেনবাবু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন দেখে, ছেলেটি বলল, "ক'দিন রেস্টুরেন্টটা বন্ধ ছিল। আজকে যে খোলা হচ্ছে অনেকেই জানেন না, ভিড়টা তাই কম। নইলে এখানে সকাল থেকেই হাউস-ফুল।"

"তাহলে তো আমি লাকি স্যার, বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় খাচ্ছি। আচ্ছা, রেস্টুরেন্টটা বন্ধ ছিল কেন?"

"সেকি, আপনি শোনেননি! আমাদের মালিক অরূপ চৌধুরীর খুন নিয়ে তো হইচই চলছে এখন!"

"ও মাই গড! হ্যাঁ, হ্যাঁ, পত্রিকায় পড়েছিলাম বটে," একেনবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। "ভেরি স্যাড ব্যাপার।"

"আমরা তো ভয় পাচ্ছিলাম রেস্টুরেন্ট উঠেই যাবে, কিন্তু কালকে অর্ডার এল রেস্টুরেন্ট চালু রাখতে হবে।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান স্যার, আপনাদের মালিক তো নেই□ তাহলে অর্ডারটা কে দিলেন?"

"দেবু-দা, মানে দেবু সেন□ উনিই আমাদের ম্যানেজার। স্যার 'দ্য নাইট' নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, এখানে বা বেহালায় খুব একটা আসতেন না। ঘুরে ঘুরে দুটো রেস্টুরেন্ট দেখাশোনা দেবু-দাই বরাবর করেছেন।"

"বেহালা!" একেনবাবু অবাক হওয়ার ভান করলেন।

"'গরম ভাত'-এর একটা ব্রাঞ্চ বেহালাতে আছে।"

"আই সি। কিন্তু আমি একটু কনফিউসড স্যার। দেবুবাবু আপনাদের বস বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনাদের আসল মালিক এখন কে?"

"দেবু-দা সেটা ভালো বলতে পারবেন। আমি যা শুনেছি এই রেস্টুরেন্টগুলোর মালিকানা স্যারের আর স্যারের মেসোর। "

"স্যারের মেসোও কি এখানে মাঝে মাঝে আসেন?"

"না স্যার, উনি শুনেছি খুব অসুস্থ। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ওঁকে চিনিও না। দেবু-দাকে গতকাল ওঁর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। দেবু-দা বললেন, ওসব নিয়ে মাথা না ঘামাতে। আমার তাতে কোনো অসুবিধা নেই। 'স্যার' যখন ছিলেন তখনও দেবু-দার সঙ্গেই ডিল করতাম। ক্যাশ কালেকশন থেকে মাইনেপত্র দেওয়া, সব কিছু দেবু-দাই দেখাশোনা করতেন।"

"তা এখন আপনার কী মনে হচ্ছে? রেস্টুরেন্টটা ঠিকঠাকই চলবে, উঠে যাবে না তো?"

"না, না, উঠে যাবে কেন, দেবু-দা তো আছেন। আমাদের সবাইকে ডেকে ভরসা দিয়ে গেছেন, নট টু ওয়ারি। আসলে দেবু-দার অনেক কানেকশন আছে। এই দেখুন না, রেস্টুরেন্টে কত ছবি টাঙানো আছে, এঁরা সব এখানে খেয়ে গেছেন। দেবু-দা সবাইকে চেনেন।"

"বাঃ," একেনবাবু উঠে ছবিগুলো দেখলেন। বহু খ্যাতনামা লোক সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান, আর্টিস্ট-দের রেস্টুরেন্টে বসে খাবার ছবি। একটা ফটোতে যাঁকে দেখলেন, তাঁকে কিন্তু দেখবেন বলে আশা করেননি। তন্ময় দত্ত!

ছবিটা দেখিয়ে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কে?"

"এঁকে ঠিক চিনতে পারছি না। আসলে অনেক কাস্টমারের ছবি এখানে আছে, সবাই ফেমাস নন।"

"এগুলো কি স্যার পুরোনো ছবি?"

"হ্যাঁ, আমার এখানে আসার আগে থেকেই আছে।

"তা আপনি স্যার এখানে কতদিন আছেন?"

একেনবাবুর 'স্যার স্যার' শুনে ছেলেটি বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিল। এবার বলেই ফেলল, "আমাকে বার বার 'স্যার' বলছেন কেন স্যার?"

"ওটা, আমার অভ্যাস স্যার, চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারি না। ও হ্যাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলাম... এত সুন্দর করে রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন, আপনি কত বছর এখানে আছেন?"

"এই রেস্টুরেন্টে কাজ করছি মাস তিনেক। তার আগে পর্ণশ্রীর রেস্টুরেন্টের ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ছিলাম। সেখানেও মাত্র এক বছর ছিলাম। এত তাড়াতাড়ি হঠাৎ প্রোমোশন পেয়ে যাব আশাই করিনি।" আবার বেশ গর্বের সঙ্গে ছেলেটি বলল।

ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার কথাটা একেনবাবু আগে শোনেননি। তবে কিনা ইংরেজিতে ডেপুটি, জয়েন্ট, অ্যাসিস্টেন্ট আর অ্যাসোসিয়েট দিয়ে পারমুটেশন কম্বিনেশন করে অনেক পদই বার করা যায়। ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট, অ্যাসিস্টেন্ট ডেপুটি, অ্যাসোসিয়েট ডেপুটি, অ্যাসোসিয়েট অ্যাসিস্টেন্ট ইত্যাদি।

"ওয়ান্ডারফুল স্যার, এক বছরের মধ্যে 'ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট' থেকে 'অ্যাসিস্টেন্ট'! আপনি স্যার নিশ্চয় খুব কম্পিটেন্ট ম্যানেজার!"

"আসলে সবই ভাগ্য।" ছেলেটি বলল। "আগে এই ব্রাঞ্চটার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার

ছিলেন মিস মল্লিকা। স্যার হঠাৎ খোঁজ পেলেন ওঁর ক্যারেক্টার খারাপ।”

“খারাপ!”

“কল গার্ল। দিনে রেস্টুরেন্ট চালাতেন, রাত্রে লোকদের... বুঝতে পারছেন তো স্যার কি বলছি?”

একেনবাবু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

“আমার ধারণা এখানকার খরিদ্দারদেরও কেউ কেউ রাতে মিস মল্লিকার খদ্দের ছিলেন। সেই নিয়ে একদিন স্যারের সঙ্গে মিস মল্লিকার ফাটাফাটি হয়ে যায়। স্যার সঙ্গে সঙ্গে ওকে বরখাস্ত করে দেবু-দাকে বলে আমাকে এখানে নিয়ে আসেন।”

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “মিস মল্লিকার পুরো নামটা জানেন স্যার?”

“না, পদবি-টা জানি না। মল্লিকা ম্যাডাম বলেই সবাই এখানে চিনত।”

“এখানে আর কেউ আছেন স্যার, যিনি সেই সময়ে এখানে কাজ করতেন?”

“না, আমি আসার পর ‘স্যার’-এর হুকুমে সবাইকে ছাঁটাই করতে হয়। বহু কর্মচারী মিস মল্লিকাকে পছন্দ করত। সেই জন্যেই মনে হয়। দেবু-দা অবশ্য সবার জন্যেই ‘স্যার’-এর কাছে তদবির করেছিলেন, ‘স্যার’ কাউকে রাখতে রাজি হননি।”

“যারা আগে এখানে ছিল, তাদের কাউকে আপনি চেনেন স্যার?”

“একজনকে চিনি। হাজরার রোডের উলটোদিকে যে ধাবাটা আছে, সেখানে ছেলেটা কাজ করছে।”

“কী নাম?”

“বলরাম। ছেলেটা ভালো, মাঝে মাঝে আসে আমার কাছে।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।” একেনবাবু কফির দাম চুকিয়ে উঠে পড়লেন।

‘গরম ভাত’ রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে হাজরা রোডের সেই ধাবার সামনে গিয়ে নামলেন। ধাবার মালিককে নিজের পুরোনো পুলিশি পরিচয় দিয়ে খোঁজ করলেন বলরামের। কয়েক মিনিটের মধ্যে বছর কুড়ি বয়সের একটি ছেলে বাইরে বেরিয়ে এল। বলরামের কাছ থেকে যা উদ্ধার করলেন, তা একটু আগে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের কাছেই শুনেছিলেন। বলরাম শুধু যোগ করল, মল্লিকা ম্যাডামও ছেড়ে কথা বলেননি। বসকে বলেছিলেন এর ফল ভোগ করতে হবে।

“মল্লিকা ম্যাডামকে তুমি কতদিন চেনো ভাই?”

“প্রায় দু-বছর। ম্যাডাম আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। স্যার ওঁকে মিথ্যে মিথ্যে তাড়িয়েছিলেন। আমার মনে হয়, অন্য কোনো কারণ ছিল।”

“কী কারণ?”

“তা বলতে পারব না। আমি চলি বাবু, বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে মালিক রাগ করবেন।” একেনবাবুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলরাম চলে গেল।

ফিরে এসে গাড়িতে উঠে দোলার বাড়ির দিকে যেতে যেতে একেনবাবু ভাবতে লাগলেন, মল্লিকাকে যে-রকম সোজা সহজ ভেবেছিলেন, মোটেই তা নয়। অরূপ চৌধুরী আর বিকাশ সেন, দু-জনের ওপরেই যে মল্লিকার রাগ ছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মল্লিকার নিজের পক্ষে এদের একজনকেও খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের মোহিনী শক্তি দিয়ে অন্য কাউকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা নিশ্চয় তার আছে। মাথাফাটা

রতনও এর মধ্যে জড়িত থাকতে পারে। আর মলয়ের সঙ্গে টাকার লেনদেনের যে ব্যাপারটা মেলায় ঘটল, সেটা কী? মলয়কেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। হোয়াট অ্যাবাউট দেবু সেন? মল্লিকাকে নিশ্চয় সেই নিযুক্ত করেছিল। সেও কি মল্লিকার বন্ধু? আগে না হলেও রেস্টুরেন্টের সূত্রে নিশ্চয় ভালোই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দেবু সেনের একটা ফাইনানশিয়াল ইন্টারেস্ট থাকতে পারে অরূপ চৌধুরীকে খতম করার। অরূপ চৌধুরীর মেসোকে টাকাকড়ি নিয়ে ধোঁকা দেওয়া নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত সহজ। খোঁজ নিতে হবে 'দ্য নাইট'-ও এখন দেবু সেন দেখছে কিনা! সত্যিকারের ইনকাম তো সেখান থেকেই। সমস্যা হল তিনটে খুন মেলাতে গেলেই জটিলতা। হ্যাঁ, মল্লিকাকে 'কল গার্ল' বলার প্রতিশোধ নিতে ডেডবডি দুটোকে সোনাগাছি বা ওয়াটগঞ্জ এলাকায় ফেলে আসার মধ্যে একটা প্রতীকি ব্যাপার থাকতে পারে, যদিও তাতে ধরা পড়ার রিস্কটাও বহুগুণ বেশি। তর্কের খাতিরে না হয় সেটা মানা গেল। কিন্তু তন্ময় দত্তকে খুন করার কী মোটিভ থাকতে পারে মল্লিকা বা দেবু সেনের? তন্ময় দত্ত যে 'গরম ভাত'-এ খেতে এসেছেন রেস্টুরেন্টের একটা ফটো তার প্রমাণ। তন্ময়ের সঙ্গে কি মল্লিকার প্রথম আলাপ এই 'গরম ভাত'-এই হয়েছিল? দু-জনের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল? তন্ময় দত্ত যে দেরি করে বাড়ি ফিরতেন, তার সঙ্গে কি মল্লিকা জড়িত? প্রশ্ন অনেক, অভাব উত্তরের। তবে এই তিনটি মৃত যুবকের কমন লিঙ্ক যে মল্লিকা, সেই সন্দেহ এখন জোরদার হচ্ছে।

চিন্তায় ছেদ পড়ল। আবার রাখাল দত্তের ফোন।

"স্যার আপনি কোথায়? আমি দুটো নাগাদ আপনার বাড়ি আসছি ক্রাইম সিন-এ পাওয়া কাগজগুলোর কপি নিয়ে।"

"আমি এখন বাড়ি নেই, কিন্তু তুমি আসার আগেই চলে আসব।"

"একটা বড়ো খবর দিই, ওয়াটগঞ্জ এলাকার এক এন.জি.ও জানিয়েছে এক সেক্স-ওয়ার্কার অনেক রাতে দু-জন লোককে কালো গাড়ি থেকে বড়োসড়ো কিছু টেনে নামাতে দেখেছিল, কিন্তু এক খদ্দের এসে পড়ায় কী নামাচ্ছে দেখেনি! পরের দিন সকালে জেনেছে ওটা একটা বডি ছিল।"

"এতদিন কথাটা বলেনি কেন?"

"কারণ ওর বাড়িওয়ালি মাসি ঝামেলা করবে বলে পুলিশকে কিছু জানায়নি।"

"গাড়ির নম্বর কী বা কী ধরনের গাড়ি কিছু বলতে পেরেছে?"

"না, মেয়েটা গাড়ি-টাড়ি চেনে না। তবে এর সঙ্গে আরেকটা খবর হল হায়দ্রাবাদের এক কনট্র্যাক্ট কিলার রমেশবাবু দিন পঁচিশ হল কলকাতায় এসে আস্তানা গেড়েছে। ওর বিরুদ্ধে অন্ধ্র-প্রদেশে অনেক খুন-খারাপির অভিযোগ রয়েছে, কোনোটাই প্রমাণ করা যায়নি। এখানে এসে সে একটা কালো টাটা সুমো ভাড়া করেছে। অরূপ চৌধুরীর মৃত্যুর সঙ্গেও টাটা-সুমো জড়িত। এখন খোঁজ করছি বিকাশবাবু যেদিন মারা যান, সেদিন সোনাগাছিতে কেউ কালো টাটা সুমো দেখেছে কিনা। না দেখে থাকলেও মনে হচ্ছে দাদা, উই আর গেটিং ক্লোজ টু সলভিং দ্য মিস্ট্রি।"

"আমি অবশ্য ভাই এখনও কনফিউসড।"

"কেন দাদা?"

"ধরলাম, রমেশবাবুর দলই খুনগুলো করছে। কিন্তু এই রমেশবাবুকে কাজে লাগিয়েছে কে? কেনই বা লাগিয়েছে?"

"মানছি স্যার, সেটাই বার করতে হবে। রমেশবাবুর গতিবিধির উপর আমরা নজর

রাখছি।”

“গুড। তবে আরও দুটো জিনিস করো ভাই। এক হল, তন্ময় দত্তের একটা ছবি নিয়ে হাজরা রোডে ‘গরম ভাত’ রেস্টুরেন্টের কাছে যে ধাবাটা আছে, সেখানে যাও। ওখানে বলরাম বলে যে ছেলেটি কাজ করে, সে তন্ময় দত্তকে ‘গরম ভাত’ রেস্টুরেন্টে কখনও দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করো। সেই সঙ্গে মল্লিকাকেও জেরা করতে হবে তন্ময় দত্তকে সে চিনত কিনা।”

“কী ব্যাপার দাদা, মনে হচ্ছে আপনি কিছু একটা আঁচ করছেন?”

একেনবাবু সংক্ষেপে ‘গরম ভাত’-এর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের সঙ্গে ওঁর কথাবার্তার কথা জানালেন। তারপর বললেন, “তন্ময় দত্ত, অরূপ চৌধুরী আর বিকাশ সেনের মধ্যে একটা যোগ নিশ্চয় আছে। হয়তো সেটা মল্লিকার সূত্রেই।”

রাখাল দত্তের সঙ্গে কথা শেষ হতে হতেই একেনবাবু দোলার বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। দোলা ফ্রকটাকে প্যাক করেই রেখেছিল, কিন্তু একেনবাবু সহজে মুক্তি পেলেন না। কালকে ও পাটিসাপটা বানিয়েছে। চা সহযোগে সেটা খেতে হল। চমৎকার খেতে, তার ওপর ফ্রকের দাম নিল মাত্র ষাট টাকা!

“এত কম!”

“দিদির কাছ থেকে আবার মজুরি নেব নাকি?” তারপরেই একটা বই হাতে ধরিয়ে দিয়ে দোলা বলল, “আপনাকে এই বইটা কিনতে হবে।”

বিনা পয়সায় পাটিসাপটা আর ষাট টাকায় ফ্রক পাবার পর এ ব্যাপারে আপত্তি করা যায় না। বইটা হাতে নিয়ে একেনবাবু বললেন, “কত দাম?”

“আড়াইশো টাকা। আমাদের নারী-উদ্ধার আশ্রমের বই। বিক্রির টাকা ভালো কাজে লাগবে।”

আড়াইশো! মাই গড! ফ্রক কিনতে এসে এ-রকম প্যাঁচে পড়বেন একেনবাবু ভাবেননি। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। আগে খেয়াল করেননি, এখন দেখলেন টিভি-র পাশে একটা টেবিলে স্তূপ করে সাজানো গুচ্ছের বই। ওঁর হাতে তারই একটা কপি।

সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “এতগুলো বই তুমি বিক্রি করবে?”

“হ্যাঁ, আমাদের ফান্ড-রেইসিং চলছে। ওগুলোর কয়েকটা নিয়ে এখন বেরোব। আপনি কি বাড়ি যাচ্ছেন?”

“হ্যাঁ।”

“তাহলে আমায় একটু প্রিয়া সিনেমার কাছে নামিয়ে দেবেন?”

“বেশ, চলো।”

দোলা যখন কাপড়চোপড় পালটাচ্ছে, একেনবাবু সদ্য কেনা বইয়ের পাতা ওলটালেন। আশ্রমে আসা মেয়েদের কাহিনি, সবগুলোই খুব কষ্টের। একটি কমবয়সি বিধবা মেয়েকে তার দূর সম্পর্কের দেওর ফুসলিয়ে শহরে নিয়ে এসে ক’দিন ফূর্তি করে একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর পাঁচ হাত ঘুরে যখন বেচারি রাস্তায় দিন কাটাচ্ছিল, তখন কেউ দয়া পরবশ হয়ে আশ্রমে নিয়ে আসে। আরেকটি মেয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়। মেয়েটিকে অচৈতন্য অবস্থায় জঙ্গল থেকে কয়েকজন গ্রামবাসী থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু সেখান থেকে সে আবার পাচার হয়ে যায়। অর্থাৎ রক্ষকই ভক্ষক। চোদ্দ বছর বয়সের একটি মেয়েকে বিনাপয়সায় নার্সিং ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করে দেবে বলে বস্তির এক কাকা বাড়ি থেকে নিয়ে যায়, গর্ভবতী অবস্থায়

তাকে উদ্ধার করা হয় এক পতিতাপল্লী থেকে। যাদের নিয়ে এই সংস্থার কাজ তাদের জীবনের ছোটো ছোটো নানান কাহিনি। কৃপণ হলেও একেনবাবু হৃদয়শূন্য নন। আড়াইশো টাকায় যদি এইসব মেয়েদের কিছু উপকার হয়, সেটা তো খুবই ভালো কথা। আর দোলা যে এদের জন্য এত ভাবনা চিন্তা করছে, বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

দোলার কফি টেবিলে চোখে পড়ল মেট্রো-র একটা রঙিন বিজ্ঞাপন। এটাই তো বাইপাসের ওপর সেদিন দেখেছিলেন! কয়েক পাতা ধরে কী কী জিনিস সেল হচ্ছে তার ফিরিস্তি। সেল প্রাইসের ওপর আবার সেল! ২৫ পার্সেন্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড সেল প্রাইস! দেখে যা মনে হচ্ছে দামগুলো খুবই ভালো।

দোলা ঘরে আসতেই একেনবাবু বিজ্ঞাপনটা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে দোলা ম্যাডাম, তুমি এসব পাও, আমরা তো পাই না।"

"দিদি মেম্বার নয় বলে পায় না। ওখানে যেতে গেলে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হয়। আপনি যাবেন? আমার সঙ্গে যেতে পারবেন।"

"একদিন গেলে মন্দ হয় না।"

বাড়ি ফিরে দোলার দেওয়া ফ্রকের প্যাকেটটা একেনবউদিকে দিয়ে স্নান করে তাড়াতাড়ি খেয়েও নিলেন। মেট্রো-র বিজ্ঞাপন ওঁর মাথায় একটা চিন্তা ঢুকিয়েছে। দুটোর একটু আগেই রাখাল দত্ত এসে হাজির।

"কাগজগুলোর কপি এনেছ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটা খবরও দিই। অর্ধেন্দুদা জানতে পেরেছে বছর কুড়ি আগে একটা ভদ্রঘরের মেয়ে গ্যাং-রেপড হয়েছিল, অচৈতন্য মেয়েটিকে গ্রামবাসীরা থানায় নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির পরিচয় কেউ জানত না আর মেয়েটাও কোনো এফ-আই-আর না করে চলে যায়। এতে বিকাশ সেন জড়িত বলে একটা কানাঘুষো ছিল, এই পর্যন্তই। অনেক সময় ভিক্টিমের ফ্যামিলিই এই নিয়ে জলঘোলা করে না, সমঝোতা করে নেয়।"

"দ্যাটস এ শেইম, ভাই। ঠিক আছে এখন কাগজগুলো দেখি।"

প্রথমেই 75 লেখা কাগজটা পরীক্ষা করলেন একেনবাবু। 75-এর আগে ওপরের দিকে যেন একটা ছোট্ট ফুটকি রয়েছে। ঠিক দেখছেন কি? ওটার পাশে আঙুল রেখে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "রাখাল, এটা কী?"

"মনে তো হচ্ছে একটা ফুটকি।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং ভাই। পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর সেভেন ফাইভ-এ অনেক তফাৎ।"

"তা তো বটেই।"

".75 তো দশমিকে, তার ভগ্নাংশ কী?"

রাখাল দত্ত-র অংকের হিসেবে একটু গোলমাল লাগে, তাই চিন্তা করতে হল।

"3/4?"

"এক্স্যাক্টলি। প্রথম কাগজে 'your number'-এর পরে ছিল 1/4, দ্বিতীয় কাগজে 1/2, অর্থাৎ 2/4; আর এই কাগজে .75 মানে 3/4।"

"আরে, মেসেজ তো পরিষ্কার!

"ঠিক, আর আমার তো মনে হচ্ছে এবার আরেকটা হত্যাকাণ্ড হতে চলেছে, তাহলেই 4/4 পূর্ণ হয়।"

"মাই গড! কিন্তু এবার কে?"

একেনবাবু উত্তর দিলেন না। একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস নিয়ে লেখাগুলো পড়লেন কয়েকবার। "'Your number'— এ-রকম টাইপফেস কলকাতায় দেখেছ?"

"না।"

একেনবাবু চোখ বুজে পা নাড়তে নাড়তে বললেন, "বুঝলে ভাই, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এ-রকম ছাপা অক্ষর আমি কিন্তু আগে দেখেছি। এখানে নয় নিউ ইয়র্কে, 'নিউ ইয়র্কার' ম্যাগাজিনে। অবশ্য আরও অনেক ম্যাগাজিনে নিশ্চয় একই ফন্ট-ফেস ব্যবহার করা হয়।"

"খুনির কাছে ওই ম্যাগাজিনটা ছিল, এটা বুঝতে পারছি স্যার। কিন্তু এর থেকে কী প্রমাণ হয়, বিদেশের নানা ম্যাগাজিন তো পার্ক স্ট্রিটের রাস্তাতেও পাওয়া যায়!"

"তা যায়।" একটু অন্যমনস্ক ভাবে একেনবাবু বললেন। তারপর বললেন, "আরেকটা কাজ করবে ভাই, মল্লিকার সঙ্গে তন্ময় দত্তের কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা সেটার তো খোঁজ করছ। তার সঙ্গে, অরূপ চৌধুরী এবিজি নার্সিং হোমের সঙ্গে কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা দেখো তো।"

"এবিজি নার্সিং হোম, মানে যার সঙ্গে বিকাশ সেন যুক্ত ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

রাখাল দত্ত একটু অবাক হয়ে একেনবাবুর দিকে তাকালেন, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলেন না।

।। ১২।।

পরদিন সকালবেলা চা খেতে খেতে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা শুরু করতে যাবেন দরজায় বেল। ওঁর খোকামামা! মায়ের সবচেয়ে ছোটো ভাই। হেন কাজ নেই, উনি করেননি □ আবার কোনো কাজেই লেগে থাকেননি। ভালো লিখতেন, একটা বড়ো পত্রিকায় চিফ সাব-এডিটর বা কিছু ছিলেন। পরে একটা সিনেমা পত্রিকায় ফিচার লিখতেন বেশ কিছুদিন। হঠাৎ লেখালেখি ছেড়ে কিছুদিন গান আর ছবি আঁকা নিয়ে মাতলেন। ছেলেবেলায় ওঁর গলা ভালোই লাগত। ওঁর আঁকা ছবি অবশ্য দেখেননি। তবে শিল্প-সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে ওঁর বেশ যোগ আছে। বহু ঘাটের জল খেয়েছেন, আর অসম্ভব স্মরণশক্তি। সব রকম বিষয়েই জমিয়ে আড্ডা দিতে পারেন। বিয়ে থা করেননি, মুক্ত পুরুষ। এমনিতে খোকামামার সঙ্গে গল্প করতে ভালোই লাগে একেনবাবুর। আজকে অবশ্য সময় নিয়ে একটু চাপের মধ্যে আছেন।

ঘরে ঢুকে সোফায় পা মুড়ে বসে খোকামামা হাঁক দিলেন, "বউমা, একটু চা দাও।"

একেনবউদিকে খুব স্নেহ করেন খোকামামা। একা একা থাকে বলে খোঁজখবর করে যান নিয়মিত। শুধু চা নয় আরও কিছু আসবে খানিক্ষণের মধ্যেই। একেনবাবুও তার প্রসাদ পাবেন।

"কেমন আছ খোকামামা?"

"চমৎকার আছি। তুই কবে এলি?"

"বেশ কিছুদিন হল। একটা খুনের তদন্ত করতে এসেছিলাম, এসে দেখছি একাধিক খুন!"

"বাঃ, তাহলে তো সুখবর, কিছুদিনের জন্য আটকা। বউমা একা একা কতদিন আর

থাকতে পারে!"

"হ্যাঁ, খোকামামা, ঠিকই বলেছ। এবার পাততাড়ি গুটিয়ে আসার কথা ভাবছি।"

এর মধ্যে চা নিয়ে একেনবউদি এলেন। সাইড টেবিলে কাপটা রাখতে রাখতে বললেন, "মামা, চা-টা নিন। খাবার হচ্ছে, একটু সময় লাগবে।"

"আরে তাড়া তো কিছু নেই, লাগুক সময়।" বলতে বলতে খোকামামার চোখ পড়ল টেবিলের ওপর রাখা একেনবাবুর ছবিটা। "কী ব্যাপার! গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে তোর মনে হচ্ছে শিল্পে মতি হয়েছে... একেবারে টেবিলে রেখে ডিসপ্লে করছিস!"

"ওটাকে দেয়ালে টাঙাতে হবে।" লজ্জা পেয়ে একেনবাবু স্বীকার করলেন, "তোমার বউমা এখানে রেখেছে, যাতে ভুলে না যাই।"

"তোর যা ভুলো মন, ভালোই করেছে। কিন্তু বিনয় দত্তের এই পেইন্টিংটা তো আগে দেখিনি!"

"দেখনি, কারণ মাত্র কিছুদিন আগে এটা নিউ ইয়র্কে এঁকেছিলেন, আমাদের সামনেই।"

"ওর ছবি এক সময় ভালো লাগত, কিন্তু কী-যে আঁকে আজকাল!"

"উনি নাকি বিমূর্ত অতিভক্তিবাদ, না কী একটা মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত?"

"বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ," শুদ্ধ করে দিলেন খোকনমামা। "অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশানিজম। ওটাই তো কাল হয়েছে... এমন সিম্বলিক, কারো সাধ্য নেই বোঝার। আগে দুর্দান্ত মেয়েদের ফিগার আঁকত। একটু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, কিন্তু বোঝা যেত।"

"তুমি কি চিনতে ভদ্রলোককে?"

"বহুদিন আগে একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম... তখনও উঠতি, স্ট্রাগল করছে। স্যাড লাইফ।"

"স্যাড লাইফ বলছ কেন? লাখ লাখ টাকায় ছবি বিক্রি করছেন!"

"তা করছে এখন। আমি বলছি আর্টিস্ট জীবনের প্রথম দিককার কথা। ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছিল, মাও অসুস্থ থাকত। বিনয়ই এদিক-ওদিক ছবি বেচে কোনো মতে সংসারটা চালাত। ছোটো বোনকেও হঠাৎ হারায় একটা ট্র্যাজেডিতে। ফলে বহুদিন ছবি আঁকতে পারেনি। পরে পেটের তাগিদে আবার আঁকা শুরু করে। ওই বোনটাই তখন ওর মিউজ হয়ে দাঁড়ায়, আমাকে বলেও ছিল সেটা।"

"'মিউজ'?" কথাটা একেনবাবু আগেও শুনেছেন, অর্থটা জানেন না। "মিউজ মানে?"

"মানে ইনস্পিরেশন। সেইজন্যেই মনে হয় মেয়েদের ছবিই শুধু আঁকত।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং! আর এখন আঁকছেন ত্রিভুজ, টাকাও কামাচ্ছেন বেশি!"

"ঠিকই, এখন ওর ছবির মাথামুণ্ডু বোঝা কঠিন। যাইহোক, খুনের তদন্ত করতে এসেছিস বললি... থাকিস তো তুই নিউ ইয়র্কে, কলকাতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?"

"কারণ কলকাতায় যিনি খুন হয়েছেন, তিনি নিউ ইয়র্কের এক ভদ্রলোকের জন্য কাজ করছিলেন।"

"তুই কি বিকাশ সেনের কথা বলছিস?"

এবার একেনবাবুর অবাক হবার পালা! "তুমি বিকাশ সেনকে চেনো?"

"চিনি না, তবে পত্রিকায় যা হইহই হয়েছিল ক'দিন। তা কিছু হদিশ হল?"

"না খুবই কনফিউসিং!"

খোকামামা কী জানি বলতে যাচ্ছিলেন, এর মধ্যেই একটা ফোন। রাখাল দত্তের উত্তেজিত গলা।

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কালকের প্রশ্ন দুটোর উত্তর পেয়েছ?"
"আরে না দাদা, সময় পাইনি। আরেকটা মার্ডার! অরূপ চৌধুরীর মেসোমশাই সঞ্জয় চৌধুরী খুন হয়েছেন।"
"সেকি, উনি তো এই ভয়ই করছিলেন!"
"এক্স্যাক্টলি। তবে এবার খুনিকে হাতেনাতে ধরেছি।"
"কে?"
"যাদের সন্দেহ করেছিলাম, রমেশবাবু আর তার এক শাগরেদ। আমার লোক যে ওদের ফলো করছিল সেটা বোঝেনি। জানলা দিয়ে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাবার সময়ে ধরা পড়েছে। আমি ক্রাইম সিনটা দেখতে যাচ্ছি, তারপর দু-জনকে ইন্টারোগেট করব। আপনি আসবেন?"
"নিশ্চয়, ঠিকানাটা দাও।"
"খোকামামা, তুমি তোমার বউমার সঙ্গে গল্প করো, আমাকে একটু বেরোতে হবে, জরুরি কাজ।" একেনবাবু ট্যাক্সি ধরে ছুটলেন।

বাড়ির চারিদিকে জনতার ভিড়। বডিটা তখনও সরানো হয়নি। রাখাল দত্ত অপেক্ষা করছিলেন একেনবাবুর জন্য। বীভৎস দৃশ্য। সঞ্জয় চৌধুরীর দেহটা ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসা অবস্থায় রয়েছে। মাথাটা একপাশ হয়ে টেবিলের উপরে পড়েছে। বসে বসে যখন পত্রিকা পড়ছিলেন, তখন টেবিলের লাগোয়া খোলা জানলা দিয়ে গুলি চালানো হয়েছে। রক্তে টেবিল ভেসে গেছে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে মেঝেতে পড়েছে। জানলার ঠিক নীচে ঘরের মেঝেতে একটা কাগজ, সেখানে লেখা 'your number 1'।
"ইট মেকস সেন্স," একেনবাবু মাথা নাড়তে বললেন। "'4/4' মানে 1। এটাই এ যাত্রার শেষ খুন। এটা ঘটবে সেটা আমরা জানতাম, কিন্তু কে খুন হবেন জানতাম না, হোয়াট এ শেইম!"

হাতেনাতে খুনি ধরা পড়েছে। ক্রাইম সিন তেমন ভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। সঞ্জয় চৌধুরীর স্ত্রী-র সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হত। তিনি বাইরের ঘরে বসে আছেন শুনে সেখানে গেলেন একেনবাবু। মিসেস চৌধুরী কথা বলার মতন অবস্থায় নেই, ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন। পাশে দু-জন ওঁকে ধরে বসে আছেন। ঘরে বেশ কিছু লোক। নীচু গলায় কথাবার্তা চলছে। একেনবাবু সেখানে আর দাঁড়ালেন না। বেরোনোর মুখে নজর পড়ল দেয়ালে ঝোলানো বিশাল ফটোগ্রাফটার ওপরে। পুলিশের পোশাকে এক সুদর্শন যুবক। ফটোর নীচে লেখা সঞ্জয় চৌধুরী, আইপিএস, বিহার ক্যাডার। শেষে একটা তারিখও ছিল, সেটা একটু অস্পষ্ট। আইপিএস হবার পর বোধহয় নিজেই শখ করে ছবিটা স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিলেন।
রমেশবাবু আর তার দুই শাগরেদকে ইতিমধ্যেই পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে। রাখাল দত্ত একেনবাবুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আর সময় নষ্ট না করে ওঁরা থানার দিকে রওনা দিলেন। থানায় জিজ্ঞাসাবাদ যা কিছু করার রাখাল দত্তই করলেন। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেও খুনের পিছনে কে আছে সেটা জানা গেল না। প্রথমে রমেশবাবু অন্য তিনটে খুনের কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল। পরে বুঝল অস্বীকার করে লাভ নেই। পুলিশ ব্যালিস্টিক পরীক্ষার পর নিশ্চিত হবে একই হ্যান্ডগান থেকে গুলিগুলো ছোঁড়া হয়েছে, আর ওদের সেই হ্যান্ডগানটা এখন পুলিশের হেফাজতে। শেষে জেরায় জেরায় রমেশবাবু

ভেঙে পড়ল। কেন এই খুনগুলো করেছে, প্রশ্ন করে করে রাখাল দত্ত পুরোটাই উদ্ধার করলেন। প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে রমেশবাবু যা বলল, শুধু সেটাই লিখছি:

“সপ্তাহ পাঁচেক আগে হায়দ্রাবাদে আমার সঙ্গে একজন এসে যোগাযোগ করে। বলে কলকাতায় ওঁর এক পার্টি কয়েকটা খুন করাতে চান, তার জন্য লাখ তিনেক টাকা পাওয়া যাবে। আমাকে ঠিক চারদিন বাদে সোমবার কলকাতায় ম্যাডক্স স্কোয়ার পার্কে রাত ন'টার সময়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এমনিতেই আমি হায়দ্রাবাদ থেকে গা-ঢাকা দেবার কথা ভাবছিলাম। দেখলাম ভালোই হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে আমি তাঁকে চিনব?' লোকটা বলল, 'সেটা ভাবতে হবে না, সেই পার্টি আপনাকে ঠিক চিনে নেবে।'

আমি সেই রাত্রেই হাওড়ার ট্রেন ধরলাম। সোমবার ন'টা নাগাদ ম্যাডক্স স্কোয়ারে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রমেশবাবু কিনা। আমি 'হ্যাঁ' বলতেই, আমার হাতে একটা নোটের বান্ডিল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এতে পঁচাত্তর হাজার টাকা আছে।' তারপর বিকাশ সেনের পরিচয়, তার বাড়ি আর অফিসের ঠিকানা দিয়ে বললেন, ওঁকে খুন করতে হবে। তবে শুধু খুন নয়, খুনের পর পকেটে একটা কাগজ ঢুকিয়ে বডিটা সোনাগাছিতে ফেলে রেখে আসতে হবে। যে কাগজটা পকেটে ঢোকাতে হবে সেটা উনি আমাকে দিলেন। খুনের পরে এগুলো ঝুট-ঝামেলা, কিন্তু আমার টাকার একটু টানাটানি চলছিল বলে রাজি হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে খুন করতে হবে?' বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আর খুন করার পরের দিন রাত ন'টায় আবার ওই ম্যাডক্স-স্কোয়ার পার্কেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। এর পর কাকে খুন করতে হবে, সেটা উনি জানিয়ে দেবেন। আমি বললাম, 'আমার তো তিন লাখ পাওয়ার কথা।' উনি বললেন, তিন লাখই পাব, তবে একসঙ্গে নয়।

যাইহোক, বুধবার বিকাশ সেনকে আমি খুন করি। বৃহস্পতিবার রাত্রে ম্যাডক্স স্কোয়ারে ওঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হল। পঁচাত্তর হাজার টাকার আরেকটা বান্ডিল দিয়ে বললেন এবার যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর তন্ময় দত্তকে খুন করতে হবে। কিন্তু তন্ময় দত্তের বডিটা ফেলতে হবে ওয়াটগঞ্জের বেশ্যাপল্লীতে। সেখানে যে কাগজটা পকেটে ঢোকাতে হবে সেটাও দিয়ে দিলেন। তন্ময় দত্তের বাড়ির ঠিকানা উনি জানতেন না। আমি বললাম, 'আমার দরকার নেই, আমি পেয়ে যাব।' এবার তাড়াহুড়ো নেই, দশ দিনের মধ্যে খুন করলেই চলবে। দশদিন বাদে আবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে সেই রাত ন'টার সময়ে ম্যাডক্স স্কোয়ারে। সেই মতন আবার আমাদের দেখা হল। এরপর আরেক বান্ডিল টাকা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন 'দ্য নাইট' রেস্টুরেন্ট-এর মালিক অরূপ চৌধুরীকে খুন করে বডিটা কালীঘাটের বেশ্যাপল্লীতে ফেলতে। যে কাগজটা এবার পকেটে ঢোকাতে হবে সেটাও পেলাম। এবারও কবে খুন করতে হবে, সে নিয়ে কোনো তাড়াহুড়ো ছিল না। শুধু খুন করার পরের দিন ওঁর সঙ্গে দেখা হবে একই জায়গায় একই সময়। কিন্তু অরূপ

চৌধুরী-র ব্যাপারে একটু গোলমাল হয়ে গেল। খুন করে বডিটা তোলার আগেই লোকজন এসে পড়ায় আমাদের পালাতে হল। কাগজটাও পকেটে ঢোকানো হল না, তবে বডির কাছেই রাস্তায় অন্তত ফেলে দিয়ে এলাম। পরের দিন রাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন দেখা হল, দেখলাম উনি খুবই বিরক্ত। কিন্তু চুক্তির খেলাপ সত্ত্বেও টাকার ব্যাপারে কোনো ঝামেলা করলেন না। বললেন শুধু আরেকটা খুনই আমায় করতে হবে। এবার খুন করতে হবে লেক টাউনের সঞ্জয় চৌধুরীকে। বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিলেন। উনি চেয়েছিলেন যে, বডিটা যেন আমরা সোনাগাছিতে রেখে আসি। আমার ভয় হচ্ছিল এবার ওইসব জায়গায় ডেডবডি ফেলতে গেলে ফেঁসে যেতে পারি। আমি রাজি হলাম না। বললাম, 'আপনি কিছু কম দিন আপত্তি নেই, কিন্তু ডেডবডি আমরা কোথাও নিয়ে যাব না।' উনি তাও একটু জেদাজেদি করলেন। আমি কিছুতেই রাজি না হওয়াতে, টাকার একটা বান্ডিল আর একটা কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই কাজটা শেষ করে চলে যাবেন। শুধু কাগজটা মনে করে ফেলবেন ডেডবডির পাশে।' সেই আমাদের শেষ দেখা।"

"ভদ্রলোক দেখতে কীরকম?" রাখাল দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

সেটাই রমেশবাবু বলতে পারল না। বেঁটেখাটো চেহারা, মাথায় টুপি ছিল। একে অন্ধকার, তার ওপর টুপির জন্য মুখের অনেকটা দেখা যাচ্ছিল না।

কে হায়দ্রাবাদে যোগাযোগ করেছিল রমেশবাবুর সঙ্গে, তারও কোনো সদুত্তর নেই। যোগাযোগ হয়েছিল ফোনে। ফোন কলটা ট্রেস করা যাবে। তবে নিশ্চয় করা হয়েছে কোনো পাবলিক বুথ থেকে। কে করেছে বার করাটা সহজ হবে না। রমেশবাবুর কাছ থেকে কী ভাবে প্রতিটি খুন সে করল তার বিশদ বিবরণ রাখাল দত্ত সংগ্রহ করলেন। কিন্তু কে খুন ওকে দিয়ে করাল, সেই রহস্যের সমাধান হল না।

।। ১৩।।

তিন সপ্তাহের বেশি হল একেনবাবু কলকাতায় এসেছেন, বিকাশ সেনের মৃত্যুর পিছনে কার মাথা কাজ করছে তার কোনো হদিশই পাননি। শুধু বিকাশ সেন নয়, পর পর আরও তিনটে খুন হয় গেল কিন্তু আসল লোকটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল। শুধু বেঁটেখাটো একটি লোক রমেশবাবুর এই তথ্য থেকে কাউকে সন্দেহ করতে হলে, সেই জালে কলকাতার লাখ লাখ লোক আটকা পড়বে। তবে সার্চটা আরও রিফাইন করা যায়। শুধু বেঁটেখাটো নয়, লোকটি নিঃসন্দেহে মোটামুটি অর্থবান। তিন লাখ টাকা এই যুগে বিরাট অঙ্ক না হলেও হেলাফেলা করে ফেলে দেওয়ার জিনিসও নয়। আরেকটা ব্যাপারও স্পষ্ট যে, খুনের কারণ আর্থিক নয়; যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের এমন কিছু লুক্কায়িত ধনসম্পদ আছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর যে সম্ভাবনাটা ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল। শেষ হত্যাকাণ্ডে সেটাও চুরমার হয়ে গেল। শেষ খুনটা করা হল এক বৃদ্ধকে, কোনো যুবককে নয়। হোয়াই? কোনো সদুত্তর নেই। এই প্রথম একেনবাবু মনে হল, উনি একটা পার্ফেক্ট মার্ডারের সম্মুখীন হয়েছেন। খুনের অস্ত্র পাওয়া গেছে, খুনিকে

ধরা গেছে, কিন্তু চারটে খুনের পিছনে আসল যে মাথা□ তার কোনো চিহ্ন নেই। রমেশবাবু খুন করলেও, তিনি এক্ষেত্রে একটা হাতিয়ার মাত্র। লোকে বন্দুক জোগাড় করে গুলি করে। এক্ষেত্রে বন্দুক হাতে একটা লোক জোগাড় করে তাকে দিয়ে গুলি করানো হয়েছে। আসল খুনি আগাগোড়া যে আড়ালে ছিল, সেই আড়ালেই রয়ে গেছে। রমেশবাবু খুন করেছে টাকার লোভে। কিন্তু যে লোকটা খুনগুলো করাতে এতগুলো টাকা দিয়েছে, সে কেন দিয়েছে, তার মোটিভটা কী? লোকটার অস্তিত্ব জানা গেছে রমেশবাবুর স্বীকারোক্তি থেকে। ম্যাডক্স স্কোয়ারে রমেশবাবুর সঙ্গে তার বার কয়েক দেখা হয়েছে এই তথ্যটুকু ছাড়া আর কিছুই জানা যায়নি।

"তুমি কি ছবিটা লাগাবে না? কতদিন বাইরের ঘরের টেবিলে ওটা থাকবে?" একেনবউদির গলায় বিরক্তি।

"আরে না, লাগাচ্ছি। দেয়ালে তো একটা হুক লাগানো আছেই। ছবিতে শুধু একটা দড়ি বাঁধতে হবে।"

"ছবিটা উলটিয়েও দেখোনি তুমি। ওটাতে চেন লাগানো আছে, শুধু টাঙিয়ে দিতে হবে। আরেকটু লম্বা হলে নিজেই লাগাতে পারতাম।"

একেনবাবু বেঁটে হলেও একেনবউদির থেকে একটু লম্বা।

"ঠিক, চেন তো আছে, এখুনি লাগাচ্ছি।"

দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দেয়ালের হুকটা কোথায় ঠাহর করে হুকের মধ্যে চেনটা ঢোকাতে দু-একবার চেষ্টা করতে হল। তারপর ছবিটা ডানদিক বাঁ-দিক করে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হল। নাঃ, ঠিক মতোই বসেছে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একেনবাবুর হঠাৎ মনে পড়ল ওঁর গুরুদেব বনবিহারীবাবুর কথা। তিনি সবসময়ে বলতেন, ভাবার চেষ্টা করো, তদন্ত করতে গিয়ে কী কী জিনিস তুমি দেখেছ, যার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝোনি। নতুন ভাবে ভাবনা শুরু করো সেখান থেকে। আসল সূত্র সাধারণত সেখানেই লুকিয়ে থাকে। ভাগ্যিস এই ছবিটা নিয়ে উনি তদন্ত করছেন না! এখনও ধরতে পারলেন না, বিনয় দত্ত এ-রকম বিসদৃশ 'ত্রিভুজ' কেন আঁকছিলেন? ছবিতে শুধু একটা বস্তুই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নয়, সেটা হল কলকাতার আবছা ম্যাপ। কিন্তু তাতে বিনয় দত্তের কোনো কৃতিত্ব নেই, ক্যানভাসের ওপর নিশ্চয় কোনো ফটোগ্রাফি শপকে দিয়ে প্রিন্ট করানো হয়েছে। একেনবাবুর মনে পড়ল নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টস-এ ইউরোপিয়ান এক আর্টিস্টের আঁকা ছবি দেখেছিলেন□ খবরের কাগজের আবছা ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর কালো, লাল আর হলুদের ছোপ, যার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু নেই। ওটা নাকি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম! ওই আর্টিস্ট নাকি এ-রকম ছবি এঁকেই বিখ্যাত হয়েছেন। লাখ লাখ টাকা দিয়ে আর্ট কালেক্টাররা ওইসব ছাইভস্ম কেনে! ওই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম-ই হল বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ, যেটা খোকামামা বলে গেল। 'অভিব্যক্তিবাদ'□ কথাটাই তো মনে রাখা কঠিন! মেসেজ আবিষ্কার তো দূরের কথা! প্রমথবাবু ছবি বোঝেন না বলে ওঁকে যতই গালাগাল দিন, একেনবাবুর বিশ্বাস ত্রিভুজের বদলে বিনয় দত্ত লাল-হলুদের ছোপ লাগালেও আর্ট কালেক্টাররা কিনত। কিনত ছবির জন্যে নয়, ছবির তলায় বিনয় দত্তের সইটার জন্যে। লোকে যে-রকম ফ্যাসন ডিজাইনারদের তৈরি রংচঙা উৎকট স্টাইলের পোষাক লাখ লাখ টাকা দিয়ে কিনে সগর্বে গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়! বিনয় দত্তের অরিজিন্যাল নিজের কাছে থাকা কি চাট্টিখানি কথা!

আরেকবার তাকালেন ছবিটার দিকে...

দুত্তোর! একেনবাবু ফিরে এলেন নিজের সমস্যায়। এই চার-চারটে মৃত্যুর তদন্ত

করতে গিয়ে কী দেখেছেন যেটা দুর্বোধ্য? দুর্বোধ্য হল কানেকশন। এই চারজনের মধ্যে একটা যোগসূত্র নিশ্চয় আছে। একটা কানেকশন তো সরাসরি, সঞ্জয় চৌধুরী অরূপবাবুর মেসোমশাই। বিকাশ সেনকেও অরূপবাবু ছেলেবেলায় চিনতেন, কিন্তু পছন্দ করতেন না, বাজে ক্যারেক্টার বলে। বিকাশ সেনের ক্যারেক্টার নিয়ে একটা সংশয় ওঁর শ্বশুর ব্রজেন রায়ও আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন। কিন্তু তন্ময় দত্তকে এই তিনজনের মধ্যে ঢোকানো যাচ্ছে না। তন্ময় দত্ত, বিকাশ সেন আর অরূপ চৌধুরীর একমাত্র সম্ভাব্য যোগসূত্র হচ্ছে মল্লিকা। সঞ্জয় চৌধুরীর এর মধ্যে আসাটা শুধু রেস্টুরেন্ট চেন-এর পার্টনার হিসেবে, যদি মনে করা যায় খুনগুলির পিছনে শুধু মল্লিকা নয়, দেবু সেনও জড়িত। এই চারটে খুন হল মল্লিকা আর দেবু সেনের অশুভ আঁতাতের ফলে। মল্লিকা তার রাগ চরিতার্থ করল, দেবু সেনের লাভ রেস্টুরেন্ট চেন-এর ইনকাম... অরূপবাবুর মেসোর অবর্তমানে মাসিকে অতি সহজেই ঠকানো যাবে।

নাঃ, ব্যাপারটা খুবই কমপ্লিকেটেড।

চিন্তায় ছেদ পড়ল একটা ফোনের আওয়াজে। ফোনটা ধরলেন একেনবউদি। ফোন হাতে নিয়ে ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আজ বিকেলে বাড়িতে থাকবে?"

"কেন?"

"দোলারা বেড়াতে আসতে চায়।"

"আসতে বলো, কোথায় আর যাব?"

"বলছে তো থাকবে," একেনবাবু শুনলেন বোনকে বললেন গিন্নী। "তবে ওর কি মাথার কোনো ঠিক আছে!" আরও কিছু বলছিলেন একেনবউদি, কানে এল না। একটা হোয়াটসঅ্যাপ ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছ থেকে। তন্ময় দত্তর রেসিউম। পরে অবনী গুপ্তরটা আসবে। একেনবাবুর মাথায় একটা অন্য একটা চিন্তা ঢুকেছে।

খোকামামাকে ফোন করলেন প্রথমে। "তুমি কোথায় ইন্টারভিউ করেছিলে বিনয় দত্তকে?... শিওর?"

পরের ফোনটা রাখাল দত্তকে, "ভাই রাখাল, একটা বিশেষ অ্যাকাউন্টের খবর দরকার।"

রাখাল দত্ত একেনবাবুর অনুরোধ শুনে অবাক।

"এটা কি স্যার পারা যাবে! উপর মহলের অনেক অ্যাপ্রুভাল লাগবে।"

"এটা তোমাকে বার করতেই হবে ভাই, তার জন্যে যা করণীয় সব করো এবং তাড়াতাড়ি।"

ভারতবর্ষের সুবিধা হল, আইন কানুন যেমন অনেক আছে, সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে অনেক কাজ হাসিলও করা যায়। একেনবাবুর অনুরোধ রাখাল দত্ত রাখলেন। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের উত্তরটা এসে গেল। উত্তরটা দিয়ে রাখাল দত্ত বললেন, "আরেকটা সুখবর দেব, একটা কানেকশন পেয়েছি। অরূপবাবুর মেসো সঞ্জয় চৌধুরী বহু বছর রাঁচিতেই পোস্টেড ছিলেন। অরূপবাবু বোর্ডিং স্কুল থেকে সেখানেই ছুটি-ছাটাতে যেতেন।"

"আমিও ভাই সেটা অনুমান করছিলাম, বিহার ক্যাডারে যখন ছিলেন। এখন রাঁচি না হয় ঝাড়খন্ডে, তখন তো বিহারেই ছিল।"

"তা বুঝলাম, কিন্তু তন্ময়বাবু?"

"আরে তন্ময়বাবুও ছিলেন, সেটাই জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের হোয়াটসঅ্যাপ পেয়ে। তন্ময়বাবু পড়তেন বিশপ ওয়েস্টকট বয়েজ স্কুল-এ। সেটা রাঁচিতে।"

তারমানে বিকাশ, অরূপ আর তন্ময় তিনজনেই সম্ভবত কোনো এক সময়ে রাঁচিতে ছিলেন।”

“ব্যাস, তাহলে চলে এসো ভাই।”

“আপনার বাড়িতে?”

“নইলে আবার কোথায়?”

একেনবাবু আবার খোকামামাকে ফোন করলেন, “খোকামামা, যে ট্র্যাজেডির কথা বলছিলে... সেটা নিয়ে আরেকটু জানতে চাই... বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়ে আর ফেরেনি?... বন্ধুরা কিছু বলতে পারেনি?... পুলিশ?... সেখান থেকে আবার অদৃশ্য?”

রাখাল দত্ত আর স্বামীসহ দোলা প্রায় একই সময়ে বাড়িতে ঢুকল।

“এই যে দোলা ম্যাডাম আর অনির্বাণ, এসো, এসো।” বলে অভ্যর্থনা করলেন একেনবাবু। সেই শুনে একেনবউদি বেরিয়ে এসে দেখেন রাখাল দত্তও এসেছেন।

চকিতে স্বামীর দিকে তাকালেন একেনবউদি।

“আমি রাখালের সঙ্গে একটু বেরোচ্ছি, তুমি দোলা আর অনির্বাণের সঙ্গে গল্প করো। আমরা শিগ্গিরি ফিরে আসব। এসে চা খাব।”

একেনবউদি দোলার দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখলি তো, কী বলেছিলাম?”

“না, না এক্ষুনি ফিরব, সত্যি।” বলে রাখাল দত্তকে বললেন, “চলো ভাই।”

গাড়িতে উঠে রাখাল দত্ত বললেন, “প্লিজ, একটু খুলে বলুন স্যার।”

“দাঁড়াও, তার আগে একটা জিনিস কনফার্ম করি।” গাড়ি থেকেই বাড়িতে একটা ফোন করলেন একেনবাবু।

“শোনো, দোলাকে বাইরের ঘরের ছবিটা দেখাও, দেখো আমার পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারে কিনা।”

একটু বাদেই উত্তেজিত দোলা ফোনটা ধরে বলে, “হ্যাঁ জামাইবাবু, ইনিই সেই ভদ্রলোক, যিনি আমার কাছ থেকে ডিজাইনটা কিনেছিলেন। আপনি ওঁকে চেনেন?”

“ফিরে এসে কথা হবে,” ফোনটা ছেড়ে দিলেন একেনবাবু।

।। ১৪।।

কাজের লোকটি বলছিল, এখন বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। তাকে হাঁকিয়ে দিয়ে রাখাল দত্ত আর একেনবাবু বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। বিনয় দত্ত বাইরের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলেন। সামনে কফি টেবিলে দেশ-বিদেশের কয়েকটি ম্যাগাজিন। এইভাবে দু-জনকে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, “কী চাই?”

একেনবাবু বললেন, “স্যার, আমাকে আপনার মনে আছে কিনা জানি না, নিউ ইয়র্কের এশিয়া সোসাইটিতে আপনি যেদিন ছবি আঁকছিলেন, আমি সেখানে ছিলাম।”

বিনয় দত্ত ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। বোধহয় মনে পড়ল ঘটনাটা। বললেন, “ও হ্যাঁ, আপনিই তো আমার ছবি দেখে বলেছিলেন, আমি ‘ত্রিভুজ’ আঁকছি।”

“আপনার ঠিকই মনে আছে স্যার।”

“তা এখন কী মনে করে?”

"আমি স্যার বলতে এসেছি আপনি 'ত্রিভুজ' আঁকেননি, ওটা সিম্বলিক ছবি।"

"আমার সব ছবিই সিম্বলিক।" বিনয় দত্তের স্বরে একটু বিরক্তি।

"তা তো বটেই স্যার, আপনি তো 'অ্যাবস্ট্রাক্ট অতি-ভক্তিবাদ' গ্রুপের।"

"অভিব্যক্তিবাদ", সংশোধন করলেন বিনয় দত্ত, "কিন্তু আমি লেবেল-এ বিশ্বাস করি না। আপনি কী বলতে চান বলুন।"

"ও হ্যাঁ স্যার, আমি বলতে এসেছি আমি একজন গোয়েন্দা। এমনিতে ছবি-টবি বুঝি না, কিন্তু এবার ছবিটার আসল মানে বুঝেছি।"

"বুঝতে পেরেছেন?" একটু শ্লেষের সঙ্গে বিনয় দত্ত কথা বললেন। "কী নাম আপনার?"

"একেন্দ্র সেন স্যার, সংক্ষেপে একেন।"

"একেনবাবু! নামটা তো চেনা চেনা লাগছে! এবার বলুন, কী বুঝলেন?"

"ঠিক নিজের চেষ্টায় বুঝিনি স্যার, বুঝেছি আপনার বলা একটা কথা থেকে।"

"আমার বলা কথা!"

"আপনি স্যার একজনকে ইন্টারভিউয়ে বলেছিলেন, 'আপনার বোন ছিলেন আপনার মিউজ'।"

"কী উলটোপালটা কথা বলছেন!"

"উলটোপালটা নয় স্যার। আপনার সব ছবির মতন এই ছবিটার ইনস্পিরেশনও আপনার বোন। তাই ওটা স্যার ঠিক সাধারণ 'ত্রিভুজ' নয়, একটা মেসেজ, যেগুলো বোঝা যাবে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো কোথায় রয়েছে দেখে। কলকাতার ম্যাপে আঁকা সোনাগাছি থেকে ওয়াটগঞ্জ, ওয়াটগঞ্জ থেকে কালীঘাট, কালীঘাট থেকে সোনাগাছি।"

বিনয় দত্তের মুখটা ক্ষণকালের জন্য একটু যেন ফ্যাকাশে হল। "হোয়াট ননসেন্স!" তারপর রাখাল দত্তের দিকে তাকিয়ে বিনয় দত্ত প্রশ্ন করলেন, "এন্ড, হু আর ইউ?"

"আমি পুলিশের লোক স্যার, সি আই ডি-র।"

"আপনারা দু-জন এখানে কীসের জন্য?" বিনয় দত্তের গলাটা যেন একটু ভাঙা শোনাল।

"ব্যাপারটা হল স্যার, কলকাতার তিনটে রেডলাইট এরিয়াকে আপনি লাল রং দিয়ে সিম্বলিকালি যোগ করেছেন। কিন্তু স্যার কীসের সিম্বল?"

একটু চুপ করে থেকে বিনয় দত্ত বললেন, "আপনিই বলুন, আপনি তো মনে হচ্ছে আমার থেকে বেশি জানেন!"

"এই তিনটে জায়গায় বিকাশ সেন, তন্ময় দত্ত, অরূপ চৌধুরী আর অরূপ চৌধুরীর মেসোমশাইয়ের ডেডবডি পড়ে থাকবে, সেটাই আপনি ছবির ভেতর দিয়ে সবাইকে জানাচ্ছিলেন। আর খুনের কন্ট্র্যাক্ট দিয়েছিলেন রমেশবাবুকে।"

"আর ইউ ম্যাড অর হোয়াট! হোয়াই শুড আই ডু দ্যাট?"

"কারণ স্যার, এই তিনজন যখন ছাত্র ছিল, তখন এরা সবাই মিলে আপনার বোনকে রেপ করেন। গ্রামবাসীরা অচৈতন্য মেয়েটিকে পুলিশের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশকর্তা নিজের স্ত্রী-র বোনপো এরমধ্যে জড়িত বুঝে মেয়েটিকে পাচার করে দেয় কলকাতার কোনো বেশ্যাপল্লীতে। সেই অন্যায় আর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে এদের প্রত্যেককে খুন করে কলকাতার এক-একটা রেডলাইট এরিয়ায় ফেলে রাখার নির্দেশ দেন।"

"এই অদ্ভুত গল্প আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?" রাখাল দত্তের দিকে তাকিয়ে বিনয়বাবু কথাটা বললেন। "বহুবছর আগে আমার বোন বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে

গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল এটাই শুধু ঘটনা।"

"না স্যার, বন্ধুদের আপনি চিনতেন, শুধু আসল ঘটনাটা বহুদিন জানতেন না।"

বিনয় দত্ত চুপ করে রইলেন।

একেনবাবু বলে চললেন, "হঠাৎ একটা মেলায় গিয়ে মেয়েদের কামিজে আঁকা একটা ডিজাইন দেখলেন। ওই ডিজাইনটা আপনার নিজের সৃষ্টি। আপনি নিজে এঁকেছিলেন বোনের কামিজের উপরে, যে কামিজ পরে আপনার বোন নিরুদ্দেশ হন। ভাইয়ের আঁকা সেই কামিজটা আপনার বোন সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। মারা যাবার আগে দিয়ে যান উদ্ধার আশ্রমের এক ভলান্টিয়ারকে। তারপর আপনার বোন যে উদ্ধার আশ্রমে শেষ জীবন কাটিয়েছেন, সেখানে গিয়ে আশ্রমবাসিনীদের নানান কাহিনি থেকে, আপনার বোনের কাহিনিও আপনি খুঁজে পান। তখনই বুঝতে পারেন, রাঁচির সেই পুলিশের কর্তা অরূপ চৌধুরীর মেসোমশাই আপনার বোনকে পাচার করার ব্যাপারে জড়িত।... স্যার, আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তিন লক্ষ টাকা ক্যাশ করা হয়েছে এই মাসে, সেগুলো কোথায় গেছে? ওগুলো কি রমেশবাবুর কাছে যায়নি? আপনার রাগ, কষ্ট, দুঃখ সবই আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু স্যার, এ ভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। বলুন স্যার, আমি কি ভুল বলছি?"

একেনবাবুর কথা শেষ হল। বিনয় দত্ত নির্বাক হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "কুড়ি বছর, কুড়ি বছর ধরে আমি আমার বোনকে খুঁজে বেরিয়েছি। ফুলের মতন নিষ্পাপ বোন ছিল আমার। বোনের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তিন-তিনটে পশু তাকে নষ্ট করেছে। আর শয়তান সঞ্জয় চৌধুরী তাকে রক্ষা তো করেইনি, উলটে নিজের শালির পুত্র আর তার বন্ধুদের বাঁচাতে তিল তিল করে আমার বোনকে হত্যা করেছে। ডু ইউ থিঙ্ক দিস অ্যানিম্যালস ডিসার্ভ টু লিভ? ডু ইউ?"

একেনবাবু আর রাখাল দত্ত নির্বাক।

"চুপ করে আছেন কেন? বলুন, এই সব পশুগুলো বেঁচে থাকবে এটাই আপনাদের বিচার?"

"কিন্তু স্যার..." একেনবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

বিনয় দত্ত থামিয়ে দিলেন, "না, কোনো কিন্তু নয়। এদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকারই নেই। এগুলো হত্যা নয়, ন্যায়ের বিচারে এগুলো হল শাস্তি। আর কিছু জানতে চান একেনবাবু?"

একেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন, "না স্যার, আপনি তো সব বলেই দিলেন। তবু একটা প্রশ্ন করি, আপনি রমেশবাবুকে খুনের পর সংখ্যা লেখা এক-একটা কাগজ ভিক্টিমের কাছে রেখে আসতে বলেছিলেন। স্বীকার করি স্যার, তার অর্থ চট করে বুঝিনি। পরে ক্লিয়ার হল চারজনকে হত্যা করা হবে। সেটা কেন করলেন স্যার?"

"ওটা ওই শয়তান পুলিশ সঞ্জয় চৌধুরীর জন্য। শয়তান বুঝতে পারবে ওর দিন ঘনিয়ে আসছে। একটু মাথা খাটাতে হবে, কিন্তু বুঝবে তিনজনের পরে আসছে ওর পালা। ভয়ে ভয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাবে। এটা ওর এক্সট্রা শাস্তি, অন্যদের থেকে হাজার গুণ অন্যায় ওই স্কাউন্ড্রেলটা করেছে।"

রাখাল দত্তকে তাঁর কাজ করতেই হবে। বলল, "আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, আসুন স্যার আমার সঙ্গে।"

একেনবাবু খেয়াল করলেন কফি টেবিলের ম্যাগজিনগুলির মধ্যে 'নিউ ইয়র্কার'-ও আছে। কেন মেসেজ দেবার জন্য 'নিউ ইয়র্কার' ম্যাগাজিনটা বাছলেন, সেটা আর জিজ্ঞাসা

করা হল না। ওটা অবশ্য ইম্পর্টেন্ট নয়।

আইডিয়াল জুয়েলরি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

আজ সকাল থেকেই প্রমথ মারমুখো হয়ে আছে। আমি আর একেনবাবু নাকি অ্যাপার্টমেন্টটাকে আস্তাকুঁড় বানিয়ে ফেলেছি। এদিক-ওদিক কাগজপত্র ফেলার বদভ্যাস আমার আছে ঠিকই, কিন্তু একেনবাবুর তুলনায় আমার অপরাধ নিতান্তই গৌণ। উনি থালা-ভর্তি খাবার শোবার ঘরে নিয়ে যান, খাওয়া শেষ হলে অনেক সময়েই এঁটো থালা কিচেন সিঙ্কে রাখতে ভুলে যান। নোংরা জামাকাপড় লন্ড্রি বাস্কেটে না ফেলে হয় খাটের তলায়, নয় আলমারির কোণে গুঁজে রাখেন। বই নামিয়ে বুক শেলফে তোলেন না। এই রকম নানা অপরাধের মধ্যে যেটা প্রমথকে সবচেয়ে বেশি উত্যক্ত করে, সেটা হল ওঁর আধ-খাওয়া কফির কাপগুলো টেবিলে, মেঝেতে, বুকশেলফে যত্রতত্র ছড়িয়ে রাখার অভ্যাস।

যাইহোক, আজ সকালে আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে প্রমথ বসার ঘরটাকে ভদ্রস্থ করার কাজে লেগেছে। প্রমথর কাজে আমি নাক গলাই না, কারণ ওর গোছানোর একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, সেটা আবার মাঝে মাঝেই বদলায়। আমি যাই করি না কেন, সেটা ঠিক তখনকার গোছানোর ধারার সঙ্গে মেলে না, ফলে অশান্তি হয়। তাই সোফায় বসে একটা গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তার কি কোনো জো আছে? একেনবাবু অ্যাস ইউস্যুয়াল নিউ ইয়র্ক টাইমস খুলে বকবক করে কানের মাথা খাচ্ছেন!

"দেখেছেন স্যার, পাকিস্তানের আইএসআই-এর কাণ্ড!"

এমনভাবে কথাটা বললেন যে জিজ্ঞেস করতেই হয়, "কী কাণ্ড?"

"লাখ লাখ ডলার-এর জাল নোট এদেশে ছেড়েছে। সাহসটা দেখুন! ইন্ডিয়াতে ছাড়লে ধরা পড়ার চান্স কম থাকত, তা বলে এদেশে!"

"কী করে জানলেন লাখ লাখ?"

"এখানে একটু অনুমান করেছি স্যার... জ্যাকসন হাইট্স-এ একটা জালনোট পাওয়া গেছে বাংলাদেশি দোকানদারের কাছে। সে বলেছে নোটটা পেয়েছে এক পাকিস্তানি খদ্দেরের কাছ থেকে। একটা নোট জাল করে তো কেউ লাভ করবে না।"

"লাভ না হোক, ক্ষতিও হচ্ছে না... কিছু ডলার তো বাঁচছে।" একেনবাবুকে খোঁচাবার জন্যেই কথাটা বললাম।

"কী যে বলেন স্যার!" বলেই বুঝলেন এটা ঠাট্টা। "বাট দিস ইজ নট গুড ফর দ্য কম্যুনিটি। এখানকার সাদারা বাদামি চামড়ার সব্বার ওপর চটবে।"

কয়েক মিনিট মাত্র চুপচাপ, তারপরেই... "এই যে স্যার, আইএসআই হতেই হবে... জাল নোটের একটা বান্ডিল উদ্ধার হয়েছে একটা রেস্টুরেন্ট-এর টয়লেট রুম থেকে। মালিক জানে না কে ওটা ওখানে রেখেছে! বলছিলাম না স্যার, আমেরিকায় এসব জাল ব্যাপারটা চলে না!"

আমার বিরক্তি লাগল, "আচ্ছা, আপনি বার বার আইএসআই বলছেন কেন?"

"আসলে স্যার, ওদের খুব এক্সপার্টিজ আছে এ ব্যাপারে।"

আমাদের কথাবার্তাগুলো প্রমথর কানে কতটা যাচ্ছিল জানি না। নিজের কাজ থামিয়ে বলল, "ভেরেন্ডা না ভেজে, আমায় একটু সাহায্য কর তো। আর ওস্তাদি না করে ঠিক যে-ভাবে বলছি, সে-ভাবে কর।" তারপর একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আর আপনিও।"

প্রমথর মেজাজ যখন সপ্তমে চড়ে থাকে, আমি ওকে ঘাঁটাই না। তড়িঘড়ি বই রেখে যখন উঠছি, একেনবাবু পা নাচাতে নাচাতে প্রশ্ন করলেন, "স্যার, কথাটা ভেরেন্ডা না এরণ্ড?"

আমি বললাম, "আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়। দেখছেন ও খেপে আছে!"

"না না স্যার, আমিও উঠছি। আসলে কিনা ওটা নিয়ে আমার বরাবরই একটা কনফিউশন আছে!"

"এরণ্ড আর ভেরেন্ডা দুটোই এক," প্রমথ বলল। "আর দুটোই আপনাদের মতো ইউজলেস। বাপি, তুই বাথরুমটা ধর। আমি বাইরের ঘর পরিষ্কার করছি, আর একেনবাবু আপনি নিজের ঘর পরিষ্কার করে দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন।"

"তা করছি স্যার, কিন্তু এরণ্ডকে ইউজলেস বলবেন না, রেড়ির তেলের সোর্স ওটা। ব্রজদুলালবাবু তো ওই তেল বেচেই ক্যাস্টর অয়েল কিং হয়ে গেলেন।"

"রেড়ির তেলই ক্যাস্টর অয়েল নাকি?" তথ্যটা আমার কাছে নতুন।

"তোরা কাজ করবি না বকবক করবি," বলে প্রমথ কড়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ডোর বেল বাজল।

।। ২।।

এটাকে কাকতালীয় ছাড়া আর কী বলব জানি না, দরজা খুলেই একেনবাবু, "কী সৌভাগ্য স্যার, আসুন আসুন," বলে যাঁকে ঘরে ঢোকালেন, তিনি আর কেউ নন ব্রজ-ক্যাস্টর অয়েল-এর মালিক কোটিপতি ব্রজদুলাল দত্ত! কাঁচা-পাকা চুল, আশু মুখুজ্জে টাইপের গোঁফ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, গলাবন্ধ নেহরু জ্যাকেট... দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিলাম। চিনতে পারার কারণটাও বলি। বছর দুয়েক আগে এক মাসের জন্য কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে প্রৌঢ় ব্রজদুলালবাবুর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে প্রচুর কেচ্ছা-কাহিনি বড়ো বড়ো হেডলাইন দিয়ে পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল। নীচে পাশাপাশি থাকত এক তরুণী আর ব্রজদুলালবাবুর ছবি। মোটামুটি যা উদ্ধার করেছিলাম সেটা হল, ব্রজদুলালবাবু পিঠের ব্যথায় প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকতেন। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, হাকিমি... সব ফেল! এমন কী ফিজিক্যাল থেরাপিস্টদের স্ট্রেচিং এক্সারসাইজও। সেই সময়ে এক তরুণী এলেন ব্রজদুলালবাবুর জীবনে। ভলাপচুয়াস

সেক্সি চেহারার এক মাসাজ থেরাপিস্ট। ব্রজদুলালবাবু বন্ধুদের বলতেন, মেয়েটির আঙুলে নাকি জাদু আছে। ব্রজদুলালের সব ব্যথা-বেদনার উপশম ঘটত সেই আঙুলের কোমল-কঠিন স্পর্শে। তারপর থেকেই ব্যথাটা ঘন ঘন উঠত, মেয়েটিকেও আসত হত ঘন ঘন। নিন্দুকদের ধারণা পুরোটাই ধাপ্পা। ব্যথা নিশ্চয় ছিল, কিন্তু যত না ব্যথা তার থেকে বেশি দরকার ছিল সুন্দরী তরুণীর উষ্ণ সান্নিধ্য। চারমাসের মধ্যেই মাসাজ থেরাপিস্ট হয়ে গেলেন ব্রজদুলালবাবুর শয্যাসঙ্গিনী। শাস্ত্রমতেই বিবাহ। পঞ্চান্ন বছরের পাত্র, পঁচিশ বছরের পাত্রী। পঞ্চান্ন বছরের কাউকে কোনো মতেই বৃদ্ধ বলা চলে না। কিন্তু তাও বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বলে হাসিঠাট্টা চলত। সেখানেই কিন্তু ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি হয়নি। ব্রজদুলাল-পত্নির বিবাহ-বহির্ভূত কিছু ইন্টারেস্ট মনে হয় ছিল। ইন্টারনেটের সৌজন্যে সেই সব খবর পড়তাম। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই খবর রটল ব্রজদুলাল-পত্নি সন্তানসম্ভবা! ভুয়ো খবর। কিন্তু অনাগত সন্তানের পিতা কে? এ নিয়েও কিছুদিন বিভিন্ন নেট ফোরামে মুখরোচক আলোচনা চলেছিল। যাক সে কথা, ব্রজদুলালবাবুর কেচ্ছা-কাহিনির খবরগুলো জানতাম, একেনবাবু যে ব্রজদুলালবাবুকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন, সেটা জানা ছিল না!

নিউ ইয়র্কে খবর না দিয়ে কারোর বাড়িতে কেউ এসে উদয় হয় না। বোঝাই যায় ভদ্রলোক এইসব ফর্মালিটির ধার ধারেন না। প্রমথ ওঁকে না চিনলেও, ওঁর কেতাদুরস্ত পোশাক, কাঁচা-পাকা চুল এবং চলাফেরার আভিজাত্য থেকে বুঝে গেল, উনি একজন কেউকেটা। চট করে ঘরে গিয়ে গেঞ্জির ওপরে একটা শার্ট চাপিয়ে এল।

পরিচয়পর্ব শেষ হলে ব্রজদুলালবাবু একেনবাবুকে বললেন, "আপনার কাছে একটা সাহায্যের জন্য এসেছি।"

"নিশ্চয় স্যার, বলুন কী করতে পারি?"

ভদ্রলোক চকিতে আমার আর প্রমথর দিকে তাকালেন। "ব্যাপারটা খুবই প্রাইভেট, একটু আলাদা ভাবে আপনাকে বলতে চাই।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, আমার সমস্ত কেসেই ওঁরা জড়িত থাকেন। আমাকে বলাও যা ওঁদের বলাও তা।"

আমার একটু অস্বস্তিই লাগছিল, একজন বয়স্ক লোক যখন প্রাইভেসি চাচ্ছেন। আমি নিজেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম। প্রমথও আমার দেখাদেখি উঠে পড়ল।

একটা হাত তুলে আমাদের উঠতে বারণ করলেন ব্রজদুলালবাবু। রুমাল বার করে নাক-মুখ ঢেকে বেশ কয়েকবার হাঁচলেন।

"এক গ্লাস জল হবে?"

"নিশ্চয়।"

তাড়াতাড়ি জল এনে দিতেই সাইড পকেটে রাখা পিল-বক্স থেকে একটা বড়ি মুখে দিয়ে পুরো জলটা খেলেন। "আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টে কোনো ফুল আছে?"

প্রমথর গার্লফ্রেন্ড ফ্র্যান্সিস্কা গতকাল একগুচ্ছ ডালিয়া ফুল নিয়ে এসেছিল। নিশ্চয় প্রমথর শোবার ঘরে ওটা আছে।

"হ্যাঁ, আছে। আপনার কি ফুলে অ্যালার্জি?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"কতগুলো ফুলে। তবে এই ওষুধটা খেয়েছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।" প্রমথ ইতিমধ্যে বুদ্ধি করে একটা টিস্যুর বাক্স নিয়ে এসেছে, খুব চট করে অ্যালার্জি চলে যায় না।

"থ্যাঙ্ক ইউ," একটা টিস্যু তুলে নাকটা মুছলেন। চশমা খুলে চোখটা চুলকালেন বেশ

কয়েকবার, তারপর চশমা পরে বললেন, "আসলে ব্যাপারটা একটু এমব্যারাসিং।" বলে একটু চুপ করে আবার নাকটা মুছলেন। সশব্দে হাঁচলেন আরেকবার।

প্রমথ ওয়েস্ট বাস্কেটটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এখানে টিস্যুটা ফেলতে পারেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

"একটু কফি খাবেন স্যার?"

"না না, ঠিক আছে,... আসলে কী ভাবে শুরু করব ভাবছি... একটা দোকানে কাফলিংক কিনতে গিয়েই ঝামেলাটা শুরু। আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। মেয়েটা যে এভাবে আমায় ফাঁসাবে, কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু এখন তো সেগুলো ভেবে লাভ নেই।"

"দাঁড়ান স্যার, এভাবে বললে আমার মাথায় ঠিক ঢুকবে না। আপনি প্রথম থেকে একটু ডিটেল-এ বলুন। কোনো কিছু বাদ দেবেন না, অদরকারি মনে হলেও না।"

"বলছি," একটু ইতস্তত করে ব্রজদুলালবাবু শুরু করলেন ওঁর কাহিনি। "এখানে এসেছিলাম দিন পনেরো আগে। বিজনেসের কিছু কাজ ছিল... দিন সাতেকের ব্যাপার। তারপরে স্ত্রীকে নিয়ে একটু বেড়াব। ও আগে আমেরিকায় আসেনি, তাই একমাস এদেশে কাটাব প্ল্যান ছিল। বিজনেসের কাজ মানে সারাদিন কাজের পর ককটেল, ডিনার সবকিছু শেষ হতে হতে বেশ রাত হচ্ছিল। ট্যাক্সি না ধরে একটু হেঁটেই হোটেলে ফিরতাম। সঙ্গী হত শ্রীবাস্তব। শ্রীবাস্তব বেশ কয়েক বছর হল আমার কোম্পানিতে কাজ করছে। ও শুধু আমার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের হেড নয়, বলতে গেলে আমার কাছের লোক। আমার পছন্দ-অপছন্দ সব কিছুরই খোঁজ রাখে। ও-ই একদিন হাঁটতে হাঁটতে বলল 'আইডিয়াল জুয়েলরি'র কথা, দোকানটার স্পেশালিটি নাকি ডায়মন্ড কাফলিংক।"

"কাফলিংক স্যার?"

"হ্যাঁ। যেগুলো ড্রেস শার্টে ব্যবহার করা হয়।" একেনবাবুর চোখে বিস্ময় দেখে ব্রজদুলালবাবু বিশদ করলেন।

"না না স্যার, কাফলিংক তো হলিউডের অনেক স্টারদের ব্যবহার করতে দেখেছি, বোতামের বদলে ফুলশার্টের হাতায় লাগায়। আমাদের দেশে তেমন দেখিনি।"

"ঠিকই বলেছেন। নিজে কোনো দিনই কাফলিংক ব্যবহার করিনি, কিন্তু ওটা কালেক্ট করা আমার বাতিক। সুন্দর কাফলিংক দেখলেই আমি কিনি। বাইরের ঘরে আমার একটা সুন্দর এটাজেয়ার আছে...।"

"'এটাজেয়ার'-টা কী স্যার?"

"বলছি," বলে ব্রজদুলালবাবু টিস্যু তুলে নাকটা আরেকবার ঝাড়তে গেলেন।

সেই ফাঁকে প্রমথ বিজ্ঞের মতো বলল, "ওটা একটা ফ্রেঞ্চ শব্দ। অর্থ হল খোলা তাক, সাজিয়ে রাখার জিনিসের জন্য।"

"ওই এটাজেয়ার-এ আপনার কাফলিংকগুলো রাখতেন স্যার?"

প্রমথ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আমারও মজা লাগছিল কাফলিংক সংগ্রহও কারো হবি হতে পারে শুনে!

ব্রজদুলালবাবুর নিশ্চয় সেটা চোখ এড়ায়নি। আমাদের দিকে তাকিয়েই বললেন, "আপনারা আমার বাড়িতে আসেননি... দেখলে বুঝতেন কী দারুণ আমার কালেকশন! গতবছর একটা হিরে-বসানো কাফলিংক তো চুরিই হয়ে গেল। তারপর থেকে বাইরের ঘরেও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছি।"

তারপর মুখ ঘুরিয়ে একেনবাবুকে বললেন, "হ্যাঁ যেটা বলছিলাম... 'আইডিয়াল জুয়েলরি' দোকানটা ম্যানহাটানে নয়, হার্লেমে। হার্লেমের অনেক জায়গাই এক সময় জঘন্য ছিল ড্রাগ অ্যাডিক্ট আর গুন্ডা-বদমায়েশদের জায়গা। ইদানীং ভদ্রস্থ হয়েছে শুনেছিলাম। দোকানটা দেখার ইচ্ছে থাকলেও রাতে ওখানে যাওয়া সমীচীন হবে কিনা ভাবছিলাম। শ্রীবাস্তব বলল ক'দিন আগেই ওখানে গেছে, জায়গাটা এমন কিছু খারাপ নয়।

হোটেলে না ফিরে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। শ্রীবাস্তবই ডিরেকশন দিয়ে নিয়ে গেল। রাতে বেশির ভাগ দোকানপাটই বন্ধ হয়ে গেছে বা ঝাঁপ নামাচ্ছে। ভাগ্যক্রমে আইডিয়াল জুয়েলরি তখনও খোলা। ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে আমি নামলাম।

'আমি তো দেখেছি, আপনি দেখুন,' বলে শ্রীবাস্তব গাড়িতেই বসে রইল। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। দু-জনে নেমে এলে ড্রাইভার হয়ত ভাড়া চাইবে। আর ভাড়া পেলেই অদৃশ্য হবে।

অত রাত্রে দোকানে আর ঢুকলাম না। বাইরে থেকেই ডিসপ্লেগুলো দেখলাম। বেশ কয়েকটা দামি ডায়মন্ড কাফলিংক চোখে পড়ল। তার মধ্যে একটা কার্টিয়ের কোম্পানির স্যাফায়ার ডায়মন্ড কাফলিংক। এটার বিজ্ঞাপন ম্যাগাজিনে দেখেছি, ৩০ হাজার ডলারের মতো দাম। এরা বিক্রি করছে মাত্র ২৫ হাজারে! যে মেয়েটি কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল খুবই সুন্দরী, নাক-চোখ-মুখ দেখে মনে হল ইরানী। ইরানে মাঝেমধ্যেই যাই, ওদের ফিচারগুলো ভালোই চিনি। ভাবলাম একবার ঢুকি, ভালো করে কাফলিংকগুলো দেখি। কিন্তু শ্রীবাস্তব ট্যাক্সিতে বসে আছে। বরং জিজ্ঞেস করি কালকে খোলা থাকবে কিনা। ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটা বলল, 'কাল দশটা থেকে সাতটা পর্যন্ত খোলা।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, কালকে আসব।'

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সেদিন রাত্রে ওই কাফলিংকটা আমি স্বপ্নে দেখলাম, সেই মেয়েটাকেও দেখলাম! এক বন্ধুর সঙ্গে পরদিন দুপুরে লাঞ্চ ছিল। গল্প করতে করতে একটু দেরিই হল। লাঞ্চের পরে বন্ধু টেনে নিয়ে গেল ব্রডওয়েতে ওর আর্টিস্ট বান্ধবীর এক্সিবিশনে। অখাদ্য সব ছবি। তারই একটা কিনলাম গলাকাটা দাম দিয়ে। ওরাই প্যাক করে দেশে পাঠিয়ে দেবে, বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। সেখান থেকে হোটেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। আগে থেকেই একটা লিমো ঠিক করে রেখেছিলাম। হার্লেমে নিয়ে যাবে, আর ফেরত নিয়ে আসবে। সেদিন আবার বাইরে বেশ বরফ পড়ছে, রাস্তায় লোক প্রায় নেই বললেই চলে। যতটা সময় লিমোর লাগার কথা তার বেশি সময়ই লাগল। যখন দোকানের কাছে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন রাত সাতটা বেজে কয়েক মিনিট পার হয়ে গেছে। এমনিতেই এই রাস্তায় দোকান কম আর এদিকের দোকানগুলো বোধহয় তাড়াতাড়িই বন্ধ হয়। আলো বলতে শুধু রাস্তার আলো। লিমোটাকে দাঁড় করিয়ে আইডিয়াল জুয়েলরির সামনে গেলাম। দরজা বন্ধ, কিন্তু মেয়েটা দেখলাম ভিতরে আছে আর দরজার বাইরে সিকিউরিটি শাটার তখনও বন্ধ করা হয়নি। দরজা ঠেলে ঢুকতেই মেয়েটা বলল, 'দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।'

'সরি আমার আসতে দেরি হয়ে গেছে। গতকাল তোমাদের উইন্ডো ডিসপ্লেতে কার্টিয়ের স্যাফায়ার ডায়মন্ড কাফলিংক দেখেছিলাম সেটা কিনতে এসেছি।'

'আমাদের ক্যাশ ক্লোজ হয়ে গেছে, আই কান্ট সেল ইউ নাউ। আর ওটার দাম পঁচিশ হাজার ডলার... জানো তো?'

আমার বাদামি চামড়া দেখে মেয়েটা হয়তো ভাবছে কেনার মুরোদ আছে কি না।

‘ইয়েস,’ বলে আমার এখানকার অফিসের বিজনেস কার্ড মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিলাম। ‘তোমরা ক্রেডিট কার্ড নাও তো?’

মেয়েটা বিজনেস কার্ডটা দেখলাম মন দিয়ে দেখল। বলল, ‘দু-হাজার ডলার পর্যন্ত, তার বেশি হলে ব্যাঙ্ক চেক।’

ব্যাঙ্ক চেক মানে আমাদের ক্যাশিয়ার’স চেক বা ড্রাফট, অর্থাৎ আজ দোকান খোলা থাকলেও কিনতে পারতাম না। আমাদের ব্যাঙ্ক তো ছ’টার আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

‘ঠিক আছে, ওটা আমাকে একটু দেখাও, কালকে ব্যাঙ্ক চেক নিয়ে আসব বা কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব, সে নিয়ে যাবে।’

‘শিওর।’ মেয়েটা কাউন্টারের নীচ থেকে ওটা বার করে আমার হাতে দিল। বুঝলাম দোকান বন্ধ হলেও এ-রকম খদ্দের হাত-ছাড়া করতে চায় না।

নেড়েচেড়ে মনে হল মালটা জেনুইন। ওকে কাফলিংকটা ফেরত দিলাম। ‘হ্যাঁ, কালকে টাকা পাঠিয়ে দেব।’

মেয়েটি একটু চিন্তিত স্বরে বলল, ‘এই একটাই মাত্র আছে আমাদের কাছে, ডিজাইনটা এখন ডিসকন্টিনিউড। তুমি আসার আগে বিক্রি হয়ে গেলে দিতে পারব না।’

মেয়েটার দিকে এবার ভালো করে তাকালাম। শার্প ফিচার, ঘন কালো চুলের অনেকটাই ঢাকা সবুজ সিল্কের স্কার্ফে, নীলচে-সবুজ চোখ, ডিপ ভি-নেক ড্রেস... মোটকথা মনে দাগ কাটার মতো চেহারা।

আমি সহজে ছাড়লাম না। ‘এটা আমার দরকার, আমি ক্যাশ অ্যাডভান্স করতে পারি এটার জন্য।’

‘তুমি এই সোফায় একটু বোসো, এক কাপ কফি খাও। আমি স্টোর মালিককে ফোন করে দেখি, কী বলেন।’

কফি পটটা সামনেই ছিল। সেখান থেকে গরম কফি একটা কাপে ঢেলে আমাকে এগিয়ে দিল। তারপর ‘এক মিনিট’ বলে দোকানের পিছনে একটা দরজা খুলে ভেতরে গেল। একটু বাদেই ফিরে এসে বলল, ‘না, অ্যাডভান্স নিতে পারব না, স্টোর পলিসি।’

‘তাহলে?’

আমি নাছোড়বান্দা দেখে মেয়েটা বলল, ‘তুমি কখন টাকা পাঠাতে পারবে?’

‘কালকে দশটার সময়... ব্যাঙ্ক খুললেই।’

মেয়েটা তখনও কথা দিচ্ছে না কাফলিংকটা ধরে রাখবে। ‘আমরাও দশটার সময় দোকান খুলি, তখন যদি কেউ এসে যায়...।’

আমি তখন বললাম, ‘শোনো, তুমি বিশ্বাস করতে পারো আমি আসব। ...ঠিক আছে, তোমার কাছে তিন-চারশো ডলারের কোনো কাফলিংক আছে?’

‘আছে।’

‘দেখাও।’

মেয়েটি একটু অবাক হয়েই সাড়ে তিনশো ডলারের একটা কাফলিংক বার করল।

আমি মানিব্যাগ থেকে টাকা বার করতে করতে বললাম, ‘এতে অন্তত বুঝবে আমি একজন জেনুইন কাস্টমার। কালকে সকালে আমি ব্যাঙ্ক চেক নিয়ে আসব কার্টিয়েরের স্যাফায়ার ডায়মন্ড কাফলিংক-এর জন্য। তখন এটা ফেরত দিয়ে যাব।’

‘ফেরত তো নিতে পারব না, মেয়েটা কাউন্টারের পিছনে বড়ো করে লেখা একটা সাইন দেখাল ‘নো রিটার্ন, নো এক্সচেঞ্জ’।

‘না নিলে, না নেবে।’ বলে বিরক্ত হয়ে গুনে গুনে ওর হাতে তিনটে একশো ডলার

আর একটা পঞ্চাশ ডলারের নোট দিলাম।

মেয়েটা হতবাক! বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে একটা কাঁচা রসিদ দিচ্ছি। যদি চাও কালকে ব্যাঙ্ক চেকের সঙ্গে এটা নিয়ে এলে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব। মালিককে কিন্তু এ নিয়ে কিছু বলবে না... কারণ এটা আমি করতে পারি না।'

'তোমার নামটা কী?'

'ফারা,' মেয়েটা সাদা একটা কাগজে রসিদ লিখতে লিখতে উত্তর দিল। তারপর দেখলাম, কী জানি খুঁজছে।

'দাঁড়াও, এর বাক্সটা বোধহয় স্টক-রুমে পড়ে আছে, নিয়ে আসছি।' বলেই মেয়েটা আবার ভিতরে অদৃশ্য হল। গেল তো গেলই... আমি অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে পড়ছি। মাথাটাও একটু ঝিমঝিম করছে। কিছুক্ষণ ভেতরের এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে 'হ্যালো', 'হ্যালো' করলাম। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। একটা স্টক-রুম, কেউ নেই। আরেকটা দরজা, সেটা খুললাম। ঘরে নীল একটা আলো জ্বলছে, কিন্তু সেখানেও মেয়েটা নেই। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই... যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখি দোকানের সেই সোফাতেই শুয়ে আছি। মেয়েটা সামনে দাঁড়িয়ে। আমি চোখ মেলতেই উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আর ইউ ফিলিং ওকে নাউ?"

আমি তখনও একটু ঘোরের মধ্যে। 'তুমি কোথায় ছিলে?'

'এই কাফলিংক বক্সটা আনতে ভেতরে গিয়েছিলাম, এসে দেখি তুমি চোখ বুজে সোফায় শুয়ে আছ।'

'আমি তো তোমাকে খুঁজতে ভেতরে গিয়েছিলাম। তোমাকে দেখতে না পেয়ে একটা নীল বাতি জ্বালানো ঘরে ঢুকে হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়েছিল।'

মেয়েটা আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন আমি প্রলাপ বকছি। আমার কি ডিমেনশিয়া হচ্ছে! কিন্তু আমার তো পরিষ্কার মনে পড়ছে মেয়েটিকে ফলো করার কথা, প্রথমে স্টক-রুমে, তারপর নীল আলোয় ভরা ঘরে ঢোকা। এটা ঠিক, ইদানীং আমি খুব ভুলে যাচ্ছি। আমার স্ত্রী আমাকে প্রায়ই সেটা মনে করায়। এই তো গতকালই আমি বাথরুমে গেছি দাঁত মাজতে, স্ত্রী বলছে আমি নাকি বাথরুমেই যাইনি! হাতঘড়িতে দেখলাম সাতটা বেজে দশ মিনিট। সুতরাং মাত্র মিনিট পাঁচেক পার হয়েছে দোকানে এসেছি! এরই মধ্যে কি এত কিছু ঘটে যেতে পারে! হয়ত পুরোটাই আমার দিবাস্বপ্ন ছিল! নিজেকে সামলে নিয়ে কাফলিংকের বাক্সটা হাতে নিলাম।

মেয়েটি মনে হল দুশ্চিন্তা করছে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিজে নিজে যেতে পারবে, না একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব?'

'না, যেতে পারব।' বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। দোকানের সামনেই লিমো দাঁড়িয়ে ছিল। সোজা হোটেলে।

হোটেলে পৌঁছোনোর খানিক বাদে আমার স্ত্রী ঘরে ফিরল। আমি এই ঘটনাটা ওকে আর বললাম না। বললে আমার ডিমেনশিয়া হওয়ার থিওরিটাই জোরদার হত। যাইহোক পরের দিন সাড়ে ন'টায় ব্যাঙ্ক খুললে পঁচিশ হাজারের একটা ব্যাঙ্ক চেক দিয়ে শ্রীবাস্তবকে পাঠিয়ে দিলাম। নাম ফারা, মেয়েটার একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলাম। ওই গিয়ে চেকটা দিয়ে কাফলিংকটা নিয়ে এল। অন্য কাফলিংকটা আর ফেরত পাঠাইনি। মাত্র সাড়ে তিনশো ডলারের ব্যাপার। আর মালিকের সামনে ওটা দিলে মেয়েটা হয়তো একটু ঝামেলায় পড়তে পারে। এটা হল তিনদিন আগের ঘটনা।"

।। ৩।।

একটানা কথাগুলো বলে ব্রজদুলালবাবু একটু হাঁপাচ্ছেন।

"একটু কফি বা চা দেব স্যার?"

"না, না, আমি ঠিকই আছি। বরং আর এক গ্লাস জল দিন।"

আমি উঠে জল এনে দিলাম।

টিস্যু পেপারে আরেকবার নাক ঝেড়ে সাইড পকেটে রাখা পিল-বক্স থেকে আরেকটা পিল মুখে দিয়ে অনেকটা জল খেলেন। তারপর গ্লাসটা রেখে বললেন, "আচ্ছা, কতটা বলেছি বলুন তো?"

"তিনদিন আগের কথা... মিস্টার শ্রীবাস্তব কাফলিংকটা কিনে নিয়ে এলেন হোটেলে।" একেনবাবু খেই ধরিয়ে দিলেন।

"ও হ্যাঁ, আসল ব্যাপারটা ঘটল তার পরের দিন। আমার কাছে একটা চিঠি এল, ভেতরে তিনটে ছবি। একটা ছবিতে আমি সেই মেয়েটাকে টাকা দিচ্ছি, দ্বিতীয় ছবিতে সেই মেয়েটা নগ্ন শরীরে একটা খাটে শুয়ে আছে আর আমি সেই খাটের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ঝুঁকে আছি। তৃতীয়টা আরও বাজে একটা ছবি। প্রথম ছবিটা ঠিক, কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় ছবি কী ভাবে উঠল সেটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তার মানে কি আমি দিবাস্বপ্ন দেখিনি, মেয়েটার খোঁজে দোকানের ভেতরে ঢুকেছিলাম! কিন্তু সেখানে তো মেয়েটাকে শুয়ে থাকতে দেখিনি, তার ওপর উলঙ্গ অবস্থায়!

"চিঠি পাবার কয়েক ঘণ্টা বাদে একটা ফোন পেলাম। ফ্যাসফ্যাসে গলায় একটা লোক বলল, পরের দিন দুটোর সময় কাফলিংকটা ফেরত দিতে হবে। কোথায় কী ভাবে দিতে হবে, তার ইনস্ট্রাকশন ফোনে আসবে। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেই ওদের কাছে যা যা ছবি আছে সব সোশাল মিডিয়াতে তুলে দেওয়া হবে।

"এই ভয়টাই করছিলাম। ফোন কল পেয়ে আমি একেবারে বিধ্বস্ত। জানাজানি হলে এই বয়সে আরেকটা লজ্জার ব্যাপার হবে। আমি শ্রীবাস্তবকে ব্যাপারটা বললাম। শ্রীবাস্তব বলল, 'আপনি ২৫ হাজার ডলার দিয়ে কিনেছেন। এর মানে তো আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে সেই টাকাটাই ওরা ফেরত নিচ্ছে! কাফলিংকটা পেলেই যে ছবিগুলো নেট-এ তুলবে না, তার গ্যারান্টি কি? এরপর হয়তো ক্যাশ চাইবে। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, ছবিগুলো যদি ফেক হয়, তাহলে তুলুক না... আপনিও আইনি ব্যবস্থা নেবেন।'

"আমিই ওকে বললাম, আমার কাছে এই কাফলিংকটা এমন কোনো ব্যাপার নয়। স্রেফ শখের কেনা ছিল। আমার রেপুটেশন তার থেকে অনেক বড়ো। নতুন করে তাতে কোনো কাদা লাগুক চাই না। তুমি বরং আমাকে সাহায্য করো ওটা ফেরত দেবার ব্যাপারে। ওকে এটা বলার পর আপনার কথা মনে পড়ল, কিন্তু ফোন নম্বর বা ঠিকানা জানা ছিল না। খোঁজখবর করে ঠিকানাটা আজকে পেলাম। তাই সোজা চলে এলাম।"

"বেশ করেছেন স্যার। কিন্তু কতগুলো ব্যাপার একটু ভালো করে জেনে নিই। কাফলিংকটা কি আপনি ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, আসলে উপায় ছিল না। গতকাল ডেডলাইন ছিল। আমি নিজে দিইনি, শ্রীবাস্তব দিয়েছে। কিন্তু আমি দূর থেকে দেখেছি। পোর্ট অথরিটির মেইন টিকিট প্লাজার কাছে রেস্ট-রুমের সামনে একটা বালতি রাখা ছিল, সেখানে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে কাফলিংকটা রাখার কথা ছিল। সময় দেওয়া ছিল দশটা থেকে দশটা পাঁচের মধ্যে। রাখতেই একজন সাফাইয়ের লোক এসে বালতিটা নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হল।"

"বুঝলাম স্যার, কিন্তু আমাকে এখন কী করতে বলেন?"

"আমার এখন চিন্তা হচ্ছে, আবার যদি টাকা চায়। কারণ, ছবিগুলো সবই তো ওদের কাছে!"

"তা চাইতেই পারে।"

"তাহলে?"

"আপনি একটা কাজ করুন স্যার। নিউ ইয়র্ক পুলিশের কাছে ব্যাপারটা রিপোর্ট করুন।"

বুঝতে অসুবিধা হল না, পুলিশকে খবর দেবার ব্যাপারে ব্রজদুলালবাবুর খুবই অনিচ্ছা। নারীঘটিত কোনো ব্যাপার পুলিশের কানে ওঠে উনি চান না। জিজ্ঞেস করলেন, "আর কী করা যেতে পারে ব্ল্যাকমেল-এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য?"

"একটু ভাবতে হবে স্যার। ভালোকথা, যে দোকান থেকে আপনি কাফলিংকটা কিনেছিলেন, সেখানে কি গিয়েছিলেন মেয়েটার খোঁজ করতে?"

"না, ভয় হচ্ছিল গেলে হয়তো আরও ঝামেলায় পড়ব।"

"দোকানের ঠিকানা আছে আপনার কাছে?"

"তা আছে।" বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন ব্রজদুলালবাবু। ২৫ হাজার ডলারের একটা রিসিটের ওপরে ছাপা, আইডিয়াল জুয়েলরি, ১৩৪ স্ট্রিট ওয়েস্ট-এর একটা ঠিকানা।

"এটা কপি, আপনি রাখতে পারেন। অরিজিনালটা আমার কাছে আছে।"

"ঠিক আছে। এবার টাকা চাইলে, টাকা না দিয়ে আমাকে জানাবেন। তখন দেখি স্যার কিছু করতে পারি কিনা।"

"এখন আর কিছু করতে পারেন না?"

"কাফলিংকটা তো দিয়েই দিয়েছেন স্যার!"

"না না, কাফলিংকের কথা বলছি না। ওটা গেছে ধরেই নিয়েছি। আমি বলছি ছবিগুলো ফেরত পাবার ব্যাপারে।"

আমাদের দেখিয়ে একেনবাবু বললেন, "এঁরা ভালো বলতে পারবেন... কিন্তু ডিজিটাল যুগে সেটা কি আর সম্ভব স্যার।"

"তার মানে সারা জীবন আমাকে ভয়ে ভয়ে কাটাতে হবে!"

"এত দুশ্চিন্তা করছেন স্যার। আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে ছবিগুলো জাল। তাই না?"

"শুধু টাকা দেবার ছবিটা ঠিক। অন্যগুলো নয়, অন্তত আমার জ্ঞানত নয়।"

"তাহলে ওটা নিয়ে চিন্তা করবেন না স্যার। আমি ভাবছি অন্যকথা, আপনি অতগুলো টাকা দিয়ে কাফলিংক কিনলেন আর সেটা ভাঁওতা দিয়ে কেউ নিয়ে গেল এটা তো স্যার অপরাধ!"

"আপনি ধরতে পারবেন ওদের?"

"পুলিশের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে স্যার, আপনি নিজে রিপোর্ট করুন বা না করুন। বাজে ছবি দেখিয়ে আপনাকে প্রতারণা করবে, এটা মেনে নেবেন কেন?"

"বেশ আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন। আমি এখানে টাইম স্কোয়ারে আছি হিলটন-এর ডাবল ট্রি স্যুইটস-এ। রুম নম্বর, মোবাইল, সব এখানে লিখে দিয়েছি। অনেক সময়েই আমি ফোন তুলি না, তাই আমার অ্যাসিস্টেন্ট শ্রীবাস্তবের মোবাইল নম্বরটাও রয়েছে।" বলে আর একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন।

"ভালোকথা, কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাই আপনাকে?"

"ওটা নিয়ে এত ভাবছেন কেন স্যার, আগে কাজটা তো হোক।"

ব্রজদুলালবাবু চলে যেতেই প্রমথ বলল, "কী মনে হয়... বুড়ো আবার ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়েছিল?"

"কে জানে স্যার!"

"আপনার একটা কথার অর্থ কিন্তু ধরতে পারলাম না।" আমি বললাম।

"কোনটা স্যার?"

"ওই যে আপনি ব্রজদুলালবাবুকে বললেন 'এবার টাকা চাইলে আপনাকে জানাতে'? জানালে করতেনটা কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"একটা গল্পে পড়েছিলাম স্যার, ব্ল্যাকমেলারকে ধরা হয়েছিল জাল নোটের বান্ডিল দিয়ে। জাল নোটগুলো ব্যাঙ্কে জমা দিতে গিয়েই লোকটা ধরা পড়েছিল!"

একেনবাবু ঠিক কী বলছেন আমার মাথায় ঢুকল না। "কী যা-তা বলছেন! জালনোটের বান্ডিল পাবেন কোত্থেকে?"

"কেন স্যার, ক'দিন আগেই পত্রিকায় দেখলেন না একটা জাল নোটের বান্ডিল পাওয়া গেছে! ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে বলে যদি সেখান থেকে কিছু ব্যবহার করা যেত..."

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? উদ্ধার-করা জাল নোট ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আবার বাজারে ছাড়তে দিতেন?"

"ঠিকই, মনে হয় না স্যার।"

"তাহলে?"

"ভাবছি স্যার... আপনার ক্লাস শেষ হচ্ছে কখন?"

"আজকে ক্লাসের পরে একটা মিটিং আছে, কিন্তু পাঁচটার মধ্যে ফ্রি হয়ে যাব।"

"তাহলে স্যার চলুন না, আইডিয়াল জুয়েলরি দোকানটা একবার দেখে আসি। ঠিকানাটা তো আছে।"

।। ৪।।

মিটিং শেষ করে গাড়ি বার করে আইডিয়াল জুয়েলরি-তে পৌঁছোতে একটু দেরি হল। দোকানটা মান্ধাতা আমলের পুরোনো বিল্ডিং-এর এক তলায়। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না খুব দামি কাফলিংক এরা রাখে। ভিতরে ঢুকে দেখি সামনের ছোটো উইন্ডো থেকে ডিসপ্লেগুলো সরানো হচ্ছে। যিনি সরাচ্ছেন, তিনি একজন মোটাসোটা মাঝ-বয়সি ভদ্রলোক। কাঁচা-পাকা চুল, মোটা ভুরু, নাকের ওপর একটা বড়ো আঁচিল। কোনো মেয়ে সেলস পার্সন চোখে পড়ল না।

"মে আই হেল্প ইউ? আজ আমাদের আর্লি ক্লোজিং... পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে।" বাকি ডিসপ্লেগুলো একটা বাক্সে ঢুকিয়ে ভদ্রলোক কথাটা বললেন।

"স্যার, কয়েকদিন আগে একজন ম্যাডাম আমাকে কয়েকটা হিরে বসানো কাফলিংক দেখিয়েছিলেন, তিনি কি আছেন?"

একেনবাবুর পোশাকপরিচ্ছদ দেখে তিনি যে দামি কাফলিংক খুঁজতে পারেন ভাবা কঠিন।

“আপনাকে?” অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রলোকের প্রশ্নে অবিশ্বাসটা ধরা পড়ল।

“হ্যাঁ স্যার।”

“কতদিন আগের কথা বলছেন?”

“তা প্রায় দিন চারেক।”

“আপনি বোধহয় ফারা-র কথা বলছেন। আপনি কোন কাফলিংক দেখেছিলেন মনে আছে?”

“কার্টিয়ের স্যাফায়ার ডায়ামন্ড...।”

“সরি, ওটা বিক্রি হয়ে গেছে।” একেনবাবু কথা শেষ করার আগেই ভদ্রলোক বললেন।

“ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। যিনি কিনেছিলেন তিনি বললেন ম্যাডাম ফারা-কে ওটা ফেরত দিয়েছেন।”

“হতে পারে না, আমরা রিটার্ন নিই না, স্টোর পলিসি।” গলার স্বরে বেশ দৃঢ়তা।

“তাহলে কি ভুল শুনলাম স্যার! আচ্ছা ম্যাডামের সঙ্গে কী ভাবে যোগাযোগ করা যায় বলতে পারেন?”

“বলতে পারব না।”

“উনি তো এখানে কাজ করেন স্যার। কবে আসবেন?”

“ফারা ক’দিন হল আসছে না। কোথায় আছে তাও জানি না।” বেশ বিরক্ত হয়েই কথাটা এবার বললেন।

ঠিক এই সময়েই বেশ কয়েকজন কাস্টমার দোকানে ঢোকায় ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা শুরু করলেন। একেনবাবু কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি তাড়া দিলাম, “চলুন।”

“হ্যাঁ স্যার।” বলে আমার সঙ্গে এগোলেন, কিন্তু দৃষ্টি দেখলাম দোকানের পেছনে দরজাটার দিকে রয়েছে।

গাড়ি পার্ক করেছিলাম পাশের রাস্তায় একটা পার্কিং মিটারের সামনে। হার্লেমে এভাবে গাড়ি পার্ক করতে অস্বস্তি হয়। জানি আমার এই পুরোনো গাড়ি কেউ চুরি করবে না, তবে স্রেফ মজা করার জন্যেও তো গাড়ির কাচ ভেঙে দিতে পারে বা টায়ার ফাঁসিয়ে দিতে পারে! প্রমথর মতে আমার এই অস্বস্তি-র কারণ কুসংস্কার। কালোদের আমি ভয় পাই আর হার্লেমে কিছু কিছু অঞ্চলে কালোদের আধিক্য। আমাকে খোঁচায়ও, ‘তুই নিজেও তো কালো, তাহলে কালোদের নিয়ে এত দুর্ভাবনা কেন?’

থাক ওসব কথা। গাড়িটা অক্ষত অবস্থাতেই আছে। গাড়িতে উঠে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম। “এবার কী করতে চান?”

“আমি একটু কনফিউসড স্যার। কিছু একটা আছে ওই কাফলিংকে...ব্রজদুলালবাবুকে ব্ল্যাকমেল করা, ফারা ম্যাডামের হঠাৎ অদৃশ্য হওয়া... দোকানদার ভদ্রলোক মনে হল আমাদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে চান না!”

“অবশ্যই চায় না। তবে রিটার্ন না নেওয়ার কথাটা ঠিক বলেছে। রিটার্ন নিলে টাকা ফেরত দিতে হয়। ব্ল্যাকমেল করে মাল হাতাতে পারলে মালটাও থাকে পয়সাও খরচা হয় না।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার। কিন্তু মালটা তো নেই বললেন।”

“ব্ল্যাকমেল করে যে মাল হাতিয়েছে, দোকানে সেটা রাখবে কেন? নিশ্চয় অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে!”

"হতে পারে, বাট ইট ইজ ভেরি কনফিউসিং স্যার! আর ম্যাডাম ফারাই বা গেলেন কোথায়? ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে একটু ফোন করে দেখি যদি কোনো খবর জোগাড় করতে পারেন।"

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট মনে হয় বাইরে কোথাও ছিলেন, মেসেজ পেয়ে একটু বাদেই ফোন করলেন। একেনবাবু আইডিয়াল জুয়েলরি আর ফারা-র কথা বলতেই কিছু একটা বললেন যেটা শুনে একেনবাবু উত্তেজিত।

"বলেন কি স্যার, আপনি শিওর!... আমরা তো আইডিয়াল জুয়েলরি থেকেই ফিরছি। ওরা কিন্তু কিছুই জানে না... আজকেই... হ্যাঁ স্যার, আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছোব... আসবেন? নিশ্চয় স্যার,... ঠিক আছে তখন কথা হবে।"

গাড়ি চালাচ্ছিলাম, ঠিক বুঝলাম না কী আলোচনা হচ্ছে। ফোন শেষ হলে একেনবাবু বললেন, "ঘণ্টা কয়েক আগে একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে। মনে হয় দিন কয়েক আগেই খুন করা হয়েছে। বডিটা সম্ভবত ম্যাডাম ফারার, কিন্তু ফর্মাল আইডেন্টিফিকেশন হয়নি।"

কথাটা শুনে আমি স্তম্ভিত! "বলেন কি! কোথায় পাওয়া গেল?"

"হার্লেমে। ডিটেল কিছু বললেন না। কোনো একটা মিটিং-এ যাচ্ছেন। সেটা শেষ হলে কফি খেতে আসবেন আমাদের বাড়িতে, তখন জানতে পারব।"

ইদানীং এই কফি খেতে আসাটা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের একটা অছিলা। গোলমেলে কোনো কেস থাকলে সোজা এসে হাজির হন। আসেন কফি খেতে। কফি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে একেনবাবুর পরামর্শ নেন।

প্রমথ খ্যাপায়, "স্টুয়ার্ট সাহেবের তো পরের ধনে পোদ্দারি, আপনার মাথা ঘেঁটে কেস সলভ করে নিজে বড়ো সাহেবদের বাহবা নিচ্ছেন! আপনার তাতে কী ঘোড়াড্ডিম হচ্ছে!"

"কী যে বলেন স্যার, কত সাহায্য করেন উনি!"

"বাপির একটা ট্র্যাফিক ভায়লেশনের কেস মাফ করেছেন, আর তো কিছু করতে দেখিনি!" প্রমথ ছাড়ে না।

"শুনছেন স্যার, প্রমথবাবু না সত্যি!"

।। ৫ ।।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট এলেন সাড়ে সাতটা নাগাদ। খুব ভালো মুডে। আজ সকালেই ওঁর প্রমোশন হয়েছে। এখন থেকে উনি হলেন 'বরো' ইনভেস্টিগেটিভ চিফ, অর্থাৎ নিউ ইয়র্কের সবগুলো বরো ম্যানহাটান, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, কুইন্স এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ড-এর তদন্তের সব কাজ তদারকি করার দায়িত্ব পেয়েছেন।

"তারমানে কি স্যার আপনি চিফ ডিটেকটিভ?"

"আরে না," বলে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নিউ ইয়র্ক পুলিশের স্ট্রাকচার বোঝাবার চেষ্টা করলেন... খানিকটা মাথায় ঢুকল, অনেকটাই না। এই কাহিনির জন্য সেটা প্রয়োজনীয়ও নয়। আইডিয়াল জুয়েলরি সংক্রান্ত যে-সব আলোচনা হল সেগুলোই সংক্ষেপে লিখি। ফারা-র মৃত্যুর ব্যাপারটা আলোচনার প্রথমে এলেও, সেটা পরে বলছি।

আইডিয়াল জুয়েলরির ব্ল্যাকমেল-এর ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট জানতেন না। দোকানটার ব্যাপারে ওঁর আগ্রহ সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। ইদানীং হার্লেমে বেশ কিছু দোকানে বে-আইনি জুয়োখেলা চলছে। সন্দেহ করা হচ্ছে এই জুয়ো-চক্রের একটা সেন্টার হল আইডিয়াল জুয়েলরি। জুয়োখেলা শুরু হয় দোকান বন্ধ হবার পর। আদি অকৃত্রিম ক্র্যাপস গেম থেকে শুরু করে, স্লট মেশিন, রুলেট, অনলাইন ফ্যান্টাসি গেম... সব কিছুই চলে! ভিতরের সিসিটিভি তখন বন্ধ থাকে। খেলা শেষ হলে আবার চালু করা হয়। অর্থাৎ এই জুয়ো খেলার কোনো ভিডিও প্রমাণ থাকে না।

বছর দশেক আগে ব্রুকলিনে কয়েকটা দোকানে এ ধরনের জুয়ো চলত। হাজার কুড়ি-তিরিশ ডলার লেনদেন হত প্রতি সপ্তাহে। হাউস বা দোকান তার থেকে রাখত হাজার পাঁচেক। সেগুলো বন্ধ করা গেছে। কিন্তু হার্লেম অনেক অর্গানাইজড। গ্যাম্বলিং সেন্টারগুলো মনে হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়, সম্ভবত চালাচ্ছে কোনো মাফিয়া-টাইপ ফ্যামিলি। আট-দশটা দোকানে মিনি-ক্যাসিনো বসিয়ে ভালোই রোজগার করছে। আইডিয়াল জুয়েলরি এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। আন্ডারগ্রাউন্ড অপারেশনটা তদারক করা হচ্ছে সম্ভবত এই দোকানটা থেকেই। যে-কেউ এসব দোকানে গিয়ে জুয়ো খেলতে পারে না, তাদের মেম্বার হতে হয়। মেম্বারদেরও ভালো করে সার্চ করে দোকানে ঢোকানো হয়... নো গান, নো ক্যামেরা। চট করে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় যাতে কারো চোখে না পড়ে। এত সব জেনেও এদের গ্রেফতার করা যাচ্ছে না কেন? সেটা করা যেত খেলা চলার সময় হঠাৎ হানা দিতে পারলে, কিন্তু তার জন্য ওয়ারেন্ট চাই। নইলে সেটা হবে ইল্লিগ্যাল ব্রেক-ইন, কোর্টে কেস দাঁড়াবে না। আর ওয়ারেন্টের জন্য একজন জজকে প্রথমে বোঝাতে হবে যে এই সন্দেহের একটা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে। জজরা আবার প্রাইভেসিতে এত বিশ্বাসী, কাজটা খুব সহজ নয়।

এইবার ফারার প্রসঙ্গে আসি। ফারার মৃতদেহ পাওয়া গেছে হার্লেমের একটা পরিত্যক্ত স্কুল বিল্ডিং-এর পাশে। বিল্ডিংটা ভাঙা হচ্ছে, দুটো ডাম্পস্টার-এর মাঝখানে বডিটা রাখা ছিল। সেই জন্যেই ক'দিন কারোর চোখে পড়েনি। লুঠ করাই মনে হয় উদ্দেশ্য ছিল, রেপ-এর কেস নয়। হ্যান্ডব্যাগ, জুয়েলরি সবই অদৃশ্য। ড্রাগ অ্যাডিক্টরা দশ-কুড়ি ডলারের জন্যেও খুন করে। নিশ্চয় ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেছিল, বাধা দেওয়ায় ছুরি মেরেছে। বডিটার প্রিলিমিনারি আইডেন্টিফিকেশন হয়ে গেছে। করেছে নিউ ইয়র্কের ইরানিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একজন মেম্বার। মেয়েটি ওদের পাড়াতেই থাকত, কাজ করত আইডিয়াল জুয়েলরিতে। মনে হয় যখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল, তখনই ব্যাপারটা ঘটেছে। ফারার ভাইকে খবর দেওয়া হয়েছে ফর্মালি বডিটা আইডেন্টিফাই করতে।

একেনবাবু মন দিয়ে সব শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন, "আপনি স্যার, জানেন কি না জানি না এই ম্যাডাম ফারার কাছ থেকে আমার পরিচিত ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যান একটা দামি কাফলিংক কিনেছিলেন।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ স্যার, ব্রজদুলালবাবু, মানে এই বিজনেসম্যানকে দিন দুই আগে ব্ল্যাকমেল করা হয় ম্যাডাম ফারার সঙ্গে কতগুলো ঘনিষ্ঠ, বলতে পারেন অশ্লীল ছবি দেখিয়ে। কাফলিংক ফেরত না দিলে নাকি সেগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হবে!"

"তারপর?" ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট খুবই ঔৎসুক্য নিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

"ব্রজদুলালবাবু ঝামেলা এড়াতে কাফলিংক ফেরত দিয়ে দেন। পুলিশকেও ব্যাপারটা

জানাননি। কারণ ওঁকে ভয় দেখানো হয়েছিল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই ছবিগুলো ইন্টারনেটে তুলে দেওয়া হবে।"

"ছবিগুলো কি আমি দেখতে পারি?"

"নিশ্চয় স্যার, আমি তার বন্দোবস্ত করতে পারি।"

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে দেখে মনে হল একটু চিন্তিত।

"আপনি কিছু ভাবছেন স্যার?"

একেনবাবুর কাছে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট সাধারণত কিছু লুকোন না। বললেন, "হ্যাঁ।"

আমরা সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকালাম।

"নিশ্চয় এই কাফলিংকটাই ছিল এভিডেন্স... এখন সেটা গন ফর এভার!"

"তার মানে?"

"আইডিয়াল জুয়েলরির একটা কাফলিংকে স্পাই ক্যামেরা ঢোকানো ছিল... কারা কারা আসছে, কী করছে রেকর্ড করার জন্য। সেটাই মনে হচ্ছে বদমায়েশরা অদৃশ্য করেছে।"

"দাঁড়ান স্যার, আপনি কী করে জানলেন সেটা?"

"এফবিআই-এর এক এজেন্ট দোকানটার ওপর নজরদারি করার জন্য কয়েকদিন আগে একটা দামি কাফলিংক কিনে তাতে স্পায়িং ডিভাইসটা ঢুকিয়ে ছিল। পরে পছন্দ হচ্ছে না বলে কাফলিংকটা ফেরত দিয়েছিল।"

আমি বললাম, "কিন্তু আইডিয়াল জুয়েলরি তো রিটার্ন নেয় না!"

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট মুচকি হেসে বললেন, "সেই এজেন্টটি ইয়ং এবং দারুণ হ্যান্ডসাম। কিছু একটা করে ম্যানেজ করেছিল নিশ্চয়। অবভিয়াসলি দুষ্কৃতিকারীদের কেউ এই স্পায়িং ডিভাইসের কথা জানতে পেরেছিল, যার জন্য এই ব্ল্যাকমেল।"

"আমি একটু কনফিউসড স্যার, সেটা জানল কী করে?"

"সেটা আর জানতে পারব না। যেটা জানি, যে-এজেন্ট স্পাইং ক্যাম-রেকর্ডার ঢুকিয়েছিল আর ওই এজেন্টের পার্টনার যে গত পরশু ওটা কিনতে গিয়ে দোকানে পায়নি, তারা দু-জনেই মিস্টিরিয়াসলি ডেড!"

"মিস্টিরিয়াসলি স্যার?"

"হ্যাঁ, একটা বিশাল ট্রাকের ধাক্কায় ওদের গাড়ি চুরমার হয়ে গেছে। ঘটেছে গভীর রাত্রে, ট্রাকটা অদৃশ্য। ট্রাকটার খোঁজ করা হচ্ছে। তবে আমার মনে হচ্ছে এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, এটা খুন। করেছে একটা মাফিয়া গ্যাং, যাদের ইনফর্মার এফবিআই-তেও আছে।"

"আই সি। তবে একটা প্রশ্ন স্যার, এফবিআই এর মধ্যে জড়াচ্ছে কেন, গ্যাম্বলিং তো পুলিশের সমস্যা!"

"ঠিক পুলিশের সমস্যা আর নয়। কিছুদিন আগে একটা বড়োসড়ো জাল নোটের বান্ডিল ম্যানহাটানেই পাওয়া গিয়েছিল। এই জালনোটের ব্যবসা অর্থাৎ, ওগুলো বানানো, ব্যবহার করা, বাজারে ছাড়া সব হচ্ছে ফেডারেল ক্রাইম যা এফবিআই-এর এক্তিয়ারে পড়ে। কয়েকটা জাল নোট-এর সঙ্গে আইডিয়াল জুয়েলরির যোগ ওদের এজেন্ট আবিষ্কার করেছে। ঠিক কী করে আমি নিজেও জানি না। কিন্তু ওদের অবস্থাও আমাদের মতো। এমন কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই যেটা ফেডারেল জজের কাছে পেশ করে খানাতল্লাশের ওয়ারেন্ট বার করতে পারে।"

"এবার বুঝলাম স্যার।"

"যাইহোক, তোমার এই বিজনেসম্যান-এর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। আজকে তো

আর হবে না, কিন্তু কাল সকালে।"

"ঠিক আছে স্যার, আমি ওঁকে ফোন করছি।" বলে একেনবাবু বোঁ করে ওঁর ঘরে চলে গেলেন। হাড় কেপ্পন লোক, টেলিফোন লাইনে ফোন করলে খরচা বাঁচে।

খানিক বাদে বেরিয়ে এসে বললেন, "না স্যার, ফোনে ওঁকে ধরতে পারছি না। ওঁর এক অ্যাসোসিয়েট শ্রীবাস্তবের সঙ্গে কথা হল। তিনিও একই হোটলে আছেন আর এই ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারটা জানেন। ব্রজদুলালবাবু আটটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। তার পরে আসতে বললেন। তাছাড়া ব্রজদুলালবাবুর স্ত্রীও হোটেলে আছেন, সেটাও জানালেন। ব্যাপারটা একটু সেন্সেটিভ তো, তাই বোধহয়। আমি বলেছি কালকে সকালে আমরা আসব।"

"ঠিক আছে, আমি তোমাদের হোটেলে মিট করব। কোন হোটেল?"

"হিলটন-এর ডাবল ট্রি স্যুইটস টাইম স্কোয়ারে।

।। ৬।।

প্রমথ যেতে পারল না। আমি আর একেনবাবু যখন গিয়ে পৌঁছোলাম তার আগেই মনে হল ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট পৌঁছে গেছেন। বেশ কিছু পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখে সন্দেহ হল, একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে! সন্দেহটা ভুল নয়। হোটেলের লবিতে ঢুকতেই পুলিশ আটকাল। ভাগ্যক্রমে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের এক চেলা, নামটা মনে নেই, একেনবাবুকে চিনতেন। তিনিই আমাদের ঢুকতে দিলেন। দোতলায় ব্রজদুলালবাবুর স্যুইট।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "ইয়োর বিজনেসম্যান ফ্রেন্ড ইজ নো মোর। এক ঘণ্টা আগে কেউ ওকে মার্ডার করেছে। স্ট্যাব্ড-টু-ডেথ! আমার দু-জন কলিগ তোমাদের এ নিয়ে কিছু প্রশ্ন করবে।"

"নিশ্চয় স্যার, যতটুকু জানি নিশ্চয় বলব।"

এই ফ্লোরে মনে হল অনেকগুলো স্যুইট। আমাদের তারই একটাতে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নিয়ে গেলেন। খানিক বাদেই সাধারণ পোশাকে দু-জন ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের একজন ডেভ বলডুইন, এফবিআই-এর ফিল্ড অফিসার। দ্বিতীয় জন হলেন ৩০নং প্রিসিঙ্কট-এর ক্যাপ্টেন ল্যারি স্টকটন। আমাদের আলাদা আলাদা বিবৃতি নেওয়া হল পাশের একটা ছোটো ঘরে। প্রথমে একেনবাবুর, তারপর আমার। আমাকে প্রশ্ন করলেন ল্যারি। ব্রজদুলালবাবুর সঙ্গে আমার আর একেনবাবুর কী কী কথা হয়েছে তা আদ্যোপান্ত জানতে চাইলেন। তারপর প্রশ্নের বাঁকটা একটু অন্যদিকে গেল। ব্রজদুলালবাবুর বিয়ে কতদিন হয়েছে, ওঁর স্ত্রীর কোনো বন্ধুদের চিনি কিনা, মিস্টার শ্রীবাস্তব সম্পর্কে কিছু জানি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝতে অসুবিধা হল না, ওঁরা ব্যাপারটা পরকীয়া অ্যাঙ্গেল থেকেও দেখছেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যারি বুঝতে পারলেন পরকীয়া অ্যাঙ্গেল যদি কিছু থেকেও থাকে, আমার কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না। আমি ওঁদের দু-জনের কাউকেই চিনি না। আর একেনবাবুও মিস্টার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে শুধু একবারই ফোনে কথা বলেছেন।

ওঁদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের ঘরে এসে চোখে পড়ল একজন যুবক ও যুবতী শঙ্কিত মুখে সোফায় বসে আছে। একেনবাবু নেই। যুবকটি আমাকে দেখে উঠে এল।

"আপনি কি মিস্টার একেন সেন?"

"না।"

বলতে বলতেই দেখি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে একেনবাবু ঘরে ঢুকছেন।

বললাম, "যাঁকে খুঁজছেন, ইনিই হচ্ছেন সেই একেনবাবু।"

"আপনিই একেনবাবু!"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"আমি শ্রীবাস্তব, ব্রজদুলালবাবু ছিলেন আমার বস।"

"বুঝতে পেরেছি স্যার, আপনার সঙ্গেই তো ফোনে কাল কথা হল।"

"ঠিক। আসলে আপনার ওপর স্যারের খুব আস্থা ছিল। সুকন্যা, মানে স্যারের স্ত্রী খুব ভয় পাচ্ছে। বিদেশ বিভুঁইয়ে এই মার্ডার কেসে যদি ওকে জড়িয়ে ফেলা হয়! পুলিশ নানান ভাবে ওকে জেরা করছে। আমাকেও করছে।" গলার স্বরটা কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে শ্রীবাস্তবের।

সোফায় বসে থাকা যুবতীটিই নিশ্চয় সুকন্যা, ব্রজদুলালবাবুর স্ত্রী। হাতে ছোট রুমাল, ঘন ঘন চোখ মুছছেন। অসহায় ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা। সুন্দরী ঠিক নন, কিন্তু শোকাচ্ছন্ন চেহারাতেও সেক্সিনেসটা ঢাকা পড়েনি।

"কী মুশকিল স্যার, পুলিশ তো এগুলো করবেই তদন্তের স্বার্থে। এতে ভয় পাবার তো কিছু নেই!" একেনবাবু একটু জোর গলাতেই বললেন, যাতে সুকন্যার কানে যায়।

"তাও আপনি যদি ওর সঙ্গে একটু কথা বলেন। আসলে সুকন্যা শুধু স্যারের স্ত্রী নয়, আমি ওকে চিনি বহু দিন ধরে।"

"কথা তো নিশ্চয় বলতে পারি স্যার। কিন্তু এই তদন্তে আমার তো কোনো হাত নেই।"

"তা জানি, কিন্তু ও যদি জানে ওর স্বার্থ আপনি দেখবেন, তাহলে মনে ভরসা পাবে।"

"স্বার্থ তো দেখেন স্যার উকিল। ঠিক আছে স্যার, আমি নিশ্চয় কথা বলছি ওঁর সঙ্গে। তার আগে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।"

একেনবাবু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে কী বললেন জানি না, কিন্তু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দেখলাম সম্মতি দিলেন। একেনবাবু এসে ব্রজদুলালবাবুর স্ত্রীকে নমস্কার করে বললেন, "ম্যাডাম, আমার নাম একেন সেন, আমি আপনার স্বামীর পরিচিত।"

ব্রজদুলালবাবুর স্ত্রী সুকন্যা ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, "আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি প্লিজ ওঁকে কে হত্যা করল বার করুন। আমার খুব ভয় করছে। আমার মনে হচ্ছে এরা আমাকে আর সুধীরকে সন্দেহ করছে।"

"সুধীর কে ম্যাডাম?"

উনি সুধীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শ্রীবাস্তব, ওকে আমি সুধীর বলে ডাকি।"

"এটা কেন ভাবছেন ম্যাডাম?"

"যে-ভাবে আমাদের প্রশ্ন করছে, তাতে তো সে-রকমই মনে হচ্ছে। ওঁর অফিস এখানে থাকলেও অফিসের কাউকেই তেমন ভাবে আমি চিনি না। আপনার ওপর ওঁর অনেক আস্থা ছিল। আমার তরফ থেকে আপনি এই তদন্তের ভার নিন। প্লিজ।"

একেনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন। "বেশ, ম্যাডাম, নিচ্ছি। কিন্তু আপনাকে

কিছু প্রশ্ন আমার করতে হবে। এখন তো করা যাবে না। এখানে পুলিশদের কাজ শেষ হোক, তারপর কথা বলব।”

সুকন্যার শুকনো মুখ দেখে একেনবাবু আশ্বস্ত করলেন, “আপনি ভয় পাবেন না ম্যাডাম। এরা দোষীদেরই ধরবে, নির্দোষীকে নয়।”

একেনবাবুর কথায় মনে হল সুকন্যা একটু স্বস্তি পেয়েছেন।

“এখন আমরা আসছি ম্যাডাম। মিস্টার শ্রীবাস্তবের নম্বর আমার কাছে আছে, আমিই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।”

সকালবেলায় আজ ভালো করে ব্রেকফাস্টও খাওয়া হয়নি। সুকন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লবিতে নেমে একেনবাবুকে বললাম, “কি মশাই, হোটেলের কফিশপ-এ একটু কিছু খেয়ে নিলে হত না?”

“খেপেছেন স্যার, এই হোটেলে খাওয়া মানে তো টাকার শ্রাদ্ধ! তার চেয়ে চলুন বাইরে ছোটোখাটো কোনো জায়গায় যাই। একটা ডানকিন ডোনাটের দোকান দেখলাম স্যার। সস্তায় ভালো ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায় ওখানে।”

“ভালো কতটা হবে জানি না। কিন্তু আপনি যখন বলছেন সস্তা, সেটা মানতে আমি রাজি।”

আমরা যখন বেরোচ্ছি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টও আমাদের সঙ্গ নিলেন।

“আপনি স্যার ওঁদের সঙ্গে থেকে গেলেন না যে!”

“আরে না, এটা তো হল ল্যারির সমস্যা, মার্ডারটা ওর এরিয়াতে ঘটেছে। আর এফবিআই তো আছে সাহায্য করতে। ওদের এখনও ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। মার্ডার ভিক্টিমের স্ত্রীকে আরেকটা স্যুইট-এ সরিয়ে দেবে, ঘরটা সিল করবে, দুয়েকটা স্টাফকে প্রশ্ন-টশ্ন করবে। আমি ভাবলাম অফিসে ফেরার আগে তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করে যাই।” তারপর মুচকি হেসে বললেন, “তুমি তো মনে হচ্ছে বিজনেসম্যানের ইয়ং উইডোর হয়ে খুনির খোঁজ করবে!”

“আসলে স্যার, ম্যাডাম ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন ওঁকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে ভেবে।”

“তা ঠিক। কিন্তু সাসপেক্ট করাটা কি খুব ভুল? তোমাদের এই বিজনেসম্যান একজন মধ্যবয়স্ক লোক। স্ত্রী কমবয়সি যুবতী, যার সঙ্গে বিজনেসম্যানের ইয়ং অ্যাসোসিয়েটের সম্পর্কটা মনে হয় বেশ ঘনিষ্ঠ। বিজনেসম্যান না থাকলে দু-জনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-ডিনার করে। হাবেভাবে ওদের অন্তরঙ্গতা খুব স্পষ্ট, হোটেলের অনেকেই সেটা কনফার্ম করেছে।”

“ওঁরা কি স্যার নিজেদের বন্ধু-সম্পর্কটা অস্বীকার করছেন?”

“তা নয়, কিন্তু একে অন্যের বিষয়ে উত্তর দিতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করছে না। বোঝাই যাচ্ছে ওদের এই রাঁদেভ্যুগুলো বিজনেসম্যানের অজান্তে হয়েছে।”

“ইন্টারেস্টিং স্যার, ভেরি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু স্যার খুনটা হয়েছে কী ভাবে? আপনি তো বললেন স্ট্যাব্ড-টু-ডেথ।”

“ঠিক, বিজনেসম্যান যখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন, তখন কেউ সামনে এসে বুকে ছুরি মেরেছে।”

“মাই গড ঘরে ঢুকল কী করে? ছুরিটা পাওয়া গেছে?”

“না, আততায়ী কোনো চিহ্ন রেখে যেতে চায়নি, ওটা নিয়েই অদৃশ্য হয়েছে।”

“ম্যাডাম তখন কোথায় ছিলেন?”

"ওঁর বক্তব্য সকালে স্নান শেষ করে নীচে কফিশপে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন স্বামীর দেহ চেয়ারে হেলানো অবস্থায়। বুকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হি ওয়াজ ডেড। দেখেই উনি চিৎকার করতে শুরু করেন। একজন পোর্টার করিডর দিয়ে যাচ্ছিল। সে এসে ব্যাপারটা দেখে রিসেপশনে ফোন করে। সেখান থেকেই কেউ পুলিশে খবর দেয়।"

"ক'টা নাগাদ ঘটেছিল ব্যাপারটা?"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। এই ডানকিন ডোনাট-এ গিয়ে তো এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না! তুমি বরং আমার অফিসে চলো, তোমার সঙ্গে একটা ডিল করি।"

"ডিল?"

"আগে চলো তো আমার অফিসে। ডোনাট আর কফি না হয় আমার অফিসেই খাবে।"

মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের অফিসে পৌঁছোলাম। সবার জন্য কফি আর ডোনাট-এর অর্ডার দিয়ে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বললেন, "হ্যাঁ যে ডিল-এর কথা বলছিলাম... তোমাকে আমি এই মার্ডারের ব্যাপারে যা জানি সব জানাব, যাতে তুমি তোমার ক্লায়েন্ট, মানে ওই উইডো লেডিকে সাহায্য করতে পারো। তার বদলে তুমি আমাকে সাহায্য করবে আইডিয়াল জুয়েলরির জুয়োচক্র-জট খোলার ব্যাপারে। আমি এ ব্যাপারে বিশেষ এগোতে পারছি না, এদিকে চাপ আসছে উপর থেকে। ডিল?"

"হ্যাঁ স্যার, ডিল। আমার ক্ষমতায় যা কুলোয় সবটুকু করব।"

"গুড, তাহলে এই মার্ডারের ব্যাপারে যতটুকু উদ্ধার হয়েছে বলি..." ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট শুরু করলেন, "যেটা তোমাকে আগেই বলেছি, বিজনেসম্যানের স্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে খুন হবার সময়ে তিনি ঘরে ছিলেন না, স্নান করে নীচে কফি শপ-এ খেতে গিয়েছিলেন। এটা ঠিক, সকালে উনি মৃতের বিজনেস অ্যাসোসিয়েট শ্রীবাস্তবের সঙ্গে কফিশপ-এ ব্রেকফাস্ট করেছিলেন। এটাও সম্ভবত ঠিক, উনি স্নান করেই কফি শপে গিয়েছিলেন, কারণ শাওয়ার স্টল ভিজে, কার্টেন ভিজে, এবং র‍্যাকে রাখা তোয়ালে ভিজে। অর্থাৎ সেটা ব্যবহার করা হয়েছিল সকালে। কিন্তু এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে না, খুনের সময়ে উনি ঘরে ছিলেন না। রুম-সার্ভিসের অর্ডার দিয়েছিলেন বিজনেসম্যান নিজে। গত আট-দশদিন ধরে বিজনেসম্যানই ব্রেকফাস্টের জন্য রুম-সার্ভিস নিচ্ছেন, সুতরাং সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাধারণত অর্ডার করেন ফ্রায়েড এগ, টোস্ট, সসেজ আর হ্যাশ ব্রাউন। এদিনও সেটাই করেছিলেন। সঙ্গে টমাটো জুস আর কফি। রুম সার্ভিসের যে স্টাফ খাবার দিয়ে গেছে, সেও ঘরে আর কাউকে বা অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি। বিজনেসম্যান অন্যান্য দিনের মতো একাই বসার ঘরে ছিলেন। খাবারের ট্রে টেবিলে রেখে যখন ও চলে আসছে, বিজনেসম্যান দরজাটাকে 'আন-লকড' রেখে যেতে বলেন! রুম সার্ভিসের ছেলেটির মনে হয়েছিল কারোর জন্য উনি অপেক্ষা করছেন... দরজা খোলার জন্য খাওয়া ছেড়ে যাতে ওঁকে উঠতে না হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ডোর-ল্যাচটা ও খুলে রেখেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, কার জন্য বিজনেসম্যান অপেক্ষা করছিলেন? লোকটি কি তোমার ক্লায়েন্ট, মানে ওই ইয়ং উইডোর ফিঁয়াসে না অন্য কেউ!"

কথাটা শুনে আমার একটু অবাক লাগল। জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়ং উইডোর জন্যেও তো হতে পারত?"

"মনে হয় না। প্রতি সকালেই বিজনেসম্যানের স্ত্রী নীচে খেতে যান, এই রিকোয়েস্ট রুম-সার্ভিস স্টাফকে আগে কখনো করেননি।"

এমন সময়ে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের টেবিলের একটা ফোন বেজে উঠল।

"আমাকে এখুনি ছুটতে হবে। পুলিশ চিফ এমার্জেন্সি মিটিং ডেকেছেন।"

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাবার পর কফি আর ডোনাট এল। সেগুলো সদ্ব্যবহার করলাম। আজ আমার কোনো ক্লাস ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল রিসার্চ প্রজেক্টের একটা কাজ। ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগার কথা নয়। একেনবাবুকে সেটা বলতেই উনি বললেন, "ঠিক আছে স্যার, আমিও সেই ভাবেই আপনার অফিসে আসব। আপনার কাজ শেষ হলে একসঙ্গে হোটেলে গিয়ে সুকন্যা ম্যাডামের সঙ্গে আরেকটু কথা বলব।"

আমি 'না' আর করলাম না। মনে হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং কেসে জড়িয়ে পড়ছি। প্রমথটা সব অ্যাকশন মিস করছে। পরে গল্প শুনে আফশোস করবে।

আমার কাজ শেষ হতে না হতেই দেখি একেনবাবু অফিসে এসে হাজির। এসে বললেন, "চলুন স্যার, সুকন্যা ম্যাডাম ঘরেই আছেন। ওঁর নতুন ঘরের নম্বরটা দিয়েছেন।"

।। ৭।।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছোলাম সুকন্যা তখন একজন বয়স্কা মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। দূর-সম্পর্কের মাসি, নিউ ইয়র্কে ছেলের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছেন। একেনবাবু ঠিক করলেন ওঁদের ডিস্টার্ব না করে শ্রীবাস্তবের সঙ্গে একটু কথা বলবেন।

শ্রীবাস্তব নিজের ঘরে ছিলেন না। হোটেলের বিজনেস সেন্টারে বসে কতগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন। খোঁজখবর করে সেখানে গিয়ে পৌঁছোতে আমাদের দেখে অবাক হয়ে একটা শুকনো হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

"ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, কিন্তু ঘরে বোধহয় ওঁর মাসি বসে আছেন, তাই ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি।"

"নিশ্চয়।"

"আচ্ছা, ব্রজদুলালবাবুকে কিছুদিন আগে কেউ ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছিল, সে ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন?"

"আমার ধারণা অনেকটাই জানি। উনি পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে একটা কাফলিংক কিনেছিলেন আইডিয়াল জুয়েলরি থেকে। স্যার ছিলেন একজন সিরিয়াস কাফলিংক কালেক্টর। একদিন এক বিজনেস মিটিং-এ কাফলিংকের কথা উঠতে একজন দোকানটার কথা বলেন। সেটা শুনে জায়গাটা আমি দেখে এসেছিলাম। ছোটো দোকান, কিন্তু কাফলিংকের বেশ ভালো কালেকশন। পরে স্যারকে নিয়ে আমি একদিন ওখানে গিয়েছিলাম। এরমধ্যে স্যার নিজেই একদিন যান। ফিরে এসে আমাকে বলেন আইডিয়াল জুয়েলরির নামে একটা পঁচিশ হাজার ডলারের ব্যাঙ্ক চেক কাটতে। চেকটা আমাদের কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকেই কাটতে হয়, কারণ এদেশে স্যারের নিজের অ্যাকাউন্ট নেই। তবে টাকাটা নেওয়া হয় স্যারের ডিসক্রিশানারি ফান্ড থেকে। এই কাফলিংক নিয়ে

পরে একটা সমস্যা হয়। যে মেয়েটি কাফলিংক বিক্রি করেছিল, স্যার-এর সঙ্গে তোলা তার কয়েকটা ঘনিষ্ঠ ছবি দেখিয়ে একজন কাফলিংকটা ফেরত চায়। ফেরত না পেলে ছবিগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। স্যার ভীষণ ভয় পেয়ে যান। কী করা যায়, এই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনাও হয়। আমি বলেছিলাম কাফলিংক ফেরত না দিতে, স্যার রাজি হন না। শেষে দু-জনে মিলে ব্ল্যাকমেলারের কথা মেনে পোর্ট অথরিটির টার্মিনালে তার জানানো নির্দিষ্ট জায়গায় ওটা দিয়ে আসি।"

"দাঁড়ান স্যার, ছবিগুলো কী ভাবে দেখিয়েছিল?"

"ছবিগুলো এসেছিল একটা খামে।"

"কোন ঠিকানায়? হোটেলের?

"না, স্যারের নামে আমাদের এখানকার অফিসের ঠিকানায় কেউ এসে দিয়ে গিয়েছিল।"

"ইন্টারেস্টিং। একটা কথা স্যার, যে ছবিগুলো ওরা দেখিয়েছিল, সেগুলো কি আপনার কাছে আছে?"

শ্রীবাস্তব কী জানি ভাবল, তারপর বলল, "স্যার জীবিত নেই, তাই এগুলো দেখাতে বোধহয় এখন আর কোনো বাধা নেই।"

পাশে রাখা ফাইল ফোল্ডার থেকে তিনটে ছবি এগিয়ে দিল।

প্রথম ছবিতে ব্রজদুলালবাবু একটি সুন্দরী মেয়েকে কিছু দিচ্ছেন,... মনে হচ্ছে টাকা। দ্বিতীয় ছবিটা একটু ঝাপসা। মেয়েটি উলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে। বিছানার একদিকে একটা আলো, অন্যপাশে একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুল। ব্রজদুলালবাবুর পিছনটা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মেয়েটির বুকে চুমু খাচ্ছেন। তৃতীয় ছবিটা আরও ঝাপসা... মেয়েটিকে জড়িয়ে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় যিনি শুয়ে আছেন, তাঁকে দেখতে অনেকটা ব্রজদুলালবাবুর মতোই।

"দুটো ছবি কিন্তু খুব ঝাপসা... এগুলো তো বানানোও হতে পারে স্যার।"

"আমারও তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু স্যার ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। উনি ইদানীং ডিমেনশিয়ায় ভুগছেন। প্রায়ই ভুলে যান একটু আগে কী করেছেন... মাঝেমাঝেই একটা কনফিউশন আর ডিজওরিয়েন্টেশনের মধ্যে থাকেন। স্যারের মনে হয়েছিল কোনো একটা ঘরে ঢুকে হয়তো এগুলো করেছিলেন!"

"আপনার কী মনে হয় স্যার?"

"আমার বিশ্বাস এগুলো কারসাজি করে বানানো। স্যারকে নিয়ে নানান গসিপ হয়, কিন্তু আমি যতদিন ওঁকে চিনি, অনৈতিক কিছু করতে দেখিনি। বিশেষ করে এই সময়ে, যখন জীবনের বেশিদিন বাকি নেই।"

"তার মানে? এটা ঠিক বুঝলাম না।"

"স্যার ক্যানসারে ভুগছিলেন, সেটা ব্রেইন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বড়োজোর আর মাস ছয়েক বাঁচতেন, হয়তো বা আরেকটু বেশি। বেশিদিন উনি থাকবেন না আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। কিন্তু এইভাবে হঠাৎ শেষ হয়ে যাবেন ভাবিনি।" শেষ কথাটা বলতে বলতে শ্রীবাস্তবের গলা ধরে এল।

"এগুলো কি আপনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন?"

"না। পুলিশ শুধু প্রশ্ন করেছে আর তার উত্তর চেয়েছে। ওঁদের ফোকাস ছিল আমার আর সুকন্যার ওপরে, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে।"

"কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মানে?"

"আপনি সুকন্যার স্বার্থ দেখছেন, সেক্ষেত্রে আমি কিছু লুকোব না। আমি সুকন্যাকে ভালোবাসি সুকন্যার সঙ্গে স্যারের বিয়ে হওয়ার আগের থেকেই। নানান কারণে আমাদের বিয়েটা হয়নি। স্যার যখন সুকন্যাকে বিয়ে করেন, তার আগেই ওঁর ক্যানসার ধরা পড়ে। আমরা জানতাম একদিন দু-জনেই দু-জনকে পাব, শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সুকন্যাকে ভুল বুঝবেন না, স্যারকে ও বঞ্চনা করেনি। আমার সঙ্গে কোনো শারীরিক সম্পর্কে জড়ায়নি, বিশ্বাস করুন। স্যারও আমাদের ভালোবাসার কথা জানতেন। আমাকেও স্নেহ করতেন।... আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?"

"কী যে বলেন স্যার, তবে এটা মানতে অনেকেরই অসুবিধা হবে।"

"সেটাই। পুলিশের ধারণা এই খুনের সঙ্গে সুকন্যা আর আমি যুক্ত!"

"আসলে কি জানেন স্যার, ব্রজদুলালবাবুর মৃত্যুতে আর্থিক ভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনা তো আপনার আছে, মানে ম্যাডামের অ্যাঙ্গেল থেকে।"

"আমরা সেটা জানি। কিন্তু সেই সন্দেহ দূর করব কী করে সেটাই জানি না!"

"ট্রু স্যার, ভেরি ট্রু। কিন্তু সন্দেহই তো যথেষ্ট নয়।" মাথা চুলকোলেন একেনবাবু।

"তার মানে?"

"শুনুন স্যার, মোটিভের সঙ্গে মিনস এবং অপরচুনিটিও দরকার। আপনি যে মৃত্যুর সময় ওঁর ঘরে ছিলেন সেটা প্রমাণ করতে হবে, ব্রজদুলালবাবুকে যে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে, সেটা খুঁজে বার করতে হবে। অন্য কাউকে দিয়ে খুন করানো হলে টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপারটা বার করতে হবে, তাই না? সেটা কি পুলিশ পারবে স্যার?"

শ্রীবাস্তব চুপ করে রইলেন। একেনবাবু ওঁর টিমে না বিপক্ষ দলে শ্রীবাস্তব বোধহয় সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন।

"একটা কথা স্যার, সুকন্যা ম্যাডাম এই ছবিগুলোর কথা জানেন?"

উত্তরটা দিতে শ্রীবাস্তব একটু অস্বস্তি বোধ করল। "হ্যাঁ, ছবিগুলো হঠাৎ করেই ওর নজরে এসেছিল।"

"কী ভাবে স্যার?"

"আমার এই ফাইল ফোল্ডারে মেসি-জ থেকে কেনা কাটলারি সেট-এর একটা রিসিট ছিল। সেটটা কিনে আনার পর ওর পছন্দ হয়নি। ফেরত দেবার জন্য যখন দোকানের রিসিট খুঁজছিল, আমিই বলেছিলাম স্যারের পার্সোনাল ফোল্ডারে ওটা রয়েছে। আমার খেয়াল ছিল না, ছবিগুলোও ওখানেই রাখা আছে।"

"দেখে কি রিয়্যাকশন হল স্যার?"

"ভীষণ রেগে গিয়েছিল! এত রাগতে আগে ওকে দেখিনি। স্যার আন-ফেইথফুল, এটা ও মানতে পারছিল না। আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম ছবিগুলো জাল। স্যার যে আইডিয়াল জুয়েলরিতে কাফলিংক কিনতে গিয়েছিলেন, মেয়েটা সেখানকারই সেলসগার্ল। নিশ্চয় ওখানেই দু-জনের ছবি তুলে এগুলো কেউ ফটোশপ করেছে। ভাবছে ব্ল্যাকমেল করে কিছু টাকা পাবে।"

"উনি কি সেটা মেনে নিয়েছিলেন?"

"প্রথমে মানতে চায়নি, পরে শান্ত হয়েছিল।"

"কাফলিংকটা যে আপনারা ফেরত দিয়েছিলেন, সেটা ম্যাডাম জানেন?"

"না।"

"কেন স্যার?"

"ওরা যে কাফলিংকের জন্য ব্ল্যাকমেল করছে ও জানত না। ও খুবই বুদ্ধিমতি,

কাফলিংক ফেরত দেওয়া হয়েছে শুনলে দুয়ে-দুয়ে এক করে বুঝে যেত ছবিগুলো বানানো নয়!”

“এবার বুঝলাম, স্যার। পুলিশকে এগুলো দেখিয়েছেন?”

“না।”

“কেন নয় স্যার? কেউ যে ব্রজদুলালবাবুকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছিল, সেটা তো পুলিশের কাছে একটা দরকারি তথ্য।”

“আসলে ছবিগুলোর বিষয়টা প্রকাশ্যে আনতে চাইনি। পুলিশকে জানালে ওরা হয়তো স্যারকে হত্যা করার আরও একটা মোটিভ খুঁজে পেত... স্বামী অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে কিছু করছে... হত্যা করার সেটাও তো একটা মোটিভ হতে পারে।”

“ভালো কথা স্যার, বিয়ের আগে সুকন্যা ম্যাডাম কী করতেন?”

“মাসাজ থেরাপি করত। এক বছর ডাক্তারিও পড়েছিল, বাবা মারা যাওয়ায় টাকাকড়ির অভাবে আর পড়তে পারেনি।”

“ব্রজদুলালবাবু তো সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন, ম্যাডাম কি তখন হোটেলেই থাকতেন?”

“না, না, ওর জন্য একটা লিমো ঠিক করা ছিল। ইচ্ছেমতো বেড়াত, বাজার-টাজার করত। মিটিং না থাকলে আমিও গেছি ওর সঙ্গে। রাত্রে আমরা সবাই ঘুরেছি একসঙ্গে। স্যারের চিন্তা ছিল যাতে ও একা একা বোর্ড না হয়।”

একেনবাবু এটা নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, “কেউ কি ব্রজদুলালবাবুর খোঁজ করেছিল গত দু-একদিনের মধ্যে?”

“গতকাল অফিসে একজন ফোন করেছিল। স্যার ব্যস্ত ছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী দরকার?’ লোকটা বলল, তোমার বসের একটা কাফলিংক ফেরত দেবার কথা ছিল, কিন্তু দেননি। লোকটার গলার স্বর আর বলার ভঙ্গিতে আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোন কাফলিংক?’ লোকটা বলল, ‘তোমার বস সেটা ভালো করে জানেন।’ আমি বললাম, ‘সেটা ফেরত দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে দিয়ে এসেছি।’ লোকটা বলল, ‘লায়ার!’ আমিও ফোনটা কেটে দিলাম।

“এগুলো তো সব আপনার পুলিশকে জানানো উচিত ছিল। আপনি তো চান পুলিশ আসল খুনিকে ধরুক। চান না?”

শ্রীবাস্তব কাঁচুমাচু মুখ করে বসে রইল।

এমন সময়ে শ্রীবাস্তবের মোবাইলে কেউ ফোন করল। “হ্যালো,” বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, ওঁরা আমার সঙ্গে কথা বলছেন। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

ফোনটা বন্ধ করে বললেন, “সুকন্যা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, আমরা এখনই যাচ্ছি।” বলে একেনবাবু উঠে পড়লেন।

হলওয়ে দিয়ে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী বুঝছেন মশাই?”

“ভাবছি স্যার।”

“কী ভাবছেন?”

“প্রেম আর জেলাসি অতি বিষম বস্তু, স্যার। অথবা শ্রীবাস্তব অতি ঘোড়েল একটি লোক... আমাদের ঘোল খাওয়াবার চেষ্টা করছেন।”

আমরা যখন দরজায় নক করলাম, সুকন্যা একাই ঘরে ছিলেন।

একেনবাবু বললেন, "সরি ম্যাডাম। আপনাকে আরেকটু বিরক্ত করব। এর মধ্যেই আমরা শ্রীবাস্তব স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি, খুব হেল্পফুল ম্যাডাম। আপনি তো ওঁকে ভালো করে চেনেন?"

কথাটা শুনে সুকন্যার ভুরু একটু যেন কোঁচকাল। "হ্যাঁ, সুধীর আমার ভালো বন্ধু।"

"শ্রীবাস্তব স্যার বললেন আপনার স্বামী একটা দামি কাফলিংক কিনেছিলেন কয়েকদিন আগে। আপনি কি সেটা জানতেন ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ, আমি জেনেছিলাম, কারণ তার জন্য ২৫ হাজার ডলারের একটা ব্যাঙ্ক চেক কাটতে হয়েছিল। এই নিয়ে সুধীরের সঙ্গে যখন ওঁর কথা হচ্ছিল আমি ঘরে ছিলাম।"

"একটা কাফলিংকের জন্য অতগুলো টাকা! আমি ম্যাডাম কল্পনা করতে পারি না।"

"এর থেকেও দামি কাফলিংক উনি কিনেছেন। কাফলিংক জমানো ছিল ওঁর নেশা। একজন কাউন্টের কাফলিংক উনি ১০০ হাজার ডলার দিয়ে কিনেছিলেন।"

"সেই কাফলিংকটা এখন কোথায় ম্যাডাম?"

"কলকাতায়।"

"আমি বলছি, এই নতুন কেনা কাফলিংকের কথা।"

"ঠিক জানি না। সুধীরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল ও-ও জানে না।"

"অত দামি একটা কাফলিংক উনি কোথায় রাখতে পারেন?"

"অনেক সময় দামি এবং দরকারি জিনিস উনি কোম্পানির সেফ-এ রাখেন। সুধীরই কাজটা করে। সেই জন্যেই আমার অবাক লাগল সুধীর জানে না।"

"একটা কথা ম্যাডাম, আপনি কি সুধীরবাবুর ফোল্ডারে কয়েকটা ছবি দেখেছিলেন... মানে আপনার স্বামী আর একটি মেয়ের?"

সুকন্যা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। "আজেবাজে বানানো ছবি! আমার স্বামীর বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়ানো আগেও হয়েছে... নতুন কিছু নয়।"

"কবে দেখেছিলেন মনে আছে ম্যাডাম?"

"দিন দুই আগে।"

"তারপরে আপনি হোটেলের বাইরে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, একটা কাটলারি সেট ফেরত দিতে গিয়েছিলাম।"

"একা?"

"না, ওঁর অফিসের একটি মেয়ের সঙ্গে।"

"আর কোথাও যাননি?"

"না।"

"মিস্টার শ্রীবাস্তব, মানে সুধীরবাবুকে আপনার স্বামী কতদিন চিনতেন ম্যাডাম?"

"বছর দুয়েক।"

"যদ্দুর জানি ম্যাডাম, আপনার সঙ্গেও তো স্যারের পরিচয় বছর দুয়েক। তাই না?"

"না, আমি তার আগে থেকে চিনতাম। ওঁর সঙ্গে সুধীরের পরিচয় হয় আমাদের বিয়ের পর।"

"অল্পদিনের পরিচয় হলেও সুধীরবাবুর ওপর আপনার স্বামীর খুব আস্থা ছিল মনে হয়। তাই না, ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ।"

"সুধীরবাবুও আপনার স্বামীকে খুব পছন্দ করতেন।"

"করত।"

"এই প্রশ্নটার জন্য কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে সুধীরবাবুর সম্পর্কটা ঠিক কিরকম ছিল?"

সুকন্যা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, মুখটা থমথমে। তারপর খুব আস্তে আস্তে কিন্তু খুব সুস্পষ্ট ভাবে বললেন, "আমরা দু-জনে দু-জনকে ভালোবাসি। ভুল বুঝবেন না, আমার স্বামীকে আমি ঠাকাইনি। তিনিও এই সম্পর্কের কথা জানতেন। আমি যখন ওঁর জীবনে আসি, তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। শরীরের নানান ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। ওঁকে সেবা করতে এসেই ওঁর জীবনে জড়িয়ে পড়ি। আমি জানতাম ওঁর আয়ু বছর দুই-আড়াইয়ের বেশি নয়। যদিও উনি মানতেন না... মনের জোরে চলতেন... আপনি আমাকে কী ভাবছেন জানি না, কিন্তু...।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন নয়। এবার বলুন তো, আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?"

"না, আমি পুলিশকেও সেটা জানিয়েছি। সে-রকম কাউকে আমি মনে করতে পারি না।।"

"আপনার স্বামী যখন খুন হন আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

"আমি নীচে কফিশপে ছিলাম। ওখানেই আমি আর সুধীর ব্রেকফাস্ট করি। আমার স্বামী একা ব্রেকফাস্ট খেতে পছন্দ করতেন, তারপর দেশের অফিসে অনেকের সঙ্গে কথা বলতেন।"

"আই সি। আচ্ছা, আপনার স্বামী কি কাউকে এক্সপেক্ট করছিলেন সকালে?"

"আমাকে কিছু বলেননি। অন্যান্য দিন সুধীর সকালে আসে। ওঁর সঙ্গে কাজের দুয়েকটা কথা হয়। ও ব্রেকফাস্ট অর্ডার করে, আমি আর সুধীর নীচে কফিশপ-এ খেতে যাই। কিন্তু আজ সকালে সুধীর ফোন করে বলল, ওর আসতে একটু দেরি হবে। আমি যেন সোজা কফিশপ-এ চলে আসি, ও সেখানে মিট করবে। আমার স্বামী যখন ব্রেকফাস্ট অর্ডার করছেন তখনই আমি বেরিয়ে যাই। তারপর কে এসেছে কোনো ধারণাই নেই।"

"আর একটা প্রশ্ন ম্যাডাম... আপনি যখন কফিশপে-এ গিয়ে পৌঁছোলেন, তার কতক্ষণ বাদে মিস্টার শ্রীবাস্তব সেখানে আসেন?"

"বেশিক্ষণ নয়, মিনিট কয়েকের মধ্যেই।"

"মিনিট কয়েক মানে কি দু-মিনিট, পাঁচ মিনিট, না তার বেশি?"

"মিনিট দুয়েকই হবে, তার বেশি নয়।"

"ম্যাডাম, আপনি পান খেতে ভালোবাসেন?" হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে সুকন্যা অবাক হয়ে তাকালেন।

সামনে কাচের কফি টেবিলে একটা প্লেটে গোটা দুই সাজা পান লবঙ্গ দিয়ে আটকানো।

একেনবাবু পানগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার ফ্যামিলিও খুব ভালোবাসেন। মানে আমার বেটার হাফ, ম্যাডাম। তবে এখানকার পানে দেশের স্বাদ নেই।"

"হ্যাঁ, একটু অন্যরকম ঠিকই।"

"তবে নেই-মামার থেকে কানা-মামা ভালো। এই রকম ফাইভ স্টার হোটেলে যে পান পাচ্ছেন, সেটাই তো দারুণ ব্যাপার!"

"হ্যাঁ, লাকিলি আমিনার সঙ্গে পরিচয় হল, ও প্রতিদিন আমার জন্য পান নিয়ে আসে লেক্সিংটন স্ট্রিটের একটা দোকান থেকে।"

"আমিনা!"

"বাংলাদেশের মেয়ে, এখানে হাউস কিপিংয়ের কাজ করে।"

একেনবাবু জুলু জুলু চোখে পানের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে সুকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, "খাবেন একটা পান?"

"আরে না ম্যাডাম। মাত্র দুটো তো আছে!"

"তাতে কী হয়েছে! আমিনাকে বললেই আরও কয়েকটা নিয়ে আসবে।"

আর বলতে হল না। একেনবাবু একটা মুখে পুরে চোখ বুজে চিবোতে চিবোতে বললেন, "বাঃ, দারুণ টেস্ট ম্যাডাম!"

"আপনিও একটা নিন না!" সুকন্যা আমাকে বললেন।

"থ্যাঙ্কস, আমি পান খাই না।"

হোটেল থেকে ফেরার পথে একেনবাবু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে ফোন করলেন।

"স্যার, আপনি আপনার লোকদের একটু খোঁজ করে দেখতে বলবেন, পোর্ট অথরিটির 'লস্ট এন্ড ফাউন্ড' ডিপার্টমেন্ট-এ কোনো সাফায়ার ডায়মন্ড-এর কাফলিংক জমা পড়েছে কিনা। জমা পড়লে আমাকে জানাবেন।"

"আপনার মাথায় কী ঘুরছে বলুন তো?" আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আসলে আমি একটু কনফিউসড স্যার। কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে... কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি না!"

"আমি কিন্তু বুঝতে পারছি ছবিগুলোর মধ্যে দুটো ছবি ফেক।"

"কী করে বুঝলেন স্যার?"

"ব্রজদুলালবাবু ফুলের আশেপাশে এলেই অ্যালার্জিতে কাবু হন। আর বিছানা পাশে ফুলদানিতে অতগুলো ফুল, কিন্তু তাও মেয়েটির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি চালাচ্ছেন!"

"মন্দ বলেন নি স্যার। তবে কিনা আমরা জানি না, ফুলগুলো সত্যি ফুল না প্লাস্টিকের।"

এটা আমি ভাবিনি, তাই চুপ করে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "পোর্ট অথরিটিতে কাফলিংকের খোঁজ করছিলেন কেন?"

"কয়েকটা পসিবিলিটি আছে। একটা হল, কাফলিংকটা শ্রীবাস্তববাবু ভুল জায়গায় ফেলেছিলেন আর ক্লিনার সেটা লস্ট আর ফাউন্ড-এ জমা দেয়। সম্ভাবনাটা ক্ষীণ, কিন্তু অনেস্টম্যান তো এদেশে আছে স্যার। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, শ্রীবাস্তববাবু কাফলিংকটা নিজেই আত্মসাৎ করেছেন। তার বদলে হাবিজাবি কিছু বালতিতে ফেলেছেন, ব্রজদুলালবাবু দূর থেকে তা দেখেননি। সেক্ষেত্রে কেউ ফোন করে বলতেই পারে যে কাফলিংক তারা পায়নি।"

"কিন্তু শ্রীবাস্তব গল্পটা আমাদের করতে যাবে কেন?"

"সেটাই ভাবছি স্যার। হয়তো পুলিশই ঠিক পথে এগোচ্ছে স্যার, খুনটা করেছেন মিস্টার সুধীর শ্রীবাস্তব।

"কিংবা সুকন্যা।"

"সবই সম্ভব স্যার। সুকন্যা ম্যাডাম তো স্যার সুধীরবাবুর প্রেমে হাবুডুবু। তাঁকে তাড়াতাড়ি আপন করে পাবার ইচ্ছে, সেই সঙ্গে যোগ করুন আনফেইথফুল বুড়ো স্বামীর

আচরণ। খুব যে রেগে গিয়েছিলেন, সে তো সুধীরবাবুই জানালেন। ম্যাডাম ডাক্তারি পড়তেন, ছুরির ব্যবহার নিশ্চয় জানতেন।”

“কল্পনাই যখন করছেন, তাহলে ফারাকেই বা বাদ দিচ্ছেন কেন। তাকেও তো সুকন্যা খুন করতে পারে।”

“অপরচুনিটিটা নেই স্যার, অন্তত আমাদের যা বলেছেন, সেটা সত্যি ধরলে।”

“সত্যি যে বলেছে, তার প্রমাণ কী?”

“ঠিক স্যার, ভেরি কনফিউসিং। ”

একেনবাবুর অন্য কী একটা কাজ ছিল, উনি বাড়িতে ঢুকলেন না। বাড়ি ফিরে দেখি প্রমথ মহোদ্যমে রান্না করছে। আমাকে দেখা মাত্র হুকুমে হুকুমে প্রাণান্ত করল। তার ফাঁকে ফাঁকেই সারাদিন কী কী হয়েছে শুনল। ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট-এর জন্য এগুলো সব মিস করছে... তারজন্য বিশ্বসুদ্ধু সবার বাপান্ত করল। টিপিক্যাল প্রমথ!

।। ৯।।

পরদিন সকাল সকাল দুটো ক্লাস ছিল। ক্লাস শেষ করে যখন অফিসে ফিরলাম, একেনবাবু আমার ঘরে।

“কী ব্যাপার, কাল কোথায় ছিলেন গভীর রাত পর্যন্ত?”

উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন “আপনার কি আর ক্লাস আছে স্যার?”

“না, কেন?”

“তা হলে চলুন।”

“কোথায়?”

“সুকন্যা ম্যাডামের কাছে।”

“ব্যাপারটা কী?”

“হোটেলের লন্ড্রি রুমে তোয়ালে জড়ানো রক্তমাখা ছুরি পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা ওটা দিয়েই ব্রজদুলালবাবুকে খুন করা হয়েছে। কাজ শেষ করে ছুরিটা তোয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে লন্ড্রিশুট দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মিস্টার শ্রীবাস্তবকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মিনিট পাঁচেকের জন্য মিস্টার শ্রীবাস্তবের কোনো অ্যালিবাই নেই। আর নেই খুব ক্রিটিক্যাল সময়ে, সুকন্যা ম্যাডামের সঙ্গে খেতে আসার আগে! ম্যাডাম সুকন্যা ভীষণ বিচলিত... আমাদের ডেকেছেন।”

“‘আমাদের’ মানে তো আপনাকে, বহুবচন লাগাচ্ছেন কেন! কিন্তু দোষী ধরা পড়লে আপনি আর কী করবেন?”

“রাইট স্যার। ও আরও একটা ব্যাপার, পোর্ট অথরিটির লস্ট এন্ড ফাউন্ড অফিসে কোনো কাফলিংক পাওয়া যায়নি।”

“আপনি কি ভেবেছিলেন কিছু পাওয়া যাবে?”

“না স্যার, পাওয়া গেলে অবাকই হতাম, তখন একটু অন্যভাবে চিন্তা করতে হত।”

একেনবাবু ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন বুঝলাম না। কিন্তু এ নিয়ে আর প্রশ্ন করলাম না।

হোটেলে সুকন্যার ঘরে পৌঁছোনোর আগেই দেখলাম একটি ভারতীয় চেহারার মেয়ে

ট্রলিতে অজস্র তোয়ালে, চাদর, ইত্যাদি নিয়ে হলওয়েতে হাঁটছে... বোঝাই যাচ্ছে হোটেলের হাউস-কিপিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করে।

"একটু চান্স নিই, স্যার," বলে একেনবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "আমিনা?"

একেনবাবুর ডাক শুনে মেয়েটি চমকে ফিরে তাকাল।

"আপনি আমিনা?" একেনবাবু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

কেমন জানি ভীত মুখে বলল, "হ্যাঁ, আমারে খোঁজেন?"

"আপনাকেই খুঁজছি, ম্যাডাম।"

"নো ম্যাডাম, আই হাউসকিপার।"

"বাংলায় বলুন, আমরা বাঙালি।"

বাংলা শুনে মনে হল আমিনা একটু স্বস্তি পেল। "আমি এখানে কাজ করি স্যার।"

(আমিনার বাংলাদেশি উচ্চারণ আমি লিখতে পারব না, আমি আমার মতো করে কথাগুলো লিখছি।)

"সেটা আমি জানি। আপনার কথা সুকন্যা ম্যাডাম বলেছেন। আপনি তো ওঁর জন্য পান কিনে আনেন প্রতিদিন।"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম পান ভালোবাসেন।"

"আপনি থাকেন কোথায়?"

"প্যাটারসনে।"

"কদ্দিন এখানে চাকরি করছেন?"

"প্রায় মাস পাঁচেক হল। আপনি কি পুলিশের লোক?"

"সেটা কেন মনে হচ্ছে?"

"আপনাকে তো দেখলাম পুলিশের সাহেবদের সঙ্গে।"

"আমি ম্যাডাম সুকন্যার জন্য কাজ করছি... ব্রজদুলালবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে।"

"খুব ভালো লোক ছিলেন স্যার।"

"আপনাকে পুলিশ প্রশ্ন করেছিল?"

"না। আমি তো ইংরেজি ঠিক জানি না, উত্তরও দিতে পারতাম না।"

"আপনি কি এখন কাজে যাচ্ছেন?"

"না, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।"

"বেশ, তাহলে দুয়েকটা প্রশ্ন করি। যেদিন ব্রজদুলালবাবু মারা গেলেন সেদিন আপনি সকালে গিয়েছিলেন ঘর পরিষ্কার করতে?"

"না। সাহেব আর ম্যাডামদের ঘর আমি পরিষ্কার করি দশটা নাগাদ। তবে সামনের একটা ঘর পরিষ্কার করতে গিয়েছিলাম।"

"ক'টা নাগাদ?"

"সাড়ে আটটার সময়।"

"আপনি কি দরজা বন্ধ করে ঘর পরিষ্কার করেন?"

"না, সব সময় দরজা খুলে রেখে পরিষ্কার করতে হয়।"

"সেখান থেকে কি ব্রজদুলালবাবুর দরজা দেখা যায়?"

"না, ঘরটা স্যারের পাশের ঘরের উলটোদিকে।"

"হলওয়েতে কাউকে দেখেছিলেন? মিস্টার শ্রীবাস্তব বা আর কারোকে?"

"শ্রীবাস্তব স্যার নিজের ঘরে ছিলেন... ওঁর কম্পিউটারে কিছু একটা কাজ করছিলেন। আমাকে বলেছিলেন একটু পরে এসে ঘরটা পরিষ্কার করে যেতে।"

"সেটা বুঝলাম। তারমানে আর কাউকে দেখেননি?"

"না, একজনকে দেখেছিলাম তোয়ালে হাতে, মনে হয় একজন গেস্ট।"

"সাহেবের ঘর থেকে কিছু শুনেছিলেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে, তাই ঠিক বুঝিনি।"

"মনে করার চেষ্টা করুন... যে কোনো কথা, অর্থ না জানলেও চলবে।"

"একটা লোকের গলা শুনছিলাম। ধমকের সুরে কিছু বলছিল কী একটা 'খালিন' বা ওরকম কিছু। উত্তরে স্যার কিছু বলছিলেন। কিন্তু ওই কথাটাই বার কয়েক শুনেছিলাম। তারপরেই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালাই, আর কিছু শুনতে পাইনি।"

"ঘর পরিষ্কার করার পর কি আপনি শ্রীবাস্তবের ঘরে গেলেন?"

"না। আমার ম্যানেজার ফোন করে বললেন তিন তলায় আরেকটা ঘর পরিষ্কার করতে। সেটা করে যখন দোতলায় নামি, তখন দেখি স্যারের দরজা খোলা ... অনেক পুলিশ। আমি ভয় পেয়ে ওখানে আর দাঁড়াইনি।

"ম্যাডামের সঙ্গে দেখা হল কখন?"

"দুপুরবেলা আমাকে শ্রীবাস্তব স্যার ফোনে ডাকলেন। বললেন ম্যাডামকে নতুন রুম নম্বরে গিয়ে পান দিয়ে আসতে।"

"পান পেলেন কোথায়?"

"আমার কাছে থাকে স্যার। আমি খুব পান খাই।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, আপনি তো স্যার আর ম্যাডামের ঘর পরিষ্কার করছেন বেশ কিছুদিন, আপনি ওঁদের ঘরে দামি কিছু পড়ে থাকতে দেখতেন?"

"স্যার, আমি কোনো দামি জিনিস ছুঁই না। যদি কিছু চোখে পড়ে, দামি বলে মনে হয়, ঠিক যেখানে দেখি সেখানে রেখে দিই।"

"আপনি কোনো কাফলিংক দেখেছিলেন?"

"ওই কথাটাই তো শুনেছিলাম স্যার," আমিনা উত্তেজিত হয়ে বলল। 'খাফলিন'... কী স্যার ওটা?"

"বোতামের মতো দেখতে। হাতের আস্তিনে থাকে।" একেনবাবু আমার শার্টের বোতামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন। তবে খুব সুন্দর আর বড়ো আঙটির মতো দেখতে হয়।"

"হ্যাঁ স্যার, একটা আধখোলা খামের মধ্যে আঙটির মতো কয়েকটা বোতাম আর একটা খোলা বাক্স বাইরের টেবিলে দেখেছিলাম। আমি ম্যাডামকে বলেছিলাম। ম্যাডাম সেটাকে ঝোলা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতে বলেছিলেন।"

"ঝোলা ব্যাগ?"

"ক্লজেটে একটা ব্যাগ ঝোলানো থাকত। স্যার নিজের জিনিস এদিক-ওদিক ফেলে ছড়িয়ে রাখতেন আর ভুলে যেতেন, ম্যাডাম আমাকে চোখে কিছু পড়লে ঝোলা ব্যাগে রাখতে বলতেন। পরে সেখান থেকে স্যারকে বার করে দিতেন।"

"সেই ঝোলা ব্যাগটা কোথায়?"

"ম্যাডামের নতুন রুমে। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আমি ওটা রেখে এসেছি।"

"চমৎকার, তাহলে চলুন ম্যাডামের ঘরে ওটা এখনও আছে কিনা দেখি।"

ঘরে সুকন্যা পাংশু মুখে বসে আছেন। একেনবাবু ঢুকেই বললেন, "ম্যাডাম, দুর্ভাবনা করবেন না। আমিনা একটা জিনিস ক্লজেটে রেখেছে, সেটা এখনও আছে কিনা আগে দেখি।"

সুকন্যার হতভম্ব মুখ দেখে বুঝলাম ওঁর কোনো ধারণাই নেই, কী নিয়ে কথা হচ্ছে।

ক্লজেটে ঝুলন্ত কাপড়ের ঝোলা হাতড়ে আমিনা একটা খাম বার করল। তারমধ্যে থেকে বেরল একটা বাক্স, ভেতরে দুটো কাফলিংক। কারুকার্য করা গিল্টি সোনার, মধ্যিখানে একটা হিরের চোখ। একেনবাবুর চোখে উত্তেজনা। ফোন করলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট নিশ্চয় খুব কাছেই ছিলেন, কয়েকমিনিটের মধ্যেই এফবিআই-র ফিল্ড অফিসার ডেভ বলডুইনকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কাফলিংকটা দেখেই ডেভ বলে উঠলেন, "বিঙ্গো! কোত্থেকে পেলেন?"

"ব্রজদুলালবাবুর ঘরেই ছিল, হাউস কিপার সরিয়ে রেখেছিল।"

"এটাই সেই স্পাই-কাফলিংক?" ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করলেন ডেভকে।

ডেভ মন দিয়ে কাফলিংকের মুখটা পরীক্ষা করে বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে। এখুনি এটাকে ল্যাব-এ পাঠাচ্ছি, ছবিগুলো প্রিন্ট করতে।"

"আপনি স্যার, ছবিগুলো একবার হাউসকিপার আমিনাকে দেখিয়ে দেবেন। ও মনে হয় সাহায্য করতে পারবে খুনিকে আইডেন্টিফাই করতে। তবে বাংলা জানে এমন কাউকে ডাকবেন, ও ভালো ইংরেজি বোঝে না।"

"অতি অবশ্য, অতি অবশ্য।" তড়িঘড়ি সবাই বিদায় নিলে একেনবাবু সুকন্যাকে বললেন, "ম্যাডাম মনে হয় এখন আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।"

।। ১০।।

কয়েকদিন বাদে আমাদের ডাক পড়ল এফবিআই-এর ফিল্ড অফিসে। ডেভ বলডুইন হলেন হোস্ট। ওদের কনফারেন্স রুমের টেবিলে কফি, ডোনাট, কেক, ফ্রুটস ইত্যাদি সাজানো। সেখানে ল্যারি স্টকটন আর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টও হাজির। ল্যারি আর ডেভ-এর করমর্দনে একেনবাবুর হাত মুচড়ে যাবার জোগাড়। ল্যারি বললেন, "স্পাই ক্যামেরার ভিডিও থেকে প্রায় সবাইকেই শনাক্ত করা গেছে। হাউস কিপিং-এর আমিনা দেখিয়ে দিয়েছে হলওয়েতে সাড়ে আটটার সময় তোয়ালে হাতে কাকে ও দেখেছে। কাঁচা-পাকা চুল, মোটা ভুরু, নাকের ওপর একটা বড়ো আঁচিল... আইডিয়াল জুয়েলরির মালিক। তোয়ালে জড়ানো যে ছুরিটা পাওয়া গেছে তার হাতল থেকে ফিঙ্গার-প্রিন্ট মেলেনি ঠিকই। ভালো করেই আততায়ী সেটা মুছেছে, কিন্তু ফরেন্সিক এক্সপার্টদের টাচ-ডিএনএ-এর যে টেকনিক আছে, সেটা আততায়ী জানে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সেটা কী?"

উত্তরটা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দিলেন। "আমাদের শরীরের চামড়া থেকে সবসময়েই স্কিন-সেল ঝরছে। তোয়ালেতে তার কয়েকটা পাওয়া গেলেই সেগুলো থেকে পিসিআর অ্যানালিসিস করে ডিএনএ প্রোফাইল তৈরি করা যায়। তবে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি, লোকটা সব স্বীকার করেছে।

আমি জানি ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের সঙ্গে একেনবাবুর আগেই কথা হয়েছে... কিন্তু ড্রামাটিক এফেক্ট-এর জন্য ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বললেন, "একেন, এঁদের এবার বুঝিয়ে বলো কী ভাবে কাফলিংকটা পেলে?"

"কী যে বলেন স্যার, আমি একা কেন, এঁরা সবাই না থাকলে কি আর হত?"

“আরে বিনয়টা ছেড়ে বলো।”

“আসলে স্যার, এক সেট নয়, দু-সেট কাফলিংক এর মধ্যে জড়িত ছিল। একটা দামি, আরেকটা সস্তা। দামিটা ছিল কার্টিয়ের কোম্পানির স্যাফায়ার ডায়মন্ড কাফলিংক, যেটা কেনাই ছিল বিজনেসম্যান ব্রজদুলালবাবুর উদ্দেশ্য। কিন্তু দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে প্রথম দিন সেটা কিনতে পারেননি। একটা সস্তা কাফলিংক আন-অফিশিয়ালি ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। কথা ছিল পরের দিন দোকান খুললে ব্যাঙ্ক চেক নিয়ে এসে দামি কাফলিংকটা কিনবেন, তখন ওই সস্তা কাফলিংকটা ফেরত দিয়ে সেই ক্যাশ টাকাটা নিয়ে নেবেন। বলা যেতে পারে ওটা ছিল খানিকটা আর্নেস্ট মানি। ব্রজদুলালবাবু ওই সস্তা কাফলিংকটা আর ফেরত পাঠালেন না। তিন-চারশো ডলার ওঁর কাছে কিছুই নয়! কিন্তু কাফলিংকটা সস্তা হলেও ওর মধ্যেই স্পাই ক্যামেরা ঢোকানো হয়েছিল। আপনাদের এক এজেন্ট কয়েকদিন আগে ওটা কিনে তার মধ্যে মাইক্রো-ক্যামেরা ঢুকিয়ে মালটা ফেরত দিয়েছিল। আইডিয়াল জুয়েলরি রিটার্ন গুডস নেয় না, কিন্তু ম্যাডাম ফারা নিয়েছিলেন আপনাদের ফিল্ড অফিসারের চার্মে মোহিত হয়ে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট সেটাই আমাকে বলেছেন। নিশ্চয় সেটা সম্ভব, আমার কিন্তু ধারণা মালিকের অনুমতি নিয়েই ম্যাডাম ফারা ফেরত নিয়েছিলেন... খুব বেশি দামের জিনিস তো নয়! আর ওতে যে স্পাই ক্যামেরা ঢোকানো হয়েছে মালিক প্রথমে হয়তো সন্দেহ করেননি। সন্দেহ থাকলে ওটাকে নষ্ট করতেন।

“দ্বিতীয় এজেন্ট যখন পরের দিন দোকানে গেলেন ওই কাফলিংকটার খোঁজে, তখনই মনে হয় সন্দেহের শুরু। দ্বিতীয় এজেন্টের আসল পরিচয় হয়তো ওরা জানত। ওটা এমন কোনো স্পেশাল কাফলিংক নয়, কিন্তু ঠিক ওটাই এই এজেন্টের কেন দরকার? এদিকে ম্যাডাম ফারাও পড়লেন মুশকিলে। তিনি তো জানতেন দোকানে ওটা নেই। ব্রজদুলালবাবুকে কাঁচা রসিদ দিয়ে ক্যাশে বিক্রি করেছিলেন। মালিক শুধু জানতেন ওটা ফেরত এসেছে এবং বিক্রিরও কোনো রেকর্ড নেই। মোটমাট ম্যাডাম ফারা ধরা পড়ে সবকিছু স্বীকার করলেন। উনি যে মালিকের অজান্তে ওটা ব্রজদুলালবাবুকে দিয়েছেন সিসিটিভিতেই দেখা গেল! মালিকের গ্যাং মেম্বাররা তখন সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত... কাফলিংকে স্পাইং ডিভাইস আছে, পুলিশের হাতে পড়ার আগেই যে করে হোক ওটাকে উদ্ধার করতে হবে। কে কাফলিংকটা প্রথমে কিনেছিল, তাকে খুঁজে বার করা হল সিসিটিভি-র ছবি থেকে। ম্যাডাম ফারার সঙ্গে তাঁর হয়তো পরিচয়ও হয়েছিল। তবে কী ভাবে ওই প্রথম এজেন্টকে এতো তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করা হল, আই হ্যাভ নো ক্লু। একটা সম্ভাবনা, দ্বিতীয় এজেন্টের পরিচয় ওরা জেনে গিয়েছিল বলে লুকিয়ে লুকিয়ে ফলো করছিল। হঠাৎ করে প্রথম এজেন্ট তার সঙ্গে দেখা করতে আসায় খুনের কাজটা সহজ হয়ে যায়। ম্যাডাম ফারাকে হত্যা করা হল উনি পুলিশের হয়ে কাজ করছেন সন্দেহে। বাকি রইল বিজনেসম্যান ব্রজদুলালবাবুর কাছ থেকে কাফলিংকটা দ্রুত উদ্ধার করা। তখনই ব্ল্যাকমেল শুরু হল। ব্রজদুলালবাবু ভাবলেন দামি কাফলিংক ফেরত চাইছে। না, ওরা চাইছিল সস্তা কাফলিংকটা। তাই কাফলিংক ফেরত দিয়েও মুক্তি পেলেন না। আমি ভাগ্যক্রমে ওটা পেলাম হোটেলের হাউস কিপিং লেডি আমিনার জন্য। তিনি ওটা যত্ন করে সরিয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং সব ধন্যবাদ ওঁর প্রাপ্য।”

ডেভ বলডুইন বললেন, “একটা জিনিসই বুঝলাম না, দুটো কাফলিংক চাইলেই তো চুকে যেত... দুটোই যখন বিজনেসম্যানের কাছে ছিল!”

“আমিও সেটাই ভাবছিলাম স্যার। মনে হয় গ্যাং-এর সবাই তখন এতো ভীত ও

উত্তেজিত, কুইক অ্যাকশন নিতে গিয়ে সবদিক খেয়াল রাখতে পারেনি। ভাগ্যিস পারেনি স্যার।”

“তোমার জন্যেই জুয়োচক্রটা আবিষ্কার হয়েছে। আইডিয়াল জুয়েলরির মালিকই এটার মূল পাণ্ডা।” ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বললেন। “কিন্তু একেন তোমাকে এবার একটা প্রশ্ন করি। আইডিয়াল জুয়েলরি নিয়ে এফবিআই-এর এত মাথাব্যথা কেন... অনুমান করতে পারো?”

“আপনি আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন স্যার!”

“আরে না, বলো না।”

“আপনিই তো স্যার বলেছিলেন জাল টাকা সংক্রান্ত।”

“কিন্তু কী সেটা?”

“আমার ধারণা স্যার, এই জুয়োচক্র চালিয়ে বাজে টাকা এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছিল ভালো টাকার সঙ্গে।”

ডেভ বলডুইনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। “কী ভাবে?”

“খুবই সহজ স্যার। যারা বাজি ধরছে তারা দিচ্ছে ভালো টাকা, জিতলে দেওয়া হচ্ছে নকল টাকা। হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফিট।”

“বুঝলাম না,” আমি বললাম। “বাজি জিতে নকল টাকা পেলে তো লোকেরা কমপ্লেন করতে পারে পুলিশের কাছে।”

“স্যার অপরাধ করতে গিয়ে টাকা খোয়ালে কি কমপ্লেন করা যায়। নিউ ইয়র্ক সিটির আইন অনুসারে তো স্যার এগুলো হচ্ছে ইল্লিগ্যাল বেটিং... তাই কি না!”

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দেখলাম গর্ব গর্ব মুখ করে ল্যারি আর ডেভের তাকাচ্ছেন... ভাবটা কী বলেছিলাম!

উডব্রিজ শহরে

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা দীপেনের একটা ফোন পেলাম।

"কাল বিকেলে চলে আয়, একা একা বড্ড বোর হচ্ছি। প্রমথকেও নিয়ে আয়।"

দীপেনের পরিচয়টা আগে দিই। আমাদের যাদবপুরের বন্ধু, ক্যাল-টেক থেকে পিএইচ ডি করে ইউ.সি বার্কলে, মানে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে ক্যাম্পাসে পড়াত। মাস ছয়েক হল রাটগার্স-এ এসেছে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়ে। রাটগার্স নিউ জার্সির স্টেট ইউনিভারসিটি, ইউ.সি বার্কলে-র মতো অত নাম নেই। এসেছে এই আশায় কয়েক বছরের মধ্যে ফুল-প্রফেসর হয়ে যাবে! ওর বউ দীপান্বিতা এখন দেশে। পুজো শেষ হলে ফিরবে।

দীপেন একেনবাবুর কথা জানত না। বলতেই বলল, "তাহলে তো আরও ভালো। আমার চারটে বেডরুম, কোনো সমস্যা নেই আরামেই থাকবি এখানে। বিচিত্রা ক্লাবের পুজো নাকি খুব বড়ো হয়, সেখানে সবাই মিলে যাব। আমি কিন্তু তোদের সবার নাম রেজিস্ট্রি করে ফেলছি।"

"রেজিস্ট্রি মানে? বারোয়ারি পুজো নয়?"

"সবাই আসতে পারে, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এত ভিড় হয়, আগে থেকে কতজন আসছে না জানলে সামলাতে পারে না। রান্নাবান্নার ব্যাপার আছে তো।"

"বুঝলাম, কিন্তু গ্যাঁট-গচ্চা কত দিতে হবে?"

"সেটা জানার তোর কী দরকার, তোদের আমি নেমন্তন্ন করতে পারি না?"

দীপেন বরাবরই লায়ন হার্টেড।

আমার নিউ জার্সিতে বেশি যাওয়া হয় না। সত্যি কথা বলতে কী, নিউ জার্সি আমার কাছে ম্যাদামারা লাগে বিশেষ করে ম্যানহাটানের তুলনায়। বেডরুম কম্যুনিটি, অ্যাকশন বলে কিছু নেই। এই কথা প্রমথ শুনলেই মুখ বেঁকায়। বলে, "এখানে যেন কত এক্সাইটিং কাজ করিস!"

পুজোয় নিউ জার্সি যাবার সম্ভাবনায় সবচেয়ে উত্তেজিত একেনবাবু।

"চলুন স্যার, চলুন। একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স হবে। ব্রুকলিন আর কুইন্সের পুজো তো অনেকবার দেখলাম।"

"এত আনন্দ কেন, বিনি পয়সায় পুজো দেখা হচ্ছে বলে?" প্রমথ খোঁচা দিল।

"কী যে বলেন স্যার, পুজোয় যাব আর তার জন্য দক্ষিণা দেব না?" তারপর আমাকে

বললেন, "একটু জেনে নেবেন স্যার, কত করে করে দিতে হবে।"

"ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, তিনটে টিকিট কিনলে ফোর্থটা ফাউ... আপনি নিখরচায় যাবেন।" মজা করেই বললাম।

একেনবাবু সব সময় রসিকতা বোঝেন না। বললেন, "তাহলে স্যার যাবার পথে কফি আমি খাওয়াব।"

দীপেন থাকে রাটগার্স ইউনিভার্সিটির কাছেই হাইল্যান্ড পার্কে। কোন পথ কখন নিতে হবে সেটা নির্ভর করবে কোথায় যানজট বেশি। আমার জিপিএস-এর একটা ভালো অ্যাপ্স আছে, ভিড়ভাট্টা এড়ানোর পথ বাতলায়। তাতে দেখলাম হল্যান্ড টানেল নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সোয়া ঘণ্টার মতো লাগল পৌঁছোতে।

দীপেনের বাড়ি দেখে সবাই আমরা মুগ্ধ। প্রায় চার হাজার স্কোয়ার ফুটের দোতলা বাড়ি! বেডরুমগুলো সব ওপরে। নীচের তলায় অতিথি-আপ্যায়নের জন্য বিশাল ড্রয়িং রুম। আপন লোকদের সঙ্গে গল্পগুজব করার জন্য যে লিভিং বা ফ্যামিলি রুম, সেটাও খুব ছোটো নয়। রান্নাঘরের পাশে ব্রেকফাস্ট করার জায়গা, এছাড়া ফর্মাল ডাইনিং রুম তো আছেই। একটা বড়োসড়ো প্যানট্রি দিয়ে গ্যারাজে যাবার দরজা, সেখানে ওয়াশিং মেশিন আর ড্রায়ার রয়েছে। আগে যাঁরা এখানে থাকতেন তাঁরা মনে হয় প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন, পিছনে শুধু ঘাস আর জঙ্গল, তারই মধ্যে কয়েকটা বড়ো বড়ো গাছ। প্রায় আধ-একর জমির ওপর বাড়ি, খুবই ইমপ্রেসিভ! আমাদের চোখে বিস্ময় দেখে নিজেই বলল, কী করে এতো বড়ো বাড়ি কিনতে পারল। ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ি বিক্রি করে প্রচুর প্রফিট করেছে, সেই টাকায়।

নিউ জার্সির এদিকে আমার বেশি আসা হয় না। নিউ জার্সির উত্তর দিকে, যেটাকে বলা হয় নর্থ জার্সি, সেখানে কয়েকবার গেছি, লেক ভালহাল্লায় মায়ের এক বন্ধু থাকত। অনেক উঁচু উঁচু টিলা ওই দিকটাতে। এটা নিউ জার্সির মধ্যিখানে, অর্থাৎ সেন্ট্রাল জার্সি। এদিকটা বেশ সমতল। বহু বঙ্গসন্তান সেন্ট্রাল জার্সি অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে থাকে। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান থেকে আসা এত লোক এই অঞ্চলে যে এডিসন টাউনের ওক ট্রি রোডের বাজারকে এখন লিটল ইন্ডিয়া বলা হয়। এগুলো সব দীপেনের তথ্য। আমাদের কাছে লিটল ইন্ডিয়া হল ম্যানহাটানের লেক্সিংটন রোডের খানিকটা অংশ বা কুইন্সের জ্যাকসন হাইট্স-এর দোকানগুলো।

বিচিত্রার পুজো হয় সমারসেট-এর ইউক্রেনিয়ান কালচার সেন্টারে। জায়গাটা দীপেনের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে নয়। গিয়ে দেখি বিশাল পার্কিং লট-এর সামনে সাইন লাগানো 'এন-জে-পি-সি' দুর্গাপুজো। একজন সিকিউরিটি গার্ড গেট পাহারা দিচ্ছে।

"খুবই কনফিউসিং স্যার," একেনবাবু বললেন, "আপনি বলছেন এটা বিচিত্রার পুজো, কিন্তু পুজোর টিকিটেও তো এন-জে-পি-সি লেখা। নাম কিন্তু কোথাও নেই।"

"ঠিক জায়গায় এনেছিস তো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দীপেনও মনে হল একটু আশ্চর্য। "হ্যাঁ, এই ঠিকানাই তো দিয়েছিল আমাকে।"

"ক'টা পুজো হয় নিউ জার্সিতে?" এবার প্রমথর প্রশ্ন।

"অনেকগুলো। কিন্তু এটাই আমাকে ত্রিদিব রেকমেন্ড করল, ও-ও আসছে এখানে।"

"ত্রিদিব? মানে আমাদের যাদবপুরের ত্রিদিব?"

"রাইট। ও এখন এখানে বেশ কয়েকটা ফার্মাসির মালিক।"

বাঙালি ব্যবসা করছে শুনলে বেশ ভালো লাগে। আমাদের রক্তে শুধু চাকরির নেশা, ব্যবসার কথা ভাবতেই পারি না।

“কিন্তু ওষুধের দোকানের তো বিশাল বিশাল চেন, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তো কঠিন ব্যাপার!” আমি বললাম।

“করে তো খাচ্ছে। শুধু খাচ্ছে না, ওর বাড়ি দেখলে মুখ হাঁ হয়ে যাবে।”

“আর হাঁ হয়ে দরকার নেই... মনে হচ্ছে আমাদের হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরার জন্যেই এখানে ডেকেছিস।” আমি হাসতে হাসতে বললাম। যদিও মনের মধ্যে একটা খোঁচা লাগছিল। ত্রিদিবটা একটা আকাট ছিল। কোনো মতে বিএসসিতে অত্যন্ত বাজে রেজাল্ট করে ফার্মাসিতে ঢুকেছিল। সেটাও সোজা পথে বোধহয় নয়।

প্রমথ আমার দিকে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বলল “চিরদিনই শুধু গেঁড়ের মতো পড়াশুনো করে গেলি।” ভাবটা নিজে যেন করেনি।

আমাদের সামনে বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে লট-এ ঢোকার অপেক্ষা করছে। গার্ড টিকিট দেখে দেখে গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে। আমাদের টিকিট দেখেও ঢুকতে দিল।

দীপেন গেট দিয়ে গাড়ি ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, “ঠিক জায়গাতেই তার মানে এসেছি। এখন মনে পড়ছে, ত্রিদিব এই নিয়ে কী জানি বলছিল... কোনো টেকনিক্যাল কারণে এন-জে-পি-সি নামটা ব্যবহার করা হয়। কে জানে, হয়তো ভুল বলছি!”

“ট্যাক্স-ফ্যাক্সের ব্যাপার নিশ্চয়,” প্রমথ তো সবজান্তা।

আমরা পুজোতে এসেছি দীপেনের নতুন হন্ডা সিআরভি চড়ে। আমার পুরনো টয়োটা করোলা তার কাছে নস্যি। কিন্তু পার্কিং লটে দেখলাম মার্সেডিজ, লেক্সাস, বি এম ডব্লু-র ভিড়। নাঃ নিউ জার্সির বাসিন্দাদের টাকা আছে বটে!

“এরা বেশির ভাগই নিশ্চয় এইচ-ওয়ানবি ভিসা-র পার্টি।” প্রমথর বক্রোক্তি।

আমি খেয়াল করেছি এইচ-ওয়ানবি ভিসার লোকদের ওপর প্রমথর একটা জাতক্রোধ আছে। কেন, সে কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়, স্রেফ হিংসা ছাড়া। প্রমথর বক্তব্য এরা পড়াশুনো করতে আসে না। টেক-ফার্মে চাকরি নিয়ে আসে। স্বল্প মেয়াদি ভিসা... যে ক’বছর চাকরি করে, ভালো মাইনে পায়। এখানেই টাকাগুলো ওড়ায়, ধারে দামি গাড়ি কেনে আর নাকি ফুটানি মারে!

আমি জানি এগুলোর বেশির ভাগই অসত্য, কিন্তু প্রমথকে কে বোঝায়? আসলে কোনো একটা পার্টিতে একটি ছেলেকে (প্রমথর ধারণা এইচ-ওয়ানবি ভিসাধারী) বলতে শুনেছিল, ‘দূর দূর, যারা এখানে পড়াশুনো করতে আসত, তারা দেশে সুবিধা করতে পারেনি বলেই আসত। কোনো মতে এদেশে সস্তা একটা গাড়ি কিনতে পারলে আর কোনো মাস্টারির চাকরি মিললেই বর্তে যেত। ওরা লাইফের কী জানে!’

এটা শোনার পরে প্রমথ কী করে রাগ সামলেছিল জানি না। কিন্তু সেই থেকে এই এইচ-ওয়ানবি-দের ও সহ্য করতে পারে না। এটা যে শুধু একজন লোকের মত□ সেটা ও কিছুতেই মানবে না। কারণ যারা সেখানে ছিল, সবাই তাতে সায় দিয়েছিল। ওর শেষের এই কথাটা আমি কোনোমতেই মানি না। ওরকম একটা মন্তব্য শোনার পর প্রমথ অন্যদের রিয়্যাকশন দেখতে দাঁড়িয়েছিল, আমি বিশ্বাস করি না। তার ওপর আমি একদিন বলতে গিয়েছিলাম, লোকটা ভুল তো কিছু বলেনি, সেই শুনে আমাকে এই মারে কি সেই মারে!

একটা বড়ো হলে পুজো হচ্ছে। ভীষণ ভিড়। ঠাকুর দর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়, এসেছি চেনাজানা যদি কাউকে পাই আড্ডা দেব। হলঘরে ঢুকে সেটা অসম্ভব! একেনবাবুর টানাটানিতে দীপেন আর প্রমথ হলে ঢুকল। আমি দেখলাম বাইরে লবিতে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়িতে বা নীচের চত্বরেও কম লোক নেই। সেখানেই দেখা হয়ে গেল ত্রিদিবের সঙ্গে। ত্রিদিব কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা মারছিল, আমাকে দেখে হইহই করে উঠল। পরিচয় হল ওর বন্ধুদের সঙ্গে। সবগুলো নাম এখন মনেও করতে পারব না। তবে যাদের সঙ্গে পরিচয় হল তাদের একজন ছাড়া কেউই এদেশে পড়াশুনো করতে আসেনি, চাকরি নিয়েই এসেছে। অর্থাৎ তাদের সবাই-ই প্রমথর তালিকায় 'অসহ্য' গ্রুপের। আমার কিন্তু চমৎকার লাগল তাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। প্রত্যেকেই নিউ জার্সিতেই থাকে, তবে বিভিন্ন শহরে।

এরমধ্যে একেনবাবু এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। একেনবাবু গোয়েন্দা শুনে সবাই দারুণ উৎসাহিত। এদের মধ্যে জনা দুয়েক দেখলাম একেনবাবুর নাম জানেন।

"আপনিই মুনস্টোন মিস্ট্রি ক্র্যাক করেছিলেন না?" যিনি বললেন তাঁর নাম অনিন্দ্য। ওই দলের মধ্যে একমাত্র তিনিই পড়াশুনো করতে এদেশে এসেছিলেন। তবে মাস্টার্স করে আর পিএইচ ডি-র দিকে এগোননি। সিএফএ করে একটা ফাইনানশিয়াল কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলেন। সেখানে ক্লায়েন্টদের ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট না কী সব জানি করতেন। এখন নিজের কোম্পানি খুলেছেন ফাইনানশিয়াল অ্যাডভাইস দেবার জন্য। স্টক্স আর বন্ডস, মানে শেয়ার মার্কেটে টাকা ঢালার ব্যাপারটা আমি ভালো বুঝি না। এটুকু বুঝি যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে যতটা সুদ পাওয়া যায়, তার থেকে অনেক বেশি পাওয়া যায় ঠিকঠাক স্টক বা বন্ড সময়মতো কিনে বেচতে পারলে! এই 'ঠিকঠাক' আর 'সময়মতো' কথা দুটো খুবই অর্থবহ। উলটোপালটা হলে ফতুর হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

একেনবাবু অবশ্য অনিন্দ্যকে সবিনয়ে বললেন, "না না স্যার আমি একা নয়, তবে টিমে ছিলাম। বাপিবাবু, প্রমথবাবুও আমার সঙ্গে ছিলেন।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বিনয়ে কাজ দিল না। ওখানে দাঁড়ানো সবাই ছেঁকে ধরল কী ভাবে রহস্যের উদ্ঘাটন হয়েছিল। সেই নিয়ে কিছুক্ষণ গল্পগুজব চলল। এর মধ্যে ক্যামেরা কাঁধে কিশোর বলে একজন একেনবাবুর কাছে একটা কার্ড চাইল।

কিছুদিন আগে একেনবাবুকে দিয়ে যে কার্ড বানানো হয়েছে তার থেকে একটা বার করে দিলেন। কার্ড ছাড়াও ফোন নম্বরের আদান প্রদান করলেন। একেনবাবুর কথা ইতিমধ্যেই পুজো মণ্ডপে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, বেশ কিছু কৌতূহলী চোখ দেখলাম। অরিন্দম ও তার স্ত্রী কেতকী, অজয় ও অজয়ের স্ত্রী অনিন্দিতা, শৈবাল ইত্যাদি, আরও কয়েক জনের সঙ্গে পরিচয় হল। মেয়েদের মধ্যে অনিন্দিতার সঙ্গেই একটু আধটু কথা হল। দীপেন দেখলাম ওদের ভালো করেই চেনে। অনিন্দিতা দীপেনের স্ত্রী দীপান্বিতার সঙ্গে কলকাতায় পড়েছে। সেই সূত্রেই এই দলের সঙ্গে চেনাজানাটা বেশি। শৈবালের স্ত্রীকে অবশ্য দেখলাম না, অনিন্দ্যর স্ত্রীকেও নয় হয়তো হলের ভিতরে ছিল।

মোটকথা পুজো দেখার চেয়ে আড্ডাটাই বেশি হল। আমাদের প্ল্যান ছিল শনিবারই ফিরে আসা, কিন্তু দীপেন ছাড়ল না, "রাতে আমার সঙ্গে থেকে যা, রোববার ফিরিস।"

এমন করে বলল, না বলতে পারলাম না।

রাত্রে খাবার অর্ডার করব ঠিক করেছিলাম। প্রমথ ঘোষণা করল ও রান্না করবে। দীপেন দু-বছরও হল বিয়ে করেনি, এর মধ্যে যে শুধু রান্নাবান্না ভুলে গেছে তা নয়,

কোথায় মশলাপাতি আছে তাও জানে না। প্রমথ আবার রান্নায় শর্টকাট করে না, রান্নার প্রতিটি উপাদান ওর কাছে অপরিহার্য। দীপেন দু-দু বার ফোন করল কলকাতায় কোথায় পোস্ত আছে, কোথায় কালোজিরে আছে ইত্যাদি জানতে। ওর বউ দীপান্বিতাকে আমি আবছা চিনতাম, আমার মাসিদের পাড়ার মেয়ে। আমাদের থেকে বছর পাঁচেকের ছোটো। পড়াশুনোয় খুবই ভালো ছাত্রী, একটু সিরিয়াস টাইপ। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়াতে পড়াশুনো করতে এসে দীপেনের সঙ্গে পরিচয়। কিছুদিন প্রেমের পরে বিবাহ।

প্রমথ রান্না করছে আর আমাদের আড্ডা চলছে। একথা সেকথার পর যাদের সঙ্গে পুজোয় দেখা হল তাদের প্রসঙ্গ এল। ওদের মধ্যে অজয়কেই দীপেন মোটামুটি চেনে। অন্যদের সঙ্গে উপর উপর আলাপ। বড়ো বড়ো সোশ্যাল ফাংশনে ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেও সামাজিক ভাবে তেমন মেলামেশা নেই।

"সে কি রে! আমার তো ওদের সঙ্গে গল্প করে দিব্বি লাগল। আমাদেরই বয়সি, হইচই করা পার্টি।"

"আমার ঠিক জমে না।"

"কেন জমে না?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

দীপেন কাটাতে চাইছিল। প্রমথ ছাড়ল না, "দুম করে একটা স্টেটমেন্ট করলি, কিন্তু সেটা ব্যাক-আপ করছিস না, ব্যাপারটা কী?"

কিন্তু কিন্তু করে দীপেন শেষে বলল, "দীপান্বিতা বিরক্ত হয় ওদের সঙ্গে মিশতে। আসলে বুঝলি তো, ওদের পার্টিগুলো একটু ওয়াইল্ড হয়। মদ-টদ খেয়ে, কে যে কী করে ঠিক ঠিকানা নেই। বিশেষ করে অনিন্দিতা একটু..." বলেই লজ্জা পেল দীপেন। বলল, "থাক গে..." বলে থেমে গেল।

বোঝা গেল আরও কোনো ব্যাপার আছে যা দীপেন বলতে চায় না। প্রমথ তাও কি ছাড়বে?

"মদ বেশি খেলে একটু আধটু মাতলামো তো সবাই করে। কিন্তু 'থাক গে' কথাটা বললি কেন?"

"আরে দূর, বাদ দে!" তারপর একটু চুপ করে বলল, "আসলে অনিন্দিতা দীপান্বিতাকে একটু হিংসা করে আমরা এখানে পার্মানেন্টলি থাকতে পারছি বলে। অনিন্দিতা দেশে ফিরতে চায় না, কিন্তু অজয়কে তো ফিরতেই হবে আর এক বছর বাদে... ওদের ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এটা ঠিক অনিন্দিতা একটু ফ্লার্টিশ, গায়ে পড়া টাইপ, আর দীপান্বিতা ভীষণ কনসার্ভেটিভ। ও একেবারেই চায় না আমি ওদের সঙ্গে মিশি। সেই জন্যেই ওদের পার্টিগুলোতে যাওয়া হয় না। ...সরি, এগুলো তোদের বলা অনুচিত। এসব আবার রাষ্ট্র করিস না।"

।। ৩ ।।

পুজোর এক সপ্তাহ বাদেই একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন।

"মনে আছে আমাকে, পুজোয় আলাপ হয়েছিল। আমি অনিন্দ্য।"

"কী মুশকিল এক সপ্তাহের মধ্যে নাম ভুলে যাব, এত ভুলো মন তো হয়নি এখনও, কী খবর?

“এই উইক এন্ডে কিছু করছ?” একদিনের আলাপেই কখন ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’ হয়ে গিয়েছিল!

“বিশেষ কিছু নয়। কেন বলো তো?

“আসলে দীপেনকে লাঞ্চে ডেকেছি। ও-তো ফোর্সড ব্যাচেলর, আর আমি খাঁটি সার্টিফায়েড ব্যাচেলর। দীপেনের কাছে শুনলাম তোমরাও ব্যাচেলর, শুধু একেনবাবু নন। কিন্তু ওঁর স্ত্রীও তো কলকাতায়। তাই ভাবলাম শুধু ছেলেরা একসঙ্গে বসে দুপুরটা কাটাই।”

লাঞ্চের জন্য এখন নিউ জার্সি ঠ্যাঙাব! ‘তুমি’ করে সম্বোধন করলেও তেমন করে চিনিও না। আমার তরফ থেকে নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করে অনিন্দ্য বলল, “আরে শোনো, আমি কিন্তু খারাপ রাঁধি না। দীপেন সাক্ষী... জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। সর্ষে দিয়ে ইলিশ রান্না করব, একটা ভালো সাইজের ইলিশ পেয়েছি।”

“এ-রকম প্রস্তাব দিলে তো ‘না’ করা মুশকিল। কিন্তু আবার এত কষ্ট করবে?”

“এত বড়ো ইলিশ তো আমি আর দীপেন একা একা খেতে পারব না, এলে আমার উপকারই করবে।”

“তোমার সঙ্গে কথায় পারব না। আচ্ছা, প্রমথ আর একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখি।”

ইলিশ শুনে একেনবাবু এক পায়ে খাড়া। ফ্র্যাঙ্গিস্কা নেই, তাই প্রমথও মনে হল নিমরাজি।

অনিন্দ্যকে বলে দিলাম, “যাব। ঠিকানাটা টেক্সট করে দাও।”

একটা মিষ্টি জার্মান ওয়াইন রিসলিন-এর বোতল (প্রমথর সাজেশন, ফ্র্যাঙ্গিস্কার ফেভারিট) নিয়ে রওনা দিলাম অনিন্দ্যের বাড়ির দিকে।

গার্ডেন স্টেট পার্কওয়েতে উডব্রিজ-এর এক্সিট নিতেই একেনবাবু বললেন, “আরে, জ্যাক তো এখানকার পুলিশ চিফ?”

“জ্যাক?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ স্যার, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের ডিপার্টমেন্টে সার্জেন্ট ছিল। নিউ জার্সির উডব্রিজ শহরে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চিফের চাকরি নিয়ে এসেছিল। আমাকে একবার আসতেও বলেছিল ওর অফিস দেখে যেতে।”

“দেখতে যাবেন নাকি?”

“কী যে বলেন স্যার, কোথায় সর্ষে ইলিশ আর কোথায় ডিপার্টমেন্টের স্যান্ডউইচ!”

উডব্রিজ শহরে ছোট্ট ছিমছাম একটা বাড়ি। অনিন্দ্য ছাড়া আরেকটা প্রাণী ওখানে থাকে। মনুষ্য নয়, গোল্ডেন রিট্রিভার। বাড়ির সামনে গাড়ি থামাতেই দৌড়ে গাড়ির পাশে এসে দু-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অন্য দুটো পা গাড়ির দরজায় রাখল। তারপর জানলায় মুখ ঠেকিয়ে ভৌ ভৌ শুরু করল। পিছন পিছনই অনিন্দ্য এসে হাজির। ওর গলার বকলসটা চেপে ধরে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলল, “সিট।”

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মতো কুকুরটা বসে পড়ল।

“স্টে,” বলে অনিন্দ্য এসে গাড়ির দরজা খুলে বলল, “ভয়ের কিছু নেই, খুব ফ্রেন্ডলি কুকুর। চুপ করে বসে থাকবে যতক্ষণ না ‘জি-ও’ বলছি। বললে উঠে এসে সবার কাছে আদর খেতে আসবে। কুকুর ভয় পাও না তো?”

"আমি না, কিন্তু জি-ও?"

"শব্দটা বললাম না। বললেই তো..."

প্রমথর বাড়িতে কুকুর ছিল। একেনবাবুও দেখলাম কুকুর ভয় পান না। আমরা নামতেই দেখলাম কুকুরটা কুঁ কুঁ করে মনিবের অনুমতি চাইছে ওঠার জন্য।

'গো' বলা মাত্র লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আদর করে অস্থির।

আমি ওকে একটু আদর করে বললাম "কী নাম ওর?"

"খুশ।"

"খাসা নাম। নামের মর্যাদা রেখেছে। কিন্তু এভাবে ও খোলাই থাকে? কোনো বেড়া তো দেখছি না, পালিয়ে যায় না?"

"ইলেকট্রিক ফেন্স একটা আছে। তবে ও এমনিতেই এই চত্বরের বাইরে যায় না।

"খুব পাহারাদার বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"ঠিকই বলেছ। ওকে এনেছিলাম বাড়ি পাহারা দেবে বলে। কোথায় কী? কেউ এলেই এত অভ্যর্থনা করে যেন কুটুম্ব বেড়াতে এসেছে। তবে কি না, ও থাকায় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না।"

"গোল্ডেন রিট্রিভার আমার খুব পছন্দের কুকুর।" খুশকে আদর করতে করতে প্রমথ বলল। "ওরা জেন্টল অ্যাজ এ নান, কোথায় জানি পড়েছিলাম।"

"একদম ঠিক, কিন্তু বড্ড শেড করে। সোফা থেকে শুরু করে মেঝের কার্পেট পর্যন্ত ওর লোম। সকাল বিকেল ভ্যাকুয়াম করতে করতে প্রাণ যায়!"

কথাটা ঠিক আমার প্যান্টেও দেখলাম কয়েকটা সোনালি লোম এর মধ্যেই লেগে গেছে।

সত্যিই ভালো রাঁধে অনিন্দ্য। তৃপ্তি করে ইলিশ খেলাম। এছাড়াও ছোলার ডাল, চচ্চড়ি, আরও বেশ কিছু পদ করেছিল। খেতে খেতে গল্প হল। খাবার পরে কফি নিয়ে বসলাম। দেখতে দেখতে প্রায় ঘণ্টা কয়েক আড্ডা হল।

পুজোর সময় যাদের সঙ্গে ভাসা ভাসা পরিচয় হয়েছিল, অনিন্দ্যর সঙ্গে গল্প করে তাদের অনেক বিশদ পরিচয় পেলাম। দীপেনও এত ভালো জানত না। অনিন্দ্যর সঙ্গে ওদের সবারই খুব দহরম মহরম। উইক এন্ডে নিয়মিত একসঙ্গে কারোর না কারোর বাড়িতে আড্ডা দেয়। এই উইক এন্ড একসঙ্গে সবাই বাইরে কাটাবে বলে কোথায় জানি গেছে, অনিন্দ্যর একটা কাজ ছিল বলে যায়নি।

শৈবাল, অরিন্দম, অজয় সবাই আই-টি ফার্মে কাজ করে। কিন্তু কেউই রেগুলার কর্মী নয়, কনসাল্টেন্ট। কনসাল্টেন্ট মানে এদের কোনো একটা বিশেষ প্রজেক্টে কাজ করানোর জন্য এদেশে আনা হয়। কনসাল্টেন্টরা পেনশন, প্রভিডেন্ড ফান্ড (এদেশের ফোর-ওয়ান-কে), ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি পায় না, তার বদলে খুব মোটা রকম আওয়ারলি পে দেওয়া হয়। একদিক থেকে বিচার করলে দু-পক্ষেরই লাভ। যাদের ভিসার মেয়াদ এমনিতে কয়েক বছর মাত্র, তাদের পক্ষে চমৎকার ডিল।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে সাকসেসফুল নিঃসন্দেহে ত্রিদিব□ সাকসেস যদি টাকার হিসেবে হয়। একমাত্র ত্রিদিবেরই গ্রিন কার্ড আছে, অর্থাৎ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট। সম্ভবত এখন সিটিজেন, দশ বছর হল এদেশে আছে। আটটা খুব চালু ওষুধের দোকান, টি-কে ফার্মাসি-র মালিক। এখন ফ্র্যাঞ্চাইজিং বিজনেসে নেমেছে। টি-কে ফার্মাসি ব্র্যান্ড নেম দিয়ে আরও অনেকগুলো ফার্মাসি ছোটো ছোটো শহরে খোলা হচ্ছে। এগুলোর মালিক হবে

বিভিন্ন লোক, কিন্তু টি-কে ফার্মাসির গুড উইল আর ফার্মাসির বিশাল ওষুধের স্টক ব্যবহার করতে পারার সুবিধার জন্য মোটা রকম লাইসেন্স ফি ত্রিদিবকে দিচ্ছে।... হয়তো আরও অনেক সুবিধা এর সঙ্গে জড়িত, অনিন্দ্য সবটা জানে না বা বুঝতে পারে না।

অনিন্দ্যের কথাবার্তায় এটুকু বুঝলাম অনিন্দ্য ত্রিদিবকে খুব একটা পছন্দ করে না। সরাসরি অবশ্য কিছু বলল না। কথায় কথায় জানাল, ত্রিদিবের স্ত্রী ত্রিদিবকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। বলেই বোধহয় একটু লজ্জা পেল। "নানা কারণেই তো একজনকে ছেড়ে আরেকজন চলে যেতে পারে, তাই না?"

অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ। আমরা তিনজনেই চুপ। এরপর যেটা বলল, সেটা আরও কনফিউসিং। ত্রিদিব খুবই পপুলার, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে।

এটা শোনার পর, স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগবে, সেটাই কি ওর স্ত্রী-র ওকে ছেড়ে যাবার কারণ?

এ নিয়ে প্রশ্ন করাটা শোভন নয়। তবে বন্ধু-পত্নীদের ওকে পছন্দ করার কারণটা পরে স্পষ্ট হল। ত্রিদিব বেশ কয়েকজন বন্ধুর স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছে। অরবিন্দের স্ত্রী, অজয়ের স্ত্রী এবং আরও দু-একজনকে। এমনিতে এই সব স্ত্রীদের ডিপেন্ডেন্ট ভিসা, স্বামীর ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে এসেছে বলে। ওই ভিসায় কেউ চাকরি করতে পারে না। অথচ সকলেই ওয়েল এজুকেটেড। দেশে অনেকেই চাকরি করত, রোজগারও মন্দ করত না। এখানে এসে কাজকর্ম না করে বসে থাকাটা সবার পক্ষেই কষ্টকর! ত্রিদিব ওর কোম্পানিতে সবাইকে কাজে লাগিয়েছে। কাগজে কলমে নয়, সেটা করা বে-আইনি। ক্যাশ টাকা দেয় মাইনের বদলে। দু-নম্বরি খাতার ব্যাপার নিশ্চয়। কিন্তু অল অ্যামং ফ্রেন্ডস, এই নিয়ে কেউ কিছু বলে না।

।। ৪।।

ন'দিন বাদে সোমবার সকালে যে খবরটা পেলাম সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ফোন করেছিল দীপেন। খুবই উত্তেজিত!

"অনিন্দ্য খুন হয়েছে!"

"অনিন্দ্য মানে! আমাদের অনিন্দ্য? গত সপ্তাহে যার কাছে খেতে গিয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ, সেই।"

"তুই শিওর?"

"একটু আগেই লোকাল নিউজে বলল। ওর বাড়ির সামনে থেকে রিপোর্ট করছিল। সকালবেলায় বাড়িতে ওর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। যে মেয়েটি অনিন্দ্যর বাড়ি পরিষ্কার করতে আসে, সেই ওর বডিটা দেখতে পায়। তবে খুন কি না বলেনি। কিন্তু আত্মহত্যা কেন করতে যাবে ও? ফোর্ডের পুলিশ তদন্ত করছে। প্রতিবেশীরা কেউই অনিন্দ্যের সম্পর্কে বিশেষ জানে না। পুলিশ ওর পরিচিতদের খুঁজছে যারা অনিন্দ্য সম্পর্কে কিছু খবর পুলিশকে দিতে পারে।"

"ও মাই গড!"

"অজয়ের কাছ থেকে এখুনি ফোন পেলাম। কিশোর অজয়কে এর মধ্যেই ফোন করেছে। অবভিয়াসলি বন্ধুরা সবাই খুবই আপসেট আর ভয়ও পেয়েছে। এইসবের মধ্যে

কোনো মতে জড়িয়ে পড়লে, কী হবে সেই সব ভেবে। একেনবাবু কি উডব্রিজ পুলিশ ফোর্সের কাউকে চেনেন?”

আমি বললাম, “ওদের পুলিশ চিফকে একেনবাবু চেনেন। তুই দাঁড়া, আমি একেনবাবুকে দিচ্ছি।”

প্রমথ আর একেনবাবু রান্নাঘরে। প্রমথ কফি বানাচ্ছিল, একেনবাবু সঙ্গ দিচ্ছিলেন। আমি ফোনটা নিয়ে একেনবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, “অনিন্দ্য খুন হয়েছে, দীপেন ফোনে।”

“সেকি স্যার!” একেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর ফোনটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “স্যার, কখন এটা ঘটল?” দীপেন কী বলছিল আমি শুনতে পারছিলাম না।

“...ঠিক আছে স্যার। আমি ওখানকার পুলিশ চিফকে খুব ভালো করে চিনি। যোগাযোগ করব। আগে বাপিবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।”

ওদিক থেকে উত্তেজিত দীপেন কী বলছে শুনতে পেলাম না। একেনবাবু কিছুক্ষণ হ্যাঁ হুঁ করলেন। শেষে বললেন, “ভাববেন না স্যার, আমি খোঁজ নিচ্ছি।”

ফোন শেষ হলে প্রমথ জিজ্ঞেস করল, “কী শুনলেন দীপেনের কাছে?”

“ডিটেল দীপেনবাবু খুব একটা জানেন না। সকালে টিভি-তে শুনেছেন গুলি লেগে মারা গেছেন। পুলিশ এখনও বলেনি, খুন না সুইসাইড। দীপেনবাবুর ধারণা খুন।”

“সেটা ধারণা করার কারণ?” প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

“জানি না স্যার। উনি এত আপসেট, সে প্রশ্নটা করিনি। আসলে এগুলো সামনাসামনি জিজ্ঞেস করাটাই ভালো। কিন্তু তার আগে স্যার একবার মিস্টার জ্যাককে ফোন করি।”

“জ্যাক, মানে ওখানকার পুলিশ চিফ?”

“হ্যাঁ, স্যার। আগেও বেশ কয়েকবার বলেছেন ওঁর অফিসে যেতে। সুতরাং অভ্যর্থনা পাব।”

“বিনে পয়সায় আপনার হেল্প পেলে, কোন ছাগল অভ্যর্থনা করবে না।”

“কী যে বলেন স্যার, মিস্টার জ্যাক সে-রকম লোকই নন।”

এবার আমার মনে পড়ে গেল জ্যাককে। ক্রু-কাট করা দোহারা চেহারা মাঝারি হাইটের একটা ছেলে। ছেলেই বলছি আমাদের থেকে একটু ছোটোই হবে। ওকে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের ল্যাংবোট বলতাম।

“আপনি কি আজ ওর ওখানে যাবার কথা ভাবছেন?”

“আমার ভাবনা তো স্যার শুধু ভাবনা। আপনি ‘হ্যাঁ’ বললে তবেই না কিছু হয়!”

এটা বলার কারণ, আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে আমিই শুধু গাড়িধারী। একেনবাবু হাড় কিপ্পন, মরে গেলেও গাড়ি কিনবেন না। প্রমথ এমনিতে খরচে, কিন্তু ওর বক্তব্য এক বাড়িতে দুটো গাড়ি থাকার অর্থ নেই। ও নিয়ে কিছু বললেই বলে, ‘তোর তো একটা আছে। পেট্রলের খরচা আমি শেয়ার করব।’ আচ্ছা, সেটা কি চাওয়া যায়! আমি অবশ্য বিরক্ত হই না। মেহনতের কাজ ও অনেক করে... রান্না করা, বাজার করা, ঘর পরিষ্কার ইত্যাদি। তার জন্য অবশ্য আমাদের সাহায্য করতে হয়, কিন্তু উদ্যোগটা ওর। আর ওদের জন্য গাড়ি বার করতে হয় কালেভদ্রে, ম্যানহাটানের বাইরে যখন যাই নিউ জার্সি, কুইন্স, কানেক্টিকাট, এইসব জায়গায়।

কলেজ থাকলেও আজ আমার ক্লাস নেই, অর্থাৎ যাওয়ার অসুবিধা নেই। প্রমথ যে প্রমথ যাকে ল্যাব থেকে সরানো যায় না, ও-ও দেখলাম রাজি। একেনবাবু জ্যাককে ফোন করলেন। জ্যাক খুবই খুশি। জ্যাক নিজেই নাকি একেনবাবুকে ফোন করতে যাচ্ছিল

সাহায্য চেয়ে। শুধু ভাবছিল ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে দিয়ে অনুরোধটা করাবে কিনা। আসলে উডব্রিজ-এর ইন্ডিয়ান কম্যুনিটি খুবই বর্ধিষ্ণু। ওখানেই হল ওক ট্রি রোড, যেটাকে বলা হয় লিটল ইন্ডিয়া। সেই রাস্তার দু-ধারে সারি সারি দেশি দোকান, যেখান থেকে উডব্রিজ শহরের প্রচুর আয়। মেয়র থেকে শুরু করে সিটি কাউন্সিলের সবাই দেশিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চায়। যদি কেউ ভেবে বসে দেশি বলে পুলিশ তদন্তে গাফিলতি করছে, তাহলে ঝামেলা। জ্যাককে তাই মেয়রের নির্দেশ যত দ্রুত সম্ভব ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করার।

দীপেনকে ফোন করে বললাম, একেনবাবুকে নিয়ে আমরা আসছি। প্রথমে পুলিশ চিফের কাছে তারপর ওর বাড়িতে ঢুঁ মারব।

।। ৫।।

জ্যাকের অফিসে যেতেই হ্যান্ডশেক করে আমাদের একটা ছোট্ট কনফারেন্স রুমে নিয়ে গেল। ঘরটা ড্রিপ-কফির গন্ধে ম-ম করছে। প্রচুর ডোনাট আর ডেনিশ পেস্ট্রি সাইড টেবিলে সাজানো। ঘরে ঢুকে হড়বড় করে একেনবাবুকে বলল, "আপনার সাহায্য আমাদের ভীষণ ভাবে দরকার, উডব্রিজের পুলিশ গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট খুবই ছোটো, একজন মাত্র ডিটেকটিভ। দুটো মার্ডার নিয়ে তার নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। তার ওপর এই মার্ডার। মেয়র নিজে এই খুনটাতে বিশেষ ভাবে ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন। আমি আপনার কথা ওঁকে বলেছি। উনি চান আপনি কনসাল্টেন্ট হিসেবে সাহায্য করুন। আমরা এজন্য যথাযোগ্য পারিশ্রমিক আপনাকে দিতে পারব। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আপনাকে কী দিতেন আমি জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত, এখানে আমরা যা দিতে পারব, সেটা তার থেকে বেশি ছাড়া কম হবে না। তাছাড়া এটা ম্যানহাটান থেকে অনেক দূরে, তারজন্য একটা কনভেনিয়েন্স অ্যালাওন্সও মেয়র দেবেন বলে জানিয়েছেন।"

"কী যে বলেন স্যার। যিনি মারা গেছেন তিনি আমাদের পরিচিত, তাঁর সম্মানেই তো আমি সাহায্য করতাম।"

"এটা শুধু সাহায্য নয়, পুরো দায়িত্বই আপনার। আপনাকে আমরা একটা টেম্পোরারি ব্যাজ দিচ্ছি।"

জ্যাক একেবারে প্রস্তুত হয়েই ছিল, পকেট থেকে বার করে একেনবাবুকে একটা ব্যাজ আর একটা খাম দিল। এর মধ্যে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে। এই কনফারেন্স রুমটা আপনার টেম্পোরারি অফিস।

মূহুর্তের মধ্যে সব কিছু অফিশিয়াল!

"আরেকটা কথা স্যার, বাপিবাবু, প্রমথবাবু আর আমি, আমরা তিনজনের একটা টিম। ওঁরা কিন্তু আমার কাজের মধ্যে থাকবেন, নইলে আমি নেই।"

জ্যাক মনে হল এতে একটু প্যাঁচে পড়েছে। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, "ঠিক আছে, আন-অফিশিয়ালি আপনি কার সাহায্য নেবেন তাতে আমার সমস্যা নেই। তবে স্ট্রিক্টলি আন-অফিশিয়াল।"

"তা তো বটেই। ও আরেকটা কথা স্যার, আমার তো গাড়ি নেই, আর বাপিবাবুকে তো প্রতিদিন আসতে বলতে পারি না।"

“আপনার সারথি এখানেই আছে,” বলে কাকে জানি ইন্টারকম-এ আসতে বললেন। এক মিনিটের মধ্যে গোলগাল বেঁটে মতো একজন ইউনিফর্মধারী কনফারেন্স রুমে এসে হাজির।

“এ হল সার্জেন্ট আর্মান্ডো গার্সিয়া। আর্মান্ডোই তদন্ত শুরু করেছিল। এখন থেকে অফিশিয়ালি আপনাকে সাহায্য করবে। যেখানে যাঁদের কাছে যেতে চান, ও নিয়ে যাবে।”

স্প্যানিশ পদবি, নামের উচ্চারণ হওয়া উচিত আর্মান্দো। তাই আর্মান্দো বলেই এখানে লিখছি। আর্মান্দোর উচ্চারণে একটা পরিষ্কার বিদেশি টান আছে। জ্যাক একেনবাবু সম্পর্কে আর্মান্দোকে কী বলেছে জানি না, কিন্তু অত্যন্ত সম্ভ্রম করে সে কথা বলছে দেখলাম। আরেকটা স্বভাব দেখে মজা লাগল। শুধু একেনবাবু নয়, সবার নামের আগেই একটা করে মিস্টার জুড়ছে। যাক গে, অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলো বাদ দিয়ে আসল কথায় আসি। জ্যাক একেনবাবুকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ধরিয়ে দিয়ে, কী একটা কাজে অদৃশ্য হল।

একেনবাবু আর্মান্দোকে বললেন, “আমি তো ব্যাপারটা সম্পর্কে বিশেষ প্রায় কিছুই জানি না, টেলিভিশনে যা বলা হয়েছে সেটুকুই শুধু জানি। একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেবেন স্যার?”

“নিশ্চয় মিস্টার একেন,” আর্মান্দো ওর নোটবই খুলে পড়ে পড়ে বলতে লাগল। “আজ সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিটে আমরা মিস্টার কিশোর বলে একজনের ফোন পাই। তিনি জানান ওঁর মনে হচ্ছে ওঁর বন্ধু মিস্টার অনিন্দ্য খুন হয়েছেন। কোথায়, প্রশ্ন করতে আমাদের ঠিকানা দেন। আমরা ওঁকে আমাদের না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলি। অকুস্থলে গিয়ে দেখি মিস্টার কিশোর বাড়ির বাইরে ভীষণ নার্ভাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দরজা খোলাই ছিল। ওঁকে বাইরে দাঁড়াতে বলে আমরা বাড়িতে ঢুকি। মিস্টার অনিন্দ্য সোফার কাছে মেঝেতে পড়ে আছেন, বুকের শার্ট রক্তে ভেজা, কার্পেটেও রক্ত। ঘরটা দেখে মনে হল না কোনো কিছু তছনছ হয়েছে। বাইরের ঘর, বাথরুম, কিচেন, হোম-অফিস, দুটো বেডরুম, সবগুলোই ঠিকঠাকই আছে। এটা ডাকাতি নয়। পুলিশের ডাক্তার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। রিগোর মর্টিস দেখে যা মনে হয়েছে গত রাত্রে সম্ভবত আটটা থেকে বারোটার মধ্যে কোনো এক সময়ে মৃত্যু হয়েছে। গুলি চালানো হয়েছে খুব কাছ থেকে। নাইন মিলিমিটার বুলেট। দরজার তালা অটুট। অর্থাৎ আততায়ীকে মিস্টার অনিন্দ্য চিনতেন। ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলেন। মিস্টার অনিন্দ্যর একটি কুকুর ছিল, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

“এখন পর্যন্ত আমরা শুধু মিস্টার কিশোরের সঙ্গেই কথা বলেছি। তাঁর বয়ান অনুসারে গতকাল ওঁদের এক বন্ধু, মিস্টার অরিন্দমের বিবাহবার্ষিকীর পার্টি ছিল উডব্রিজের নিউ হিলটন হোটেলে। মিস্টার অনিন্দ্যও নিমন্ত্রিত ছিলেন। মিস্টার কিশোরও সেই পার্টিতে ছিলেন। ন'টা বেজে গেছে তাও অনিন্দ্য আসছেন না দেখে মিস্টার কিশোর নিউ হিলটন থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে অনিন্দ্যকে ফোন করেন, কিন্তু ফোন বেজেই যায়। বাড়ি ফিরে রাত্রি বারোটার সময় আবার মিস্টার কিশোর মিস্টার অনিন্দ্যকে ফোন করেন, তখনও নো-রিপ্লাই। আজ অফিস যাবার পথে মিস্টার কিশোর মিস্টার অনিন্দ্যর বাড়িতে থামেন। মিস্টার কিশোরের কাছে মিস্টার অনিন্দ্যর বাড়ির চাবি থাকে। বেল বাজিয়ে কেউ খুলছে না দেখে উনি চাবি দিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে দেখেন দরজা খোলা। তখনই ঘরে ঢুকে মিস্টার অনিন্দ্যর রক্তাক্ত দেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফোন করেন।

"মিস্টার কিশোর অবশ্য ভেবেছিলেন অনিন্দ্যর পার্টিতে না আসার কারণ গত সপ্তাহে ওঁদের এক বন্ধু, মিস্টার ত্রিদিবের বাড়ির এক পার্টিতে ঝগড়ার ফল। সেখানে আরেক বন্ধু, মিস্টার অজয়ের সঙ্গে মিস্টার অনিন্দ্যর একটা বিশ্রী ঝগড়া মেটাতে অন্য এক বন্ধু, মিস্টার অরিন্দমও জড়িয়ে পড়েছিলেন।"

বেচারা আর্মান্দো! থেমে থেমে এই বাঙালি নামগুলো উচ্চারণ করতে হিমশিম খাচ্ছিল। "সরি, অনেকগুলো ক্যারেক্টার এখানে, নামগুলো কি আরেকবার শুনবেন মিস্টার একেন?"

"না না স্যার, আমি দিব্বি বুঝতে পারছি। আপনি বলে যান।"

"ও হ্যাঁ," নোটবুক খুলে, আর্মান্দো আবার শুরু করল। "মিস্টার অজয় আর মিস্টার অনিন্দ্য ঝগড়া করছিলেন। আর মিস্টার অরিন্দমও তাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মদ খেয়ে অবশ্য বন্ধুদের মধ্যে এ-রকম চেঁচামেচি আগেও হয়েছে। কিন্তু সেদিনের ওই ঝগড়াটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের। দু-জনে বেসমেন্টের পার্টিরুম থেকে বেরিয়ে ঝগড়া চালাতে ওপরের একটা ঘরে গিয়েছিলেন। ঝগড়ার কারণ মিস্টার কিশোর ঠিক জানেন না। মিস্টার অরিন্দমও ওপরে গিয়েছিলেন ওঁদের মিটমাট করাতে, কিন্তু পারেননি। মিস্টার অনিন্দ্য রাগ করে মিস্টার ত্রিদিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মিস্টার অজয় এত রেগে গিয়েছিলেন যে গর্জাচ্ছিলেন, 'আই উইল কিল দ্যাট স্কাউন্ড্রেল।' খানিক বাদে অবশ্য মিস্টার অজয় শান্ত হন, কিন্তু ঝগড়ার কারণটা বিশদ করেন না। প্রাইভেট ব্যাপার মনে করে কেউই আর চাপাচাপি করেননি।"

এবার নোটবই বন্ধ করে আর্মান্দো যোগ করল, "এ নিয়ে আর বিশেষ কিছু এগোয়নি, কারণ চিফ ওকে বলেছিলেন মিস্টার একেন তদন্তের দায়িত্ব নেবেন। তবে একজন সাসস্পেক্ট নিশ্চয় মিস্টার অজয়, কারণ তিনি মিস্টার অনিন্দ্যকে খুন করার কথা বলেছিলেন।"

"বুঝলাম স্যার। প্রথমত আমার মিস্টার কিশোরের কনট্যাক্ট নম্বর লাগবে। ভালো কথা, কুকুরটার খবর পাওয়া গেছে কি?"

"ও হ্যাঁ। একটু আগেই জানতে পেরেছি। কুকুরটা মিস্টার অনিন্দ্যর এক প্রতিবেশীর বাড়িতে আছে। প্রতিবেশীর মেয়েটি অনেক রাত্রে ওকে বাইরে দেখে বাড়িতে নিয়ে যায়। মিস্টার অনিন্দ্য যখন অফিসে থাকতেন, ওই মেয়েটিই কুকুরটিকে দেখাশোনা করত। দুপুরে খেতে দিত, হাঁটাত, ওর সঙ্গে খেলত। মিস্টার অনিন্দ্য ট্যুরে গেলে প্রতিবেশীর বাড়িতেই কুকুরটি থাকত। প্রতিবেশীর নাম ডনাল্ড ফোর্ড, মেয়েটির নাম আইলীন।"

"একটা কথা স্যার, এই প্রতিবেশী এতো রাত্রে কুকুরটা বাইরে ঘুরছে দেখে বাড়িতে ঢুকে খোঁজ করেনি?"

"এ-রকম আগেও ঘটেছে স্যার। মিস্টার অনিন্দ্য কুকুরকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে খুব দেরি করে বাড়ি ফিরেছেন। ওঁদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। কুকুরটা কান্নাকাটি করলে ওঁরা ঘরে নিয়ে আসেন। তবে একটা কথা প্রতিবেশীর মতে ন'টার সময়ও কুকুরটা বাইরে ছিল না। ওঁরা তখন বাইরে যাচ্ছিলেন। ফিরেছিলেন রাত এগারোটা নাগাদ। ধরে নিচ্ছি খুনি যখন ঘরে ঢুকেছিল, তখনই কুকুরটা নিশ্চয় বেরিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে খুনটা ন'টার পরে ঘটেছে।"

"এই দু-জনের নম্বর আমার লাগবে স্যার।"

আর্মান্দো আইলীন আর কিশোর দু-জনের নম্বরই দিল।

একেনবাবুর অনুরোধে আর্মান্দোই কিশোরকে ফোন করল। একেনবাবুর নাম করতেই

কিশোর বোধহয় বলল, "আমি ওঁকে চিনি।"

তারমানে দুর্গাপুজোতেই পরিচয় হয়েছিল, শুধু মনে করতে পারছিলাম না! আর্মান্দোর কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে একেনবাবু বললেন, "স্যার, কেমন আছেন?"

উত্তরটা অবশ্য শুনতে পেলাম না। সংক্ষেপে অনিন্দ্যর মৃত্যুর ব্যাপারে ওঁকে কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বুঝিয়ে বললেন। তারপর জানতে চাইলেন, অজয় আর অরিন্দমের ফোন নম্বরটা।

আর্মান্দোকে অজয়ের নম্বরটা দিয়ে বললেন, "এঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখানে বলতে পারলেই ভালো হয়।"

আর্মান্দো কিন্তু কনফারেন্স রুম থেকে অজয়কে ফোন করল না। নম্বরটা নিয়ে কনফারেন্স রুমের বাইরে যেতেই, আমি আস্তে করে একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি করা যায়? অজয় তো উডব্রিজে থাকে না!"

একেনবাবু কিছু বলার আগেই প্রমথ বলে উঠল, "নিউ ইয়র্কে তো করা যায়। ধরে নিচ্ছি নিউ জার্সিতেও যায়। না করা গেলে আর্মান্দোই বলবে, তুই এতো চিন্তা করছিস কেন!"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর্মান্দো ফিরে এল। "মিস্টার অজয় মিনিট পনেরোর মধ্যে এখানে আসছেন। আপনারা এখানেই বসুন। উনি এলেই আমি এখানে নিয়ে আসব।"

বসে বসে কী আর করব! মিনিট পনেরো ধরে আমরা কফি আর কিছু ডোনাট ধ্বংস করলাম। সত্যি কথা বলতে কী, খাচ্ছিলাম ঠিকই কিন্তু মনটা বিষণ্ণ। সাতদিন আগে যার বাড়িতে হইহই করে গল্প করে গেলাম, সে আজ নেই! আজ একেনবাবুর ডাক পড়েছে তার খুনিকে খুঁজে বার করার! বার বার অনিন্দ্যর মুখটা মনে পড়ছিল। সত্যি, আমাদের জীবনটা কী ফ্র্যাজাইল!

পনেরো মিনিটও বসতে হল না, আর্মান্দো অজয়কে নিয়ে ঘরে ঢুকল। চোখেমুখে খুবই অস্বস্তি, খানিকটা ভয়ও। পুলিশ স্টেশনের কনফারেন্স রুমে আমাদের দেখে দারুণ বিস্মিত! আর্মান্দো বলল, "মিস্টার একেন আমাদের কনসাল্টেন্ট ডিটেকটিভ, উনিই মিস্টার অনিন্দ্যর মৃত্যুতে তদন্ত করছেন। উনিই প্রশ্ন করবেন।"

আমার কেন জানি মনে হল একেনবাবু তদন্ত করছে শুনে অজয় একটু ভরসা পেল। বলল, "বিশ্বাস করুন একেনবাবু, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। এই কয়েক ঘণ্টা আগে কিশোর ফোন করে বলল অনিন্দ্যর ডেডবডি বাড়িতে পড়ে আছে! ও সেখানেই আছে, পুলিশকে খবর দিয়েছে। পুলিশ হয়তো আমাদের সবাইকেই জেরা করবে। আমি তখন অন্য বন্ধুদের ফোন করে খবরটা জানাই। তারাও আমার মতোই শক্‌ড্।"

"তা তো বুঝলাম স্যার, কিন্তু আপনি ফোন পেয়েও ওখানে গেলেন না যে?"

"আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনিন্দিতা, মানে আমার স্ত্রী বলল, 'তুমি পৌঁছোবার আগেই পুলিশ এসে জায়গাটা সিল করে দেবে। বরং তুমি বাড়িতেই থাকো, দরকার হলে পুলিশ নিশ্চয় সবার সঙ্গে কথা বলবে'।"

"বুঝলাম স্যার। আচ্ছা, গতকাল আপনাদের বন্ধুদের একটা পার্টি ছিল হিলটনে, ঠিক কি?"

"হ্যাঁ, অরিন্দমের ওয়েডিং অ্যানিভার্সারির পার্টি।"

"সেখানে অনিন্দ্যবাবুর আসার কথা ছিল না?"

"হ্যাঁ, আসার তো কথা ছিল...।"

"ধরে নিচ্ছি, উনি আসেননি।"

"না, আসেনি। ভেবেছিলাম কোনো বিশেষ কারণে হয়তো আটকা পড়েছে, যানজট, অফিসের কাজ, অসুস্থ বোধ করা, অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু ফোন করেও ওকে ধরতে পারা যাচ্ছিল না।"

"আপনি ফোন করেছিলেন স্যার?"

"না, আমি করিনি। আসলে..." অজয় একটু ইতস্তত করে বলল, "আগের সপ্তাহে অনিন্দ্যর সঙ্গে আমার একটু ঝগড়াই হয়েছিল। দু-জনেই ড্রিঙ্ক করে একটু হাই হয়ে গিয়েছিলাম। অনিন্দ্য রাগ করে পার্টি ছেড়ে চলেও গিয়েছিল।"

"ঝগড়াটা ঠিক কী নিয়ে হয়েছিল স্যার?"

"ওটা একটা পার্সোনাল ব্যাপার।"

"আপনি নাকি স্যার ওঁকে খুন করবেন বলেছিলেন?"

কথাটা শুনে অজয়ের মুখটা কালো হয়ে গেল। "ওটা কথার কথা, হাই হয়ে থাকলে উলটোপালটা অনেক কথাই তো এসে যায় মুখে।"

"তা তো বটেই স্যার," দেখলাম একেনবাবু এটা নিয়ে আর আলোচনা করলেন না।

"একটা প্রশ্ন স্যার, আপনি কি পার্টি চলার সময় সারাক্ষণই হিলটনে ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"একবারও বেরোননি স্যার?"

"একটু বেরিয়েছিলাম, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। হিলটনের স্টেশনারি শপ-এ ছিল না। তাই বাইরের একটা দোকানে গিয়েছিলাম।"

"ক'টা নাগাদ বেরিয়েছিলেন স্যার আর কতক্ষণ বাইরে ছিলেন?"

"দোকানটা কাছেই ছিল, 'স্টপ-এন-গো' মিনিট দশেকের পথও নয়। কখন বেরিয়েছি ঘড়ি ধরে বলতে পারব না। সাড়ে আটটা নাগাদ হবে।"

"কতক্ষণ বাইরে ছিলেন?"

"বড়োজোর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ। একটু দেরি হয়েছিল দোকানে ভিড় ছিল বলে।"

"ঠিক আছে স্যার। আপাতত এইটুকুই থাক। পরে হয়তো আপনার সঙ্গে আরও কিছু কথা বলতে হতে পারে।"

অজয় যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "একটা কথা স্যার...।"

অজয় দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

"বলুন।"

"আপনার কি কোনো হ্যান্ডগান আছে?"

"হ্যাঁ, আছে।" প্রশ্নটাতে অজয়ের চোখে বিস্ময় এবং ভয়, দুটোই।

উত্তরটা শুনে আমি অবাক হলাম। আমার পরিচিতদের মধ্যে কারোর হ্যান্ডগান আছে জানা ছিল না।

একেনবাবু কিছু বলার আগে অজয় বলল, "গতবছর আমাদের বাড়িতে একটা বার্গলারি হয়েছিল। আমার স্ত্রী খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তাই আত্মরক্ষার জন্য কিনেছিলাম।"

"তা তো বটেই স্যার। ঠিক আছে স্যার, পরে কথা হবে।"

অজয় চলে গেলে প্রমথ একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ঝগড়ার কারণটা 'পার্সোনাল' বলে এড়িয়ে গেল, আপনি চেপে ধরলেন না কেন?"

"কী লাভ হত স্যার, কিছু একটা বানিয়ে বলে দিতেন। ওগুলো তো ভেরিফাই করা

কঠিন।"

আমারও মনে হল, অতি সহজে অজয়কে একেনবাবু ছেড়ে দিলেন। আর্মান্দো বাংলা বোঝে না, কিন্তু এতো চট করে ইন্টারোগেশন শেষ হয়ে গেল দেখে ও-ও যেন একটু অবাক!

একেনবাবু আর্মান্দোকে বললেন, "আমি একটু অনিন্দ্যবাবুর বাড়িতে যেতে চাই। সেখান থেকে এক বন্ধুর বাড়ি যাব।"

একেনবাবু আর্মান্দোর সঙ্গে পুলিশের গাড়িতে উঠলেন। আমি প্রমথকে নিয়ে চললাম অনিন্দ্যর বাড়ির দিকে। বাড়ির ঠিকানা আমার জিপিএস-এ ঢোকানোই ছিল। পুলিশ স্টেশনের কাছেই। মিনিট দশেক লাগল পৌঁছোতে।

ড্রাইভয়েতে দুটো গাড়ি। একটা নিশ্চয় আর্মান্দোর। আরেকটা কার? আগের দিন ড্রাইভওয়েতে গাড়ি থামাতে না থামাতে যে থাবা বাগিয়ে গাড়ির ওপর উঠে গাড়ির দরজার কাচে নাক লাগিয়ে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছিল, আজকে সেই খুশ নেই। তার মালিক বা বাবা অনিন্দ্যও নেই। বাড়ির সামনের বারান্দাটা পুলিশের হলুদ টেপ দিয়ে আটকানো। সামনে দু-জন পুলিশ দাঁড়িয়ে। বুঝলাম দ্বিতীয় গাড়িটা ওদেরই কারোর।

আর্মান্দোর সঙ্গে একেনবাবুর কী কথা হয়েছে জানি না। একেনবাবু আমাদের অপেক্ষা করতে বলে আর্মান্দোর সঙ্গে হলুদ ফিতে সরিয়ে অনিন্দ্যর বাড়িতে ঢুকলেন। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। খানিক বাদেই বেরিয়ে এসে বললেন, "চলুন স্যার, দীপেনবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক।"

একেনবাবু গাড়িতে উঠতেই প্রমথ বলল, "কী ব্যাপার পুলিশের কাজ নিয়ে আমাদের পরিত্যাগ করলেন যে বড়ো?"

"কী যে বলেন স্যার, আপনারা সবাই আমার সঙ্গে তো আছেনই। আসলে আর্মান্দোর কর্তৃপক্ষ একটু ঝামেলা করছে ... ভয় পাচ্ছে পুলিশের লোক ছাড়া তদন্তে অন্য কেউ থাকলে পরে কোর্টে গিয়ে ঝামেলা হবে।"

ন্যায্য কথা। প্রমথও আর কথা বাড়াল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী বুঝলেন বাড়িতে ঢুকে?"

"জ্যাক ঠিকই বলেছে। মনে হয় না রবারি বলে।"

"তাহলে খুনটা হল কেন? কেই-বা করল?"

"কে জানে স্যার!"

"আপনার কি মনে হয় বন্ধুদের কেউ? একজন সাসপেক্ট তো অজয়।" প্রমথ বলল।

"তিনটে জিনিস দরকার স্যার, মোটিভ, অপরচুনিটি আর মিনস। যে গুলিতে অনিন্দ্যবাবুর মৃত্যু ঘটেছে সেটা যদি অজয়বাবুর হ্যান্ডগান থেকে বেরিয়ে থাকে, তাহলে মিনস আছে। মোটিভও তো আছে মনে হচ্ছে, তবে সেটা কতটা স্ট্রং পরিষ্কার নয়। কিন্তু অপরচুনিটি পাওয়া যাচ্ছে না, যদি অজয়বাবুর কথা সত্যি হয়। অজয়বাবু বাইরে ছিলেন মিনিট কুড়ি-পঁচিশের জন্য। নিউ হিলটন হোটেল থেকে অনিন্দ্যবাবুর বাড়ি প্রায় মিনিট পনেরোর পথ, যদি সেখানে সোজা গিয়ে খুনও করে আসেন, তাহলেও তিরিশ মিনিট।"

"যাহা পঁচিশ, তাহাই তিরিশ। আর অজয় যে ঠিক বলছে, তার প্রমাণ কী, সেটা তো জানতে হবে?"

"ঠিক স্যার।"

"এবার তাহলে কী করবেন?"

"কী আর করব স্যার, দীপেনবাবুর বাড়ি গিয়ে ওঁর সঙ্গে লাঞ্চ খাব।"

দীপেন চাইনিজ খাবার কিনে এনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বুঝতে পারছিলাম অনিন্দ্যর মৃত্যু ওকে খুবই নাড়া দিয়েছে। আমাদেরও খারাপ লাগছিল, কিন্তু চিলি চিকেন আর ফ্রায়েড রাইস-এর ডাক উপেক্ষা করা যায় না। দীপেন খুব অল্পই খেল। খেতে খেতেই একেনবাবু দীপেনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্যার, অজয়বাবু সম্পর্কে আপনি কী জানেন?"

"অজয়কে খুব ভালো করে চিনি বলব না। তবে এখানে এসে ওর বাড়িতেই প্রথম গিয়েছি। ওর স্ত্রী অনিন্দিতা যে দীপান্বিতার সঙ্গে কলেজে পড়ত বলেছিলাম বোধহয় আপনাকে।"

"হ্যাঁ স্যার, মনে হয় বলেছিলেন। তা কী করেন অজয়বাবু?"

"ইন্টারনেট সিকিউরিটির একটা কোম্পানিতে কাজ করে শুনেছি।"

"আচ্ছা, আপনি স্যার সেদিন এও বলেছিলেন... আপনার ফ্যামিলি বিরক্ত হন ওঁদের সঙ্গে মিশতে...।"

"ফ্যামিলি?"

"মানে তোর স্ত্রী দীপান্বিতা।" আমি বললাম, "একেনবাবু স্ত্রী-কে ফ্যামিলি বলেন।"

"ও আচ্ছা। আসলে দীপান্বিতা বেশি হই-হুল্লোড় পছন্দ করে না। শুনেছিলাম, বিচিত্রা ক্লাবের মধ্যেই অজয়দের একটা এক্সক্লিউসিভ গ্রুপ আছে। ওদের পার্টি, আড্ডা সব সেই গ্রুপের মধ্যে, আর পার্টিগুলো একটু ওয়াইল্ড হয়। মদ-টদ খেয়ে কে যে কী করে ঠিকঠিকানা নেই।"

"কার কাছ থেকে শুনেছিলেন স্যার?"

"অনিন্দ্যই কথায় কথায় একদিন বলেছিল।"

"অনিন্দ্যবাবু কি ওই গ্রুপে ছিলেন?"

"হ্যাঁ। তবে অনিন্দ্য অন্যদের সঙ্গেও আলাদা ভাবে মিশত। ইন ফ্যাক্ট, এখানে এসে অনিন্দ্যর বাড়িতেই আমরা সবচেয়ে বেশি গেছি। ট্যালেন্টেড ছেলে ছিল। রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসত। খুব ভালো স্কেচ করত। আমার আর দীপান্বিতার স্কেচ করেছিল একদিন। মিনিট পনেরোর মধ্যে আমাদের মুখটা এত সুন্দর করে আঁকল যে অবিশ্বাস্য!" বলতে বলতে চোখটা ওর সজল হলে উঠল।

"ওর নেগেটিভও নিশ্চয় কিছু ছিল স্যার।"

"তা ছিল, কাণ্ডজ্ঞান একটু কম।"

"মানে স্যার?"

"পেটে কথা রাখতে পারত না। যেটা বলার নয়, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সেটা বলে ফেলত। বিশেষ করে পেটে একটু মদ পড়লে তো কথাই নেই। দীপান্বিতা তাতে অনেক সময়ে বিরক্ত হত, কিন্তু জানত ওর মনটা ভালো ছিল। সেইজন্য আমাদের যাতায়াতটা বন্ধ হয়নি।"

"আর কিশোরবাবু? তিনিও কি ওই গ্রুপের মধ্যে ছিলেন?"

"কোন গ্রুপ?"

"অজয়বাবুদের।"

"হ্যাঁ। কিশোরকে আমি তেমন চিনি না, তবে ও অনিন্দ্যর খুব ভালো বন্ধু ছিল, আর ভালো ছবি তুলত।"

"হ্যাঁ, উনিই স্যার অনিন্দ্যবাবুর ডেডবডি আবিষ্কার করেছিলেন।"

"অজয় তাই বলল। আরও বলল, আপনি তদন্ত করছেন এই মার্ডারের। একটু আগে ওর সঙ্গে থানায় কথাও বলেছেন।"

"তা একটু সাহায্য করছি স্যার।"

"অজয় কিন্তু খুব নার্ভাস, আপনি ওর আর অনিন্দ্যর ঝগড়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন দেখে।"

"আরে না স্যার ঝগড়া তো সব সময়েই হয় বন্ধুদের মধ্যে।"

"তা না, অজয় বলল, সবাই একটু হাই হয়েছিল ত্রিদিবের বাড়িতে, সেইজন্য খুন-টুন করার কথা তুলেছিল... আসলে ড্রাঙ্ক হলে কে যে কী বলে! ওর খুব চিন্তা আপনি সেটা কী ভাবে নিয়েছেন। এমনিতে ও আমাকে ফোন করে না। আজ এই নিয়ে দু-বার। বাপি আর প্রমথ আমার ছেলেবেলার বন্ধু আর আপনারা সবাই একসঙ্গে থাকেন জেনেই ফোনটা করেছিল মনে হয়।"

"উনি খামোখা ভয় পাচ্ছেন স্যার। তবে আরও দুয়েকটা প্রশ্ন ছিল... ওঁর সঙ্গে দেখা হলে ভালোই লাগত। আর থানায় প্রশ্ন করছি না বলে কথা বলতে উনি হয়তো রিল্যাক্স বোধ করবেন।"

"দাঁড়ান, দেখছি বাড়িতে আছে কিনা।" বলেই দীপেন ওয়াশরুমে গেল মুখ ধুতে। একটু বাদেই ফিরে এসে বলল, "অজয়কে ধরার চেষ্টা করলাম। একটা জরুরি দরকারে কাজে গেছে। অনিন্দিতা, মানে ওর স্ত্রী আপনাকে বিশেষ করে আসতে বলল। ও ভীষণ নার্ভাস, কিশোর ছাড়া একমাত্র অজয়কেই পুলিশ জেরা করছে দেখে!"

অজয়ের অ্যাপার্টমেন্ট খুব একটা দূরে নয়। আসলে মিডলসেক্স কাউন্টির ইস্ট ব্রান্সউইক, ব্রান্সউইক, র-ওয়ে ইত্যাদি শহরগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে একের পিঠে এক হয়ে রয়েছে। অনিন্দিতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পুজোয় দেখা হয়েছিল। চেহারাটা আবছা মনে ছিল। পুজোয় শাড়ি পরেছিলেন, আজকে জিনস আর মেরুন রঙের ট্যাঙ্ক টপ। প্রসাধন ছাড়াই আকর্ষণীয় চেহারা, তবে বোঝা যাচ্ছে খুবই নার্ভাস।

"অজয়কে ফোন করে বললাম আপনারা আসছেন। এমনিতে সোমবার ওর কাজের চাপ বেশি... তারওপর সকালে পুলিশ স্টেশনে যেতে হল। তাও চেষ্টা করবে আসতে।"

"না না, তার কোনো দরকার নেই ম্যাডাম।"

'ম্যাডাম' শুনে সবার যা রিয়্যাকশন অনিন্দিতার সেটাই হল।

প্রমথ বলল, "ওঁকে ঠেকাতে পারবেন না। শিশু বয়সের অভ্যাস।"

একটু যেন হাসলেন অনিন্দিতা। তারপর একটু থেমে থেমেই বললেন, "আপনারা বোধহয় ওকে সন্দেহ করছেন।" বলেই একেনবাবুর দিকে এক ঝলক তাকালেন।

"আরে কী মুশকিল ম্যাডাম, এতটুকু নয়! প্রশ্ন তো করতেই হয়।"

"হ্যাঁ ও বলল, অনিন্দ্যর সঙ্গে ওর ঝগড়া নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন।"

"তা চেয়েছিলাম, ম্যাডাম।"

"আসলে আমাদের পার্টিতে কেউ কেউ একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলে। অজয়ও ব্যতিক্রম নয়। তখন সাধারণ ব্যাপারও অসাধারণ হয়।"

"আপনি কি জানেন ম্যাডাম ব্যাপারটা কী?"

"আমি ঠিক জানি বলতে পারব না, তবে অনুমান করছি।"

"অনুমানটাই বলুন ম্যাডাম।"

দেখলাম অনিন্দিতা ইতস্তত করছেন। "দেখুন আমার এটা বলতে অসুবিধা নেই, কিন্তু

অজয়ের পক্ষে এটা কারোর কাছ থেকে শোনা অত্যন্ত হার্টফুল।”

“ম্যাডাম, বুঝতে পারছি খুবই পার্সোনাল ব্যাপার, না বললেও চলবে।”

“না, আমি বলব। অজয়ের কাছে এটা অসম্মান হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা পরিষ্কার না হলে অজয়ের এই রাগের কারণটার অন্য রকম মানে করে ওকে এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হবে।” ...হঠাৎ অনিন্দিতা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, নির্বাক হয়ে থাকাই ভালো।

একটু চুপ করে একটা বড়ো শ্বাস নিয়ে অনিন্দিতা শুরু করল, “আমার শ্বশুরমশাইয়ের মেয়েদের ব্যাপারে একটা দুর্নাম ছিল। অজয় একজনকে মাসিমা বলত, পরে জেনেছি তিনি ছিলেন শ্বশুরমশাইয়ের রক্ষিতা। মাসিমা বাড়িতে আয়া হয়ে এসেছিলেন আমার অসুস্থ শাশুড়ির সেবা করতে। অজয়ের বয়স যখন বছর পাঁচেক শাশুড়ি মারা যান। শাশুড়ির মৃত্যুর পরও মাসিমা বাড়িতে থেকে অজয়কে বড়ো করেন। আমার বিয়ের আগে আমাদের বাড়ির ধারণা ছিল উনি শাশুড়িমায়ের দূর সম্পর্কের দিদি বা বোন। যাহোক এসব কথা এখানে কারোর জানার কথা নয়। সেদিন পার্টিতে সবাই একটু ড্রাঙ্ক হয়েছিল। হঠাৎ কে আলোচনা শুরু করল মনে নেই... বিষয়টা হল, কেউই জোর করে বলতে পারে না কে তার আসল বাবা। শুধু তার মা-ই জানে ছেলের আসল বাবা কে। খুবই সিলি কথাবার্তা... হাসিঠাট্টা দিয়েই শুরু হয়েছিল। এমন সময়ে কে জানি বলল, ‘যাক, আসল মা কে জানলেই তো হল।’ কিছুর মধ্যে কিছু নয়, অনিন্দ্য হঠাৎ অজয়কে বলল, ‘কিন্তু অনেকে তো জানে না তার আসল মা কে? সেক্ষেত্রে?’ অজয় বলল, ‘হোয়াট ডু ইউ মিন?’ অনিন্দ্য বলে উঠল, ‘মাসিমা যদি মা হয়?’ এই নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু। কে জানি অজয়কে এর মধ্যে বোঝাবার চেষ্টা করল, ‘তুই এটা পার্সোনালি নিচ্ছিস কেন, তোর বাপ নিয়ে তো প্রশ্ন তুলছে না?’ এরপর আর তর্কাতর্কি নয়, রীতিমতো চিৎকার, গালাগাল আর ধাক্কাধাক্কি! আমরা মেয়েরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না। ত্রিদিব আর অরিন্দম দেখছিলাম ওদের সামলাবার চেষ্টা করছে। ‘এই আস্তে, কী হচ্ছে মেয়েদের সামনে!’ কে কার কথা শোনে!

এরপর অজয় যখন অনিন্দ্যকে প্রায় টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, ত্রিদিব অরিন্দমকে পাঠাল ওদের সামলাতে। খানিক বাদে দেখি অনিন্দ্য একা ঘরে এসে ওর কোটটা নিয়ে কাউকে কিছু না বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।”

“অজয়বাবু তখন কোথায় ছিলেন ম্যাডাম?”

“দরজার ঠিক বাইরে। অরিন্দম তখনও অজয়কে শান্ত করছে।”

“তখনই কি অজয়বাবু বলেছিলেন, ‘আই উইল কিল দ্যাট স্কাউন্ড্রেল’?”

“হ্যাঁ, যখন অনিন্দ্য দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে।”

“কিশোরবাবু তখন কোথায় ছিলেন?”

“কিশোর পার্টির ছবি তুলছিল। ও খুব ছবি তুলতে ভালোবাসে, আমাদের সঙ্গেই বসেছিল। ত্রিদিবও আমাদের সঙ্গে ছিল। ও হোস্ট, হোস্টের দায়িত্ব পালন করছিল।”

একেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “ম্যাডাম, আপনি যে কথাটা আমাদের বললেন। এটা কি এখানে আর কেউ জানে?”

“কোন কথাটা?”

“এই অজয়বাবুর মাসিমার ব্যাপারটা।”

“কারোরই তো জানার কথা নয়,” অনিন্দিতা বলল, “এখানকার সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় এদেশে এসে।”

“আমি তো শুনেছিলাম দীপান্বিতা ম্যাডাম, মানে দীপেনবাবুর স্ত্রী আপনার সঙ্গে কলেজে পড়তেন?”

“ও হ্যাঁ, কিন্তু ও আমাকে চিনত বিয়ের আগে। এসব নিয়ে ওর সঙ্গে কোনো কথা আমার হয়নি।”

দীপান্বিতার প্রসঙ্গ আসায় দীপেন দেখলাম অস্বস্তি বোধ করছে।

“তোমাকে কি দীপান্বিতা কিছু বলেছিল এ বিষয়ে?” অনিন্দিতা প্রশ্ন করল দীপেনকে।

“না, না, আমি কিছুই জানি না,” ব্যস্ত হয়ে জবাব দিল দীপেন, “দীপান্বিতা কিছুই বলেনি এ ব্যাপারে।”

একেনবাবু দীপেনের উত্তর শুনে অনিন্দিতাকে প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা, আপনাদের ক’টা গাড়ি ম্যাডাম?”

অনিন্দিতা অবাক হয়ে তাকাল প্রশ্নের পারম্পর্য বোঝার চেষ্টা করতে।

“ক’টা গাড়ি!”

“হ্যাঁ, ম্যাডাম। এখানে, মানে নিউ জার্সিতে তো শুনেছি সবারই দুটো গাড়ি। এখানে বাস-টাস তো বেশি চলে না।”

“হ্যাঁ, আমাদের দুটো গাড়ি।”

“কোনটা অজয়বাবু চালান?”

“মার্সিডিজটা অজয় চালায়। একসঙ্গে কোথাও গেলে ওটাই আমরা নিই। আমি নিজে ছোটো গাড়িটা চালাই□ সুবারু।”

“ম্যাডাম আপনার বাড়ির ঠিক সামনে তো দেখলাম একটা মার্সিডিজ।”

“ও হ্যাঁ, অজয় আজকে ছোটো গাড়িটা নিয়ে গেছে।”

“থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাডাম। পুলিশের একজন হয়তো একবার আসবে। তবে আমাকে যা বলেছেন, তা আবার বলার দরকার নেই। আমি শুধু একবার কিশোরবাবুর কাছে যাব। উনি কি খুব দূরে থাকেন?”

“না, না, একেবারেই না। আজকে ওকে পাবেনও, অফিস যায়নি। একটু আগেই আমার সঙ্গে কথা হল। আপনি একবার ফোন করুন না, যাতে বাড়িতে থাকে। ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে?”

“হ্যাঁ, ম্যাডাম। থ্যাঙ্ক ইউ, আমরা আজ আসি।”

একেনবাবুর পিছন পিছন আমরা বেরিয়ে এলাম। একেনবাবু কিশোরকে ফোন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখন আসতে পারেন কিনা। উত্তর নিশ্চয়, হ্যাঁ।

একেনবাবু আমাদের বললেন, “এক সেকেন্ড স্যার, আমি আর্মান্দো সায়েবকে একটা ফোন করছি।” বলে আমাদের থেকে একটু আড়ালে গিয়ে আর্মান্দোর সঙ্গে দু-একটা কথা বললেন। ফিরে এসে দীপেনকে বললেন, “আপনার তাড়া নেই তো স্যার, তাহলে চলুন, কিশোরবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।”

“না, না, চলুন। এমনিতেই কিছু করবার আজ মন নেই।”

।। ৭ ।।

কিশোর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ও-ও মনে হল সকাল থেকেই বিধ্বস্ত হয়ে

আছে। বার বার বলল, "কী যে হল, কিছু বুঝতে পারছেন একেনবাবু?"

"কনফিউসিং তো বটেই স্যার। তবে কি না আমি এসেছি, আপনার কাছে কিছু ছবি দেখতে।"

"মানে?"

"মানে স্যার, আমি শুনেছি আপনি খুব ভালো ফটোগ্রাফার। যেখানেই যান ছবি-টবি তোলেন।"

"ভালো ফটোগ্রাফার কিনা জানি না, ছবি তোলা আমার বহুদিনের হবি। এখন তো মোবাইলেও ভালো ছবি তোলা যায়। ভালো ক্যামেরারও দরকার হয় না।"

"আমি স্যার ছবি-টবি সে-রকম বুঝি না, আমি এসেছি শুধু পার্টির ছবি দেখতে?"

"কোন পার্টির?

"অরিন্দমবাবুর অ্যানিভার্সারির পার্টি। তুলেছিলেন ছবি সেখানে?"

"হ্যাঁ, তুলেছি... এই তো, বলে আলমারি থেকে ডিজিট্যাল ক্যামেরাটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, প্রায় চল্লিশটা ছবি তুলেছিলাম সেদিন।"

"সব ছবি আপনি তুলেছেন?"

"সব। এই ক্যামেরা আমি কাউকে ধরতে দিই না। কোনটে দেখতে চান?

"প্রথম দিকের ছবিগুলো। যদি অজয়বাবুর কোনো ছবি থাকে সেখানে?"

"আছে।" বলে ক্যামেরা থেকে খুঁজে খুঁজে ছবিগুলো বার করতে থাকল। প্রায় পাঁচটা ছবি। আলাদা নয়, গ্রুপের মধ্যে। ডার্ক স্যুট পরা অজয়, খুব সুন্দর ছবি। এগুলোকে একটু বড়ো করা যায় না?"

"কেন যাবে না? নিন, এইটে ক্লিক করতে থাকুন, আর এই বাটনটা ছবিকে সেন্টারিং করার জন্য। আর এইটে নেক্সট, এইখানে ক্লিক করলে পরের ফ্রেমের ছবিটা দেখতে পাবেন।"

"ক্যামেরাটা ধরব স্যার... মানে আপনি যে একটু আগে বললেন...।"

কিশোর এক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝল। তারপর একটু হেসেই বলল, "সেটা ছবি তোলার ব্যাপারে, ছবি দেখার ব্যাপারে নয়।"

প্রমথও একেনবাবুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। একেনবাবু ঠিক কী দেখতে চান, বুঝলাম না। কিন্তু খুব মন দিয়ে ছবিগুলো দেখতে থাকলেন। মাঝে মাঝে এত ম্যাগ্নিফাই করে ফেলছিলেন যে ছবির ছবিত্ব বলে কিছু থাকছিল না। হঠাৎ ছবি দেখা বন্ধ করে জিজ্ঞস করলেন, "ভালো কথা স্যার, অজয়বাবু নাকি কিছুক্ষণের জন্য পার্টি ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। সিগারেট এখনও ছাড়তে পারছে না। মাঝে মাঝেই ওকে ধুয়ো গিলতে হয়, বারণ করলেও শোনে না।"

"কতক্ষণ বাইরে ছিলেন উনি?"

"এক্স্যাক্টলি বলতে পারব না। না দাঁড়ান, বেরোনোর আগে আমাকে বলে গিয়েছিল। তখন সম্ভবত সাড়ে আটটা। তার একটু আগেও হতে পারে। কারণ আমার মনে আছে, হিলটনের কনভেনিয়েন্ট স্টোর-এ পায়নি। তাই ওকে বলেছিলাম, তাড়াতাড়ি যেতে। স্টপ-এন-গো, ন'টায় বন্ধ হয়ে যায়। যদি সিগারেট ওখানে না পায় তাহলে আরও দূরে যেতে হবে।"

"কখন ফিরেছিলেন?"

"সাড়ে ন'টার অনেক আগেই হবে। কারণ অরিন্দমদের নাইন্থ অ্যানিভার্সারির কেক-

কাটিং ঠিক সাড়ে ন'টার সময় হবে প্ল্যান ছিল।"

"আপনার ঠিক মনে আছে, সাড়ে আটটায় বেরিয়েছিলেন?"

"সেটাই ধারণা, কিন্তু জোর করে বলতে পারব না, একটু অনুমান করছি। তাড়াতাড়ি ওকে যেতে বলেছিলাম, এটুকু মনে আছে। আর সাড়ে ন'টার আগে ফিরেছিল।"

"ঠিক আছে কেক কাটার ছবিগুলো দেখান।"

"নেক্সট বাটনটা ক্লিক করতে থাকুন পেয়ে যাবেন।"

"ও হ্যাঁ, তাই তো স্যার।"

একেনবাবু ক্লিক করে করে ছবিগুলো দেখছেন, মাঝে মাঝে খুট খুট করে এনলার্জ করছেন। আমার কিছুই করার নেই। সময় কাটাবার জন্য কিশোরের বইয়ের র‍্যাকের দিকে মন দিলাম। কিশোর মনে হল ট্র্যাভেল বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠক। সারা র‍্যাক জুড়েই ট্র্যাভেল-এর বই। আমি ইজরায়েল ট্র্যাভেল-এর বইটা তুলে পাতা উলটোতে থাকলাম। একটু বাদে শুনি একেনবাবু জিজ্ঞেস করছেন, "আচ্ছা স্যার, এই ছবিগুলো কি আমায় ইমেল করতে পারেন?"

"সবগুলো?" কিশোরের গলায় একটু যেন বিস্ময়।

"সবগুলো তো অনেক সময় লাগবে। আপনি বরং ত্রিদিববাবুর, অরিন্দমবাবুর, অজয়বাবুর ছবিগুলো পাঠান। প্রথম দিকের আর কেক কাটার পরের দিকের।"

"আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা বলুন।"

অ্যাড্রেস বলা মাত্র কিশোর খুট খুট করে ছবিগুলো সিলেক্ট করে জিজ্ঞেস করল, "কী রকম রেসলুশন চান?"

"যত বেশি হয়, ততোই ভালো।"

"ঠিক আছে।" একটু বাদেই বলল, "চলে গেছে সব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।"

"আর আপনার সময় নষ্ট করব না। শুধু আর কয়েকটা প্রশ্ন, আপনি কি সারাক্ষণই পার্টিতে ছিলেন?"

"হ্যাঁ।

"শেষবার, মানে আজকে সকালটা বাদ দিলে... কবে গিয়েছিলেন অনিন্দ্যবাবুর বাড়িতে?"

"দিন দশেক আগে।"

"অজয়বাবু আর অনিন্দ্যবাবুর ঝগড়ার পর যাননি?"

"না, অফিসের কাজে দিন তিনেকের জন্য মিশিগান যেতে হয়েছিল। ফিরেছি বৃহস্পতিবার। ক্লান্ত ছিলাম, তবে ফোনে কথা হয়েছিল। তখনই বলল ও শুক্রবার পার্টিতে আসবে না। আমি অনেক বোঝানোর পর বলল, ঠিক আছে আসবে।"

"ঝগড়ার কারণটা জানতেন স্যার?"

"ফ্র্যাঙ্কলি না। সিলি কথাবার্তা হচ্ছিল। হঠাৎ অজয় চটে যায়। প্রাইভেট কোনো ব্যাপার নিশ্চয়, কিন্তু অতো রেগে যাবার কী কারণ বুঝিনি।"

"ও আরেকটা কথা স্যার, ত্রিদিববাবু আর অরিন্দমবাবুর নম্বরটা জানি না। আপনি একটু দেবেন?"

"নিশ্চয়।" কিশোর ফোন থেকে বার করে দুটো নম্বরই দিল।

"জানি না, আজ ওঁদের পাব কিনা..."

"অরিন্দমকে পাবেন না। দু-দিনের ছুটি নিয়ে ওরা খুব ভোর বেলায় ওয়াশিংটন ডিসি-

তে গেছে। আমি যখন অনিন্দ্যর খবর জানাতে ফোন করেছি, তখন ওরা মেরিল্যান্ডে। তবে ত্রিদিবকে অফিসে পাবেন। ওর অফিস কাছেই। বাড়িও অফিস থেকে দূরে নয়। ও সাতদিনই কাজ করে।"

"অফিসটা কোথায়?"

"আমি অফিস বিল্ডিংটা জানি, অনেকগুলো অফিস ওখানে। ঠিক কোনটা জানি না।" দীপেন বলল।

"চেনার কোনো অসুবিধা নেই।" কিশোর বলল। "রিসার্ভ পার্কিং স্পেস-এ যেখানে অ্যালফা রোমিও গাড়ি দেখবেন, তার সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলেই প্রথম অফিস হল ত্রিদিবের।"

অ্যালফা রোমিও নামটা বোধহয় একেনবাবু আগে শোনেননি। আমি বললাম, "খুব এক্সপেনসিভ গাড়ি, এই অঞ্চলে বেশি নেই।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, এখন চলি, পরে কথা হবে।" বলে কয়েক পা গিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন।

"কাল পার্টি থেকে কখন ফিরলেন স্যার?"

"রাত সাড়ে এগারোটায়।"

"একা?"

"হ্যাঁ, একাই। মানে অজয় আমার সঙ্গে ছিল। অরিন্দম আর কেতকী খুব সকালে ডিসি চলে যাবে বলে আগের দিনই অজয় আর আমাকে বলে রেখেছিল পার্টির শেষে ক্লিন-আপ-এ হেল্প করতে। আমরা তাই থেকে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে অজয়কে নামিয়ে বাড়ি ফিরি।"

"অনিন্দিতা ম্যাডাম?"

"ও অন্য কারো কাছ থেকে রাইড নেয়। সবাই তো আমরা কাছাকাছি থাকি।"

"তা তো বটেই স্যার।" বলে চলে যাবার জন্য আবার পা বাড়ালেন। তারপর একটু মাথা চুলকে আবার ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আপনার তো স্যার আজ অফিস ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আপনি তো স্যার যাননি?"

"আসলে আমি অফিসেই যাচ্ছিলাম। অনিন্দ্যকে কেন গত রাতে ফোনে ধরতে পারিনি মাথায় ছিল। তাই অফিস যাবার পথে ওর বাড়িতে থেমেছিলাম। তারপর ওই ভয়াবহ দৃশ্য! প্রথমে পুলিশে ফোন করি, তারপর অফিসেও জানিয়ে দিই যে আসতে পারব না... বন্ধু খুন হয়েছে।"

"আপনি জানতেন স্যার যে, অনিন্দ্যবাবু খুন হয়েছেন!"

"মানে?"

"আত্মহত্যাও তো হতে পারে স্যার?"

কথাটা শুনে কিশোর কেমন জানি হতবাক হয়ে গেল!

"মানে, আমি...।"

"ঠিক আছে স্যার, আপনি আপনার অনুমানের কথা বলেছেন, তাই তো?"

কিশোর মাথা নাড়ল।

কিশোরবাবুকে আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে একেনবাবু বেরিয়ে এলেন। আবার আর্মান্দোকে ফোন করলেন􏰀 এবারও আড়ালে গিয়ে। মনে হল বোধহয় দীপেনকে

জানাতে চান না কথাগুলো। আমার আর প্রমথর কাছে এভাবে কিছু গোপন করেন না।

বিকেল প্রায় চারটে। একেনবাবুকে বললাম, "এরপর বেশি দেরি করলে টানেল বা হাইওয়ে যাই নিই না কেন ট্র্যাফিক জ্যামে পড়ব।"

"না না স্যার, আমরা দীপেনবাবুর বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে পড়ব।"

"কালকে এখানে আসবেন কী করে, আমার কিন্তু কালকে ক্লাস!"

"স্যার, কালকের কথা কালকে। এখন তো বাড়ি যাই।"

দীপেন চা খেয়ে যেতে বলল। কিন্তু ওকে 'না' বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ফেরার পথে প্রমথ বলল, "সত্যি গা জ্বলে যায়, গণ্ডমূর্খ ব্যাটা ত্রিদিব অ্যালফা রোমিও চড়ছে, আর আমাকে বাপির এই ঝ্যাড়ঝ্যাড়ে টয়োটাতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যেতে হচ্ছে!"

"দেখছেন একেনবাবু, আমার গাড়িতে যাচ্ছে আবার গালমন্দও করছে।"

"এই গাড়ি স্যার কিছুমাত্র খারাপ না। ফাংশানাল স্যার, গাড়ি তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার জন্য। দিব্যি তো চলে এলাম স্যার নিউ জার্সিতে, এখন আবার ফিরেও যাচ্ছি।"

"থাক, আর বাপিকে তেল মারতে হবে না। কাল থেকে আপনি অন ইওর ওউন, বাপির ক্লাস আছে।"

"জানি তো স্যার, ওদের বলে দিয়েছি। ওরা আজকের আসার খরচাও দেবে।"

"বাঃ। ওটা আবার ঝেঁপে দেবেন না, বাপিকে দিয়ে দেবেন।"

"কী যে বলেন স্যার, ঝাঁপব কেন?"

"না, এই প্রসঙ্গটা আগে তোলেননি বলে একটু সন্দেহ হচ্ছিল।"

প্রমথটা ইদানীং প্রায়ই সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমি ধমক দিলাম, "তুই চুপ করবি?"

"বেশ করব। তোরই উপকার করছিলাম। না চাইলে করব না।"

"আচ্ছা একেনবাবু, লুকিয়ে লুকিয়ে আর্মান্দোর সঙ্গে কী কথা বলছিলেন? আর লুকিয়ে লুকিয়ে কেন? আমাদের বিশ্বাস করেন না?"

"কী যে বলেন স্যার, আপনাদের বিশ্বাস না করলে আমার চলে?"

"ধ্যাত্তেরিকা, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নে হয় না। উত্তরটা দিন।" প্রমথ ধমক লাগাল।

"কয়েকটা জিনিস স্যার। এক হল ম্যাডাম অনিন্দিতার কাছ থেকে অজয়বাবুর হ্যান্ডগানটা নিয়ে একটু পরীক্ষা করা... অনিন্দ্যবাবুর গায়ে লাগা বুলেট ওই হ্যান্ডগান থেকে বেরিয়েছিল কিনা, আর...।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান," আমি একেনাবুকে থামিয়ে দিলাম। "আপনি কি অজয়কে সন্দেহ করছেন?"

"মোটিভ তো একটা আছে স্যার, কিন্তু কত জোরদার সেটা জানি না।"

"সেটা তো এক, আর?"

"আর স্যার জানতে, অনিন্দিতা ম্যাডামের মনে আছে কিনা, কতক্ষণ অজয়বাবু পার্টি ছেড়ে বাইরে ছিলেন।"

"হাউ অ্যাবাউট কিশোর? ওকি ধোয়া তুলসি পাতা?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"কিশোরবাবু তো কিছু করেছেন বলে মনে হয় না।"

"কারণ?"

"ওই যে ছবিগুলো দেখলাম।"

"তাতে কী হল?"

"চল্লিশটা ছবি স্যার, তিন-চার মিনিট অন্তর অন্তর তোলা পার্টির ছবি। নিজেই ছবি তোলেন। আমি টাইম স্ট্যাম্পগুলো দেখেছি স্যার। উনি ক্লিয়ার। কোথাও কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের জন্য যাননি।"

"কয়েকটার মধ্যে মাত্র দুটোর উত্তর পেলাম। আর কী জিজ্ঞেস করলেন আর্মান্দোকে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ও হ্যাঁ, গাড়িগুলোও একটু চেক করতে বললাম। 'স্টপ-এন-গো'-র সিকিউরিটি ক্যামেরাও চেক করতে বললাম ক'টার সময় অজয়বাবু ওখানে পৌঁছেছিলেন বা আদৌ ওখানে গিয়েছিলেন কিনা দেখতে।"

"গাড়ি চেক করতে! তার মানে কী?

"স্যার সব কিছুরই কি মানে হয়! বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!"

"আপনি মশাই সামথিং।"

আমাদের বাড়ি পৌঁছোতে পৌঁছোতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগল। আজকের পুরো দিনটাই গেল। আমার তবু ক্লাস ছিল না। প্রমথকে ওর ল্যাব ফাঁকি দিতে হল। সেটা এমন কোনো বিরাট ব্যাপার নয়। উইক এন্ডে ও যা কাজ করে সেখানে একদিন না যাওয়াটা কিছুই নয়। তাও খোঁটা দিল একেনবাবুকে। "আমার একটা দিন তো নষ্ট করলেন, কাজ যে কী এগিয়েছেন কিছুই তো বুঝলাম না!"

"এগুলো কি স্যার একদিনে হয়, গোয়েন্দাগিরির কাজ তো ঘড়ি ধরে চলে না।"

"আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, বাপির আর আমার কাজ শুধু ঘড়ি ধরে হয়। টাইম পাঞ্চ করে কলেজে ঢুকি আর টাইম পাঞ্চ করে বেরোলেই হয়ে যায়?"

"কী যে বলেন স্যার, আপনারা বিদ্বান লোক, আপনাদের কাজ তো সব মাথার মধ্যে।"

"থাক আর কথা ঘোরাতে হবে না। আপনি কথার উত্তরটা দিলেন না। এখন পর্যন্ত কাউকে সন্দেহ হয়?"

"আজকে কিছুটা জানতে পারব স্যার। তখনই জানাব স্যার।"

"সেটা তো জানি তখন কী বলবেন।"

"কী বলব স্যার?"

"বলবেন, আমি আর বাপি সন্দেহের ঊর্ধ্বে!"

"প্রমথবাবু না স্যার, সত্যি!" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন একেনবাবু।

"একটু কফি কর তো, বাজে না বকে," আমি প্রমথকে ধমকালাম।

"তুই কর না, অর্ডার না দিয়ে!"

"আমি করলে তোরা কেউই মুখে দিতে পারবি না।"

"এই জ্ঞানটা অন্তত হয়েছে," বলে প্রমথ কিচেনে গেল।

এমন সময় একেনবাবুর ফোন।

"হ্যান্ডগানটা পেয়েছেন স্যার? ওটাই ব্যবহার করা হয়েছে? ব্যালিস্টিক রেজাল্ট কবে পাবেন?... 'স্টপ-এন-গো'-র সিসিটিভি চেক করেছেন স্যার? গাড়ি?... "

অর্থাৎ আর্মান্দো বা জ্যাকের সঙ্গে কথা বলছেন। একটু বাদেই কথা শেষ করে ফিরে এলেন।

"কী বলল আপনার চিফ জ্যাক?"

"চিফ জ্যাক না স্যার, মিস্টার আর্মান্দো। অনিন্দিতা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলেছেন। অনিন্দিতা ম্যাডামই হ্যান্ডগানটা বার করে পুলিশকে দিয়েছেন। গ্লক ১৯ হ্যান্ডগান-এ বারুদের গন্ধ লেগেছিল। বোঝাই যাচ্ছে ওটা ব্যবহার করা হয়েছিল দু-একদিনের মধ্যে।

কিন্তু কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেলেনি ম্যাডামের আঙুলের ছাপ ছাড়া। তবে বডিতে যে গুলি লেগেছে, সেটা এই হ্যান্ডগান থেকে ছোঁড়া হয়েছে কিনা, সেটা বার করতে ব্যালিস্টিক টেস্ট করতে হবে, সময় লাগবে।”

“তার মানে তো কুকীর্তিটা অজয়ই করেছে।”

“কে জানে স্যার...”

“‘কে জানে স্যার’ মানে?”

“মানে হ্যান্ডগানটা অজয়বাবুর, সম্ভবত সেটা ব্যবহারও করা হয়েছে, কিন্তু প্রমাণ করতে হবে অজয়বাবু অকুস্থলে ছিলেন এবং তিনিই গুলি করেছেন।”

“কী উলটোপালটা বকছেন মশাই? অজয়ই তো অদৃশ্য হয়েছিল পার্টি থেকে... হয়নি?”

“তা হয়েছিলেন স্যার। কিন্তু উনি তো বলেছেন মিনিট কুড়ি-পঁচিশের জন্য। এরমধ্যে অনিন্দ্যবাবুর বাড়ি গিয়ে খুন করে ফিরে আসতে অন্তত আধঘণ্টা লাগা উচিত।”

“সেটা তো ওর কথা?” আমি বললাম। “আর কেউ কি জোর দিয়ে বলেছে মাত্র কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের জন্য বেরিয়েছিলেন?”

“তা নয়। তবে ‘স্টপ-এন-গো’-র সিসিটিভিতে ওকে দেখা গেছে ন’টার মিনিট দশেক আগে। আর উনি পার্টিতে ফিরে এসেছিলেন সাড়ে ন’টার একটু আগে এটা আমরা জানি।”

“কিন্তু উনি তো ‘স্টপ-এন-গো’ থেকে অনিন্দ্যর বাড়িতে গিয়ে মার্ডার করে ফিরে আসতে পারেন। পারেন না?”

“সহজেই পারতেন স্যার, যদি ‘স্টপ-এন-গো’ অনিন্দ্যবাবুর বাড়ির দিকে পড়ত। কিন্তু ওটা উলটো দিকে। তাই এক্ষেত্রে টাইমিংটা খুব টাইট!”

“এটা আপনি কী করে বলছেন! অনিন্দ্য খুন হয়েছে ঠিক কখন, সেটা কি আপনি জানেন?”

“না স্যার। আসলে এক্স্যাক্ট টাইম অফ ডেথ খুব সহজে বলা যায় না। তবে ন’টার সময় কুকুরটা তো বাইরে ছিল না।”

একেনবাবুর কথাটা প্রথমে ধরতে পারলাম না। তারপর প্রতিবেশীর ন’টার সময়ে খুশ-কে না দেখার কথা মনে পড়ল।

“তাহলে?”

“দাঁড়ান স্যার, আগে কফিটা খাই আর ইমেল খুলে দেখি কিশোরবাবুর ছবিগুলো এসেছে কি না।”

“মাথামুণ্ডু কী পাবেন ছবিতে?”

“কে জানে স্যার... অনেক সময় হঠাৎ কিছু চোখে পড়ে যায়...।”

।। ৮ ।।

একেনবাবুকে আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। মনে হল উনি অজয়কে হিসেবের খাতা থেকে বাদ দিতে একটু যেন উদগ্রীব। ওঁর মাথায় কী ঘুরছে ‘দেবা ন জানন্তি’। আমি আমার নিজের ইমেল নিয়ে বসলাম। সোমবারে এত ইমেল আসে! বেশির ভাগই, কলেজ

সংক্রান্ত... অত্যন্ত বোরিং। এই সময়টাতে প্রমথর বানানো কড়া কফি মিরাকলের কাজ করে। দুর্দান্ত কফি বানিয়েছে আজকে। প্রমথও আমার পাশে বসে ওর ল্যাপটপ খুলে বসল। একেনবাবু কফি নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

কফিতে কয়েক চুমুক মাত্র দিয়েছি, একটু বাদেই একেনবাবুর গলা শুনতে পেলাম। একটু যেন উত্তেজিত! "গাড়িতে ছাপ পেয়েছেন? চমৎকার। গাড়িটা ধোওয়া হয়েছিল কবে?...দিন চারেক আগে? ব্যাস এবার ম্যাচ করে কি না দেখুন। অজয়বাবু আর সেই সঙ্গে ত্রিদিববাবু আর ম্যাডাম অনিন্দিতাকে জেরা করুন। গুড ওয়ার্ক মিস্টার আর্মান্দো।... হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি পাঠিয়ে দিন কালকে সকালে, আমি যাচ্ছি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার, রহস্যের সমাধান এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?"

"মনে তো হচ্ছে স্যার। তবে ম্যাচ না করা পর্যন্ত তো সঠিক বলা যাচ্ছে না।"

"কী ম্যাচ করা পর্যন্ত? হ্যান্ডগানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো শুধু অনিন্দিতার পাওয়া গেছে!" প্রমথ বলল।

"আরে না স্যার, উনি তো সারাক্ষণই পার্টিতে ছিলেন!"

"তাহলে?"

"বলছি স্যার, কিন্তু এগুলো এখনও প্রিলিমিনারি থিঙ্কিং। কয়েকদিন লাগবে কনফার্ম করতে।"

"ক্রিপ্টিক্যালি না বলে একটু বিশদ করে বলুন।"

"বলছি স্যার। কিন্তু আরও এক কাপ কফি হলে ভালো হয় স্যার। এটা শেষ হয়ে গেল!"

"জ্বালিয়ে খান মশাই আপনি! ঠিক আছে রান্নাঘরে আসুন। সাসপেন্সে রেখে আমাদের টেনশন বাড়ানো চলবে না।"

রান্নাঘরে একেনবাবু শুরু করলেন। "আমি মন দিয়ে এনলার্জ করে কিশোরবাবুর তোলা ছবিগুলো কেন দেখছিলাম জানেন?"

"মুখের এক্সপ্রেশন দেখতে?"

"না স্যার, কারোর কোট বা শাড়িতে লোম লেগে আছে কিনা দেখতে। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, খুশ-এর গা থেকে অসম্ভব লোম ঝরে। কালো কোট হলে তো লাগবেই এমনিতেই ওগুলো প্যান্ট বা জামায় লেগে যায়। কালো কোট পরা সত্ত্বেও অজয়বাবু কোটে কিন্তু আমি লোম খুঁজে পাইনি। কিন্তু দেখুন এই ছবি..." বলে একেনবাবু ল্যাপটপ খুলে একটা ম্যাগ্নিফায়েড ছবি দেখালেন। সত্যিই কিছু কিছু বাদামি-কালো লোম লেগে আছে একটা ডার্ক-ব্লু কোটে।... এটা হল ত্রিদিববাবুর কোট। ছবিটা ছোট করতেই ত্রিদিবকে দেখতে পেলাম। এর মধ্যে আমার কাছে শুনে মিস্টার ফার্নান্দো অজয়বাবুর গাড়ি পরীক্ষা করেছে, সেখানে কিছু পায়নি। কিন্তু ত্রিদিববাবুর অ্যালফা রোমিও-তে ড্রাইভার-সিটের পাশের জানলায় কুকুরের নাকের ছাপ পেয়েছে।"

"কুকুরের নাকের ছাপ?"

"হ্যাঁ স্যার, কুকুরের নাকের ছাপ। ওটা মানুষদের ফিঙ্গার প্রিন্টের মতো একটা আইডেন্টিফায়ার। প্রায় ৮০ বছর ধরে ক্যানাডাতে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে হারানো কুকুরদের খুঁজে বার করতে। ত্রিদিববাবুর গাড়ি দিন চারেক আগে ধোয়া হয়েছে। সুতরাং এটা একটা ফ্রেশ প্রিন্ট। এটার সঙ্গে যদি খুশ-এর নাকের ছাপ মিলে যায়, তাহলে প্রমাণ করা যাবে ত্রিদিববাবু অনিন্দ্যবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। কারণ খুশ গাড়ি দেখলেই জানলায় মুখ ঠেকিয়ে অভ্যর্থনা করে।"

“তাতে হলটা কী? বাপির গাড়িতেও তো ওই স্টুপিড নাকের ছাপ মিলবে! আর বাপির প্যান্টেও নিশ্চয় কিছু লোম পাওয়া যাবে, তাই না?” প্রমথ বলল।

“আমার প্রশ্ন, অজয়বাবুর হ্যান্ডগানটা ত্রিদিববাবু পেলেন কী করে?” আমি যোগ করলাম।

“আপনারা ঠিক প্রশ্নই করছেন। এখন আমি কী ভাবছি বলি স্যার... অজয়বাবু কি ত্রিদিববাবুকে হ্যান্ডগানটা ধার দিয়েছিলেন? দিয়ে থাকলে কেন? কিন্তু আরও একজন দিতে পারেন, তিনি হলেন অনিন্দিতা ম্যাডাম। তিনি ভালো করেই জানতেন হ্যান্ডগানটা কোথায় আছে, চট করে কেমন আর্মান্দো সাহেবকে বার করে দিলেন! কিন্তু অনিন্দ্যবাবু খুন হলে অনিন্দিতা ম্যাডামের লাভটা কী? তখনই আমার মনে পড়ল দীপেনবাবুর কথা। দীপেনবাবুর স্ত্রী অনিন্দিতাকে চিনতেন দীর্ঘকাল ধরে। একটা ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন অনিন্দিতা সম্পর্কে... আমার শুনে মনে হয়েছিল উনি ওয়াইল্ড পার্টি ভালোবাসেন, গায়ে পড়া টাইপ, ফ্লার্ট করেন... পরকীয়াতে উৎসাহ দেন কিনা অবশ্য বলেননি। তবে দীপেনবাবুকে ওঁদের দু-জনের কাছ থেকেই দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। মনে হয় সেটা গৌরবে বহুবচন স্যার... আসলে অনিন্দিতার কাছ থেকেই দূরে থাকতে বলেছিলেন। এখন ভেবে দেখুন স্যার, ত্রিদিববাবু একজন সুদর্শন কৃতি ব্যাবসাদার। অজস্র টাকার মালিক, স্ত্রী নেই। ত্রিদিববাবুর অফিসে অনিন্দিতা কাজ করতে যান। সেখানে তাঁর প্রেমে পড়া বিচিত্র নয়। ত্রিদিববাবু এদেশের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বা সিটিজেন নিশ্চয় হবেন... এখানে যখন ব্যবসা করছেন। অজয়বাবুকে দেশে ফিরতেই হবে, কারণ আর এক বছর মাত্র ভিসার মেয়াদ। ওঁদের ছেলেপুলে নেই। সুতরাং ম্যাডামের পিছুটান বলতে একমাত্র অজয়বাবু। তখনই আমার মনে হল স্যার এই খুনের সঙ্গে অনিন্দিতা ম্যাডামেরও জড়িত থাকা অসম্ভব নয়। অজয়বাবুর সঙ্গে অনিন্দ্যবাবুর ঝগড়ার মূলেও অনিন্দিতা ম্যাডামই ছিলেন। অজয়বাবুর বাবা সম্পর্কে যে কথাগুলো আমাদের বলেছেন, সেগুলো নিশ্চয় ত্রিদিববাবুকে অনিন্দিতা ম্যাডামই জানিয়েছিলেন। আর সেটাই ত্রিদিববাবু অনিন্দ্যবাবুকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু অনিন্দ্যবাবুকে কেন? কারণ ওঁরা দু-জনেই জানতেন অনিন্দ্যবাবু পেটে কথা রাখতে পারেন না। মদ পেটে পড়াতে যা জানেন সেটা হুড়হুড় করে বলতে শুরু করেন। সেটাই ঘটল, আর তাতে অজয়বাবু অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। এই নিয়ে দরজা বন্ধ করে ওঁদের মধ্যে প্রবল তর্কবিতর্ক শুরু হল। শেষে অজয়বাবু বললেন, ‘আই উইল কিল দ্যাট স্কাউন্ড্রেল’! হতে পারে মাতালের উক্তি। কিন্ত সন্দেহের বীজ বেশ ভালো ভাবেই রোপন করা হল। এখন অজয়বাবুর হ্যান্ডগানটা ত্রিদিববাবুকে ব্যবহার করতে দিয়ে যদি অজয়কে খুনি প্রমাণ করা যায়, তাহলে ত্রিদিববাবুর সঙ্গে ওঁর মিলনটা খুবই সহজে হতে পারে। এটা খুব নেগেটিভলি বলছি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য এক্সপ্লানেশন মনে করতে পারছি না।”

প্রমথ বলল, “এই নাকের ছাপের থিওরিটা পেলেন কোত্থেকে?”

“কী মুশকিল স্যার, আপনারাই শুধু রিসার্চ করতে পারেন? গুগুল সার্চ করুন না!”

একটু বাদেই আবার ফোন। আইলীনের বাড়িতে গিয়ে পুলিশ খুশ-এর নাকের ছাপ নিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মিল পাওয়া গেছে। এক্সপার্টদের ডাকা হচ্ছে।

কাহিনির উপসংহারটা খুবই দুঃখজনক। অনিন্দিতা আর ত্রিদিবকে জেরা জ্যাকই করেছে। একেনবাবু নিজেকে জড়াতে চাননি। দু-জনেই অপরাধ স্বীকার করেছে। আধঘণ্টার জন্য ত্রিদিব পার্টি থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। কেউই সে-ভাবে খেয়াল করেনি, কারণ কাজের জন্যে

মাঝে মাঝেই আড্ডা ছেড়ে ফোন নিয়ে বাইরে কথা বলতে যেত। তবে খুনটা খুব পরিকল্পনা করেই করা। হ্যান্ডগানটা অনিন্দিতা ত্রিদিবকে অ্যানিভার্সারি পার্টিতে যাবার আগেই দিয়ে এসেছিল। কাজটা সেরে ত্রিদিব ফেরত দিয়েছিল সেই রাত্রে যখন গাড়ি করে অনিন্দিতাকে বাড়িতে নামিয়ে দেয়। দুজনেই এখন জেলে। অজয় দেশে ফিরে গেছে। এই সবের পরে বিচিত্রা ক্লাবের পুজোয় মনে হয় না আর আমাদের যাওয়া হবে বলে।

ভয়ঙ্কর চিঠি

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

এবার আমাদের দেশে আসাটা একেনবাবুর ইচ্ছেতেই হল। আমার আসার কোনো প্ল্যানই ছিল না, বাধ্য হলাম একেনবাবুর ঘ্যানঘ্যানানি সহ্য করতে না পেরে! সেই একেনবাবু, যিনি নিউ ইয়র্কে এসে পাক্কা তিনটি বছর ঘাপটি মেরে কাটিয়ে দিলেন নো নড়নচড়ন! গত বছর প্রমথ আর আমি যখন আসছিলাম, ঘোষণা করলেন কয়েক সপ্তাহের জন্যে দেশে যাবেন না, গেলে একেবারে পাততাড়ি গুটিয়ে যাবেন।

ওটা ফালতু কথা। কৃপণ লোক, টু-পাইস বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন। এবার যখন 'চলুন না স্যার', 'চলুন না স্যার' আরম্ভ করলেন, মনে করিয়ে দিলাম সেই কথাটা।

"তাই বলেছিলাম নাকি? হবে হয়তো। আসলে কী স্যার, অনেকদিন ফ্যামিলিকে দেখিনি।"

ফ্যামিলি মানে স্ত্রী, একেনবাবু সব সময়েই স্ত্রীকে ফ্যামিলি বলেন। এর পর এটা নিয়ে খোঁচানো যায় না। পাঠকরা অবশ্য ভাবতে পারেন, একেনবাবু দেশে আসতে চাইলে আসুন, তার সঙ্গে আমাকে বা প্রমথকে আসতে হবে কেন? এর ব্যাখ্যা একেনবাবুকে না চিনলে দেওয়া অসম্ভব। ঘ্যানরঘ্যানর করে জীবন দুর্বিষহ করার অপরিসীম ক্ষমতা উনি ধরেন। সেটা সহ্য করার থেকে অনেক সহজ দেশে আসাটা। যাক সে কথা, দেশে আসার ওঁর আসল কারণটা অবশ্য প্লেনে আসতে আসতে উদ্ধার হল। একেনবাবু নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলেন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাড়ে তিন বছরের স্টাডি লিভ নিয়ে। তখন একেনবউদিকে সঙ্গে নেননি খরচার কথা ভেবে। কয়েক মাস আগে নিউ ইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ওঁকে একটা কনসাল্টিং-এর কাজ দিয়েছেন, পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট। ক্রাইমেরও একটা কালচারাল সাইড আছে। নিউ ইয়র্ক শহরে এখন অনেক দক্ষিণ এশিয়ার লোক থাকে। দক্ষিণ এশিয়া মানে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এইসব জায়গা। এই কম্যুনিটিতে যেসব ক্রাইম ঘটছে, তার কিনারা করতে একেনবাবু সাহায্য করবেন। এছাড়া অন্যান্য কোনো কঠিন কেসেও একেনবাবুর মাথা কাজে লাগবে। কন্ট্রাক্টটা পাঁচ বছর দিয়ে শুরু হলেও সেটা যে বেড়ে পনেরো-কুড়ি বছর চলবে, সেটা একেনবাবু জানেন। সুতরাং এখন ফ্যামিলিকে আনানোর বন্দোবস্ত করতে হয়। কিন্তু মুশকিল হল একেনবউদি বেঁকে বসেছেন। তিনি সাহেবদের দেশে যেতে প্রস্তুত নন। এটা অভিমানের ব্যাপারও হতে পারে। প্রথমে আমাকে নাওনি, এখন আমি যাব না। টেলিফোনে বহু অনুরোধ উপরোধে কাজ হয়নি, এখন সামনাসামনি বসে যদি ম্যানেজ

করতে পারেন। নইলে ওঁর মতো কৃপণ লোকের পনেরোশো ডলার খরচা করাটা বাস্তবিকই আশ্চর্যের কথা! একেনবাবু অবশ্য আমাদের বলেছিলেন, এপ্রিল মাসে আসার কথা। কারণ সেই সময়ে টিকিট প্রায় চারশো ডলার কমে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রস্তাবটা অবাস্তব। আমার আর প্রমথর দু-জনেরই সেই সময়ে ক্লাস চলছে। একেনবাবুর আবার একা ট্র্যাভেল করতে ভালো লাগে না। সঙ্গী না থাকলে বকবক করবেন কী করে! তাই আমাদের ছুটির জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে এবং ডিসেম্বরে আসাটা যে কী খারাপ সারাটা পথ সেই নিয়ে বক্তৃতা করেছেন। এই সময়ে অসম্ভব ভিড়, টিকিটের দাম বেশি, বড়োদিন আর নিউ ইয়ার হল নিউ ইয়র্কের বেস্ট টাইম আর শীতকাল হল কলকাতার সবচেয়ে বাজে সময় পলিউশন, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি। তাছাড়া ঠান্ডা-গরমে নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, আরও হরেক রকম ব্যাধির কথা, যেগুলো সারা বছর বাদ দিয়ে ঠিক কেন ডিসেম্বরেই হবে, সেটা অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি। তবে তাতে একেনবাবুর এসে যায়নি। প্রমথ বরাবরই অধৈর্য। বলল, "আপনার সমস্যাটা কী মশাই, পরিষ্কার করে বলুন তো? টিকিটের ভাড়া? পনেরোশো ভার্সাস এগারোশো ডলার, না অন্য কোনো উচ্চতর প্রব্লেম?"

প্রমথর এই ডিরেক্ট চ্যালেঞ্জের উত্তরে শুধু 'আপনি না স্যার, সত্যি!' এইটুকু বলে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে আমাদের শান্তি দিলেন।

।। ২।।

আমরা কলকাতায় এসেছি দিন সাতেক হল। তবে স্বীকার করতে হবে এবার একেনবাবু কলকাতায় আসায় আমাদের জমেছে ভালো। সকালবেলার নিউ ইয়র্কের আড্ডটা আমরা একেনবাবুর বাড়িতে সারি। তারচেয়েও বড়ো কথা পাঁউরুটি টোস্ট আর ডিমের অমলেটের বদলে প্রতিদিন ভ্যারাইটি খাবার জুটছে। অবশ্যই একেনবউদির কল্যাণে। সেই কল্যাণটা যাতে নিউ ইয়র্কেও বর্ষিত হয়, তারজন্য একেনবউদিকে আমি আর প্রমথও বোঝাচ্ছি। তার কিছুটা ফল বোধহয় হয়েছে। কারণ একদিন সকালে যখন একেনবাবুর বাড়িতে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ উনি বললেন, "স্যার, আপনারা দু-জনেই আমার ট্রু ব্রাদার্স।"

প্রমথ বলল, "টু ব্রাদার্স, না ট্রু ব্রাদার্স।"

"দুটোই স্যার, সত্যি আপনারা না। কী বলব স্যার, বলার কিছু নেই।"

এমন সময়ে পত্রিকাওয়ালা এসে পত্রিকা দিয়ে গেল। প্রমথ ধাঁ করে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' তুলে নিল, একেনবাবু 'বর্তমান' পত্রিকাটা। আমি প্রমথকে বললাম, "এই, আমাকে একটা পাতা দে।"

দাঁড়া, দিচ্ছি, করতে করতে প্রমথ শেষে যে পাতাটা দিল সেখানে শুধু লোকাল সেলিব্রেটিদের খবর।

আমি বললাম, "ধুৎ, একটা ভালো পাতা দে।"

"ভালো পাতা কোথায় পাবো, এটা কি নিউ ইয়র্ক টাইমস নাকি? যেটা পেয়েছিস সেটাই পড়।"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি।

এমন সময় একেনবাবু বললেন, "দেখেছেন স্যার কাণ্ড, অগ্রগামী লাইব্রেরিতে দুটো পুরোনো ডায়েরি পাওয়া গেছে।"

এটা এমন কী দারুণ খবর বুঝলাম না। একেনবাবু মাঝেমাঝেই উলটোপালটা বলেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম, "বই না ডায়েরি?"

"ডায়েরি স্যার, আর খুব পুরোনো। এই দেখুন না," বলে কাগজটা আমায় এগিয়ে দিলেন।

> সংক্ষিপ্ত খবর: যাদবপুরের একজন রিসার্চ স্কলার পুরোনো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে দুটো ডায়েরি আবিষ্কার করেছে। একটা ডায়েরি হচ্ছে রবার্ট হুক নামে একজন বিজ্ঞানীর। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আলাপ আলোচনা সম্পর্কিত নোট। অন্যটা সম্ভবত রামমোহন রায়ের লেখা ডায়েরি। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন দিনপঞ্জী। রামমোহন রায়ের ব্যাপারটা স্পেকুলেশন। রবার্ট হুকের নাম ডায়েরির প্রথম পাতাতেই লেখা, সুতরাং ভুল হবার কারণ নেই।

খবরটা পড়ে আমি বললাম, "এই বোধহয় সেই রবার্ট হুক, যে হুক-সূত্রের আবিষ্কর্তা।"

"সেটা কী স্যার?"

"একটা স্প্রিং-কে যত চাপ দেবেন, সেটা ওই অনুপাতে ছোটো হবে।"

"এটা স্যার এমন কি বিরাট আবিষ্কার?"

প্রমথ এতক্ষণ পত্রিকায় মুখ গুঁজে ছিল, হঠাৎ বলল, "কেন মশাই, গ্র্যাভিটির ব্যাপারটা তো সবাই জানে, তাহলে নিউটনকে নিয়ে এত মাতামাতি করেন কেন?"

এটা একটা অন্যায্য প্রশ্ন, কিন্তু প্রমথ মাঝে মাঝেই আমাদের দু-জনকে খোঁচা না দিয়ে থাকতে পারে না।

আমি প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বললাম, "ডায়েরি দুটো লাইব্রেরিতে ছিল, অথচ এতদিন এর কথা কেউ জানত না৷ সেটা কী করে হয়!"

প্রমথ বলল, "কারণটা সিম্পল। স্যার বৈদ্যনাথ সরকার অনেকগুলো বই লাইব্রেরিকে দান করেছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে। সেগুলো এতদিন গুদামজাত ছিল। এখন ক্যাটালগ করে তোলা হচ্ছে।"

আমি প্রমথর দিকে একটু অবাক হয়ে তাকাতেই, প্রমথ বলল, "কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না, তাহলে এই দ্যাখ," বলে টাইমস অফ ইন্ডিয়া-র একটা পাতা এগিয়ে দিল। সেখানে কাদের ডায়েরি নিয়ে কোনো মন্তব্য নেই, শুধু পঞ্চাশ বছর আগে স্যার বৈদ্যনাথ সরকারের দান করা বই থেকে দুটো পুরোনো ডায়েরি পাওয়া গেছে বলা হয়েছে।

"কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকানে এইরকম অনেক ডায়েরি পাওয়া যায় স্যার," একেনবাবু বললেন। "আমার ছোটমামা সিস্টার নিবেদিতার একটা ডায়েরি পেয়েছিলেন। পরে সেটা রামকৃষ্ণ মিশন না কোথায় জানি দিয়ে দেন।"

"অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলেন, থাকলে আপনার টু-পাইস হত।" তারপরেই প্রসঙ্গ পালটে প্রমথ আমাকে বলল, "ভালোকথা, তুই সেদিন খুব কপচালি আমাদের দেশে 'অনার কিলিং' হয় না! এই দ্যাখ, মধ্যপ্রদেশে দুটো মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে৷ একজন অন্য জাতের ছেলেকে বিয়ে করেছে বলে, আরেকজন বাবার হুকুম না মেনে নিকাব, মানে মুখ-না-ঢেকে স্কুলে পড়তে গিয়েছে বলে।"

এই ‘অনার কিলিং’ বা পরিবারের সম্মান বজায় রাখতে বাড়ির মেয়েদের হত্যা করা নিয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে নিউ ইয়র্কে আমাদের মধ্যে তুমুল তর্ক হয়ে গেছে। ইউরোপে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইত্যাদি কয়েকটি দেশে দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এর চল আছে বলে নিউ ইয়র্ক টাইমসে-এ বেশ লেখালেখি হচ্ছিল। যেটা সবচেয়ে ভয়াবহ, এই সম্প্রদায়ের তথাকথিত শিক্ষিতরাও কেউ কেউ এটাকে অন্যায় বলে মনে করেন না। তর্কের মধ্যে আমি বলেছিলাম, ‘আমাদের দেশে বধূহত্যা হয়, কিন্তু ‘অনার কিলিং’ হয় বলে শুনিনি।’

প্রমথ তখনই মারমার করে উঠেছিল, “তুই একটা গাধা, যে-দেশে এখনও সতীদাহ চলছে, সেদেশে ‘অনার কিলিং’ হয় না বললেই আমি মানব?”

যাইহোক, এখন হাতেনাতে আমাকে তথ্যটা দিল। আমায় স্বীকার করতেই হবে এইসব ব্যাপার আমার চোখ এড়িয়ে যায়। তবে নিজেকে ডিফেন্ড করার জন্য বললাম, “ওসব মধ্যপ্রদেশ রাজস্থানে হয়, কলকাতায় হয় না।”

“তোর মুণ্ডু!”

ইতিমধ্যে জলখাবার এসে গেছে। আজকে গরম গরম লুচি, বেগুনভাজা আর মোহনভোগ। একেনবউদি বোধহয় আরও লুচি ভাজছেন, কারণ কিচেন থেকে ভাজাভুজির শব্দ পাচ্ছি। অল্পক্ষণের মধ্যে আরেক প্রস্থ চাও এসে গেল।

খেতে খেতে একেনবাবু বললেন, “যাবেন নাকি স্যার?”

“কোথায়?”

“অগ্রগামী লাইব্রেরিতে।”

“ওই ডায়েরি দেখতে?”

“হ্যাঁ স্যার। রামমোহন রায়ের ডায়েরি হলে তো খুব পুরোনো হবে, তাই না স্যার?”

“তা শ-দেড়েক বছর তো হবেই,” আমি আন্দাজে বললাম।

“রবার্ট হুক তারও আগের লোক, তিনশো-সাড়ে তিনশো বছর।” প্রমথ বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল।

রবার্ট হুক এত বছরের আগের লোক বলে জানা ছিল না। প্রমথ অবশ্য মাঝে মাঝে গম্ভীর ভাবে ভুল তথ্য দেয়। তবে দুটো ডায়েরিই যে খুবই পুরোনো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অগ্রগামী লাইব্রেরি আমাদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে নয়। আমার মা মেম্বার। এবার এসে মা-র জন্য বই আনতে এর মধ্যে ওখানে একবার গিয়েওছি।

ঠিক হল পরের দিন বিকেলে লাইব্রেরিতে একবার ঢুঁ মারব।

পরের দিন আমরা গেলাম বটে, কিন্তু যা দেখার জন্য গেলাম, সেটা আর দেখা হল না। ডায়েরি দুটো কোথায় আছে কেউই জানে না। অথচ গতকাল বিকেলেও ডায়েরি দুটো রেফারেন্স র‍্যাক-এ ছিল। লাইব্রেরির এক ট্রাস্টি দেখতে এসেছিলেন ডায়েরি দুটোকে, হেড লাইব্রেরিয়ান নিজে দেখেছেন।

রেফারেন্স র‍্যাক দেখলাম অত্যন্ত অগোছাল অবস্থায়, অজস্র পুরোনো বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বেশির ভাগই স্যার বৈদ্যনাথ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু যাদবপুরের যে স্কলারটি ডায়েরি দুটো প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি সকাল থেকে প্রায় দু-তিন ঘণ্টা তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওগুলোর সন্ধান পাননি। তারপর অন্যান্যরাও খুঁজেছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। হেড লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা হল। তিনিও

ভেবে পাচ্ছেন না কী করে ডায়েরি দুটো অদৃশ্য পারে! বিল্ডিং থেকে বেরোনোর সময় ব্যাগ চেক করা হয়, এমন কী যারা লাইব্রেরিতে কাজ করে তাদেরও। পুলিশের উপরও মনে হল ওঁর তেমন ভরসা নেই। কথায় কথায় বললেন, “এতদিন হয়ে গেল নোবেল চুরির রহস্যই ভেদ করতে পারল না, তারা খুঁজে পাবে দুটো পুরোনো ডায়েরি!”

আমি একেনবাবুকে বললাম, “কি মশাই, আপনার সার্ভিস অফার করবেন নাকি?”

“কী যে বলেন স্যার, কত মাথাওয়ালা লোক এ নিয়ে তদন্ত করবে। আমরা তো চুনোপুঁটি!”

এটা বিনয়, কারণ কয়েক মিনিট বাদেই সি.আই.ডি-র এক ভদ্রলোককে দেখলাম এগিয়ে একেনবাবুকে ‘কেমন আছেন স্যার’, ‘কবে এলেন’, ইত্যাদি বলে চলে গেলেন।

।। ৩।।

সেদিন লাইব্রেরি থেকে ফিরে দিন কয়েকের জন্য মা-কে নিয়ে আমি বাণীপুরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে যথারীতি একেনবাবুর বাড়িতে গেছি চা খেতে। প্রমথ ইতিমধ্যেই এসেছে। আমাকে দেখে বলল, “এই যে এসে গেছিস, আমি একেনবাবুকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম যে ডায়েরি চুরির ব্যাপারে ওঁর ইন্ডিপিন্ডেন্ট তদন্ত করা উচিত।”

“কেন?”

“কারণ ডায়েরিটা রবার্ট হুক-এর হলে ওটা মহা মূল্যবান বস্তু। গতকাল ইন্টারনেট সার্চ করে দেখলাম ওঁর একটা ডায়েরির খোঁজ প্রায় তিনশো বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। ডায়েরিটাতে ১৬৬১ সাল থেকে ১৬৮২ পর্যন্ত রয়্যাল সোসাইটির নানান খবর ছিল। পাওয়ার পর ওটা নিলামে তোলা হবে ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই রয়্যাল সোসাইটির কিছু মেম্বার আর একটা ট্রাস্ট, নামটা এখন মনে পড়ছে না, ওটা প্রায় দেড় মিলিয়ন ডলারে কিনে নিয়ে সোসাইটির লাইব্রেরিতে রেখে দেয়। কল্পনা করতে পারিস দেড় মিলিয়ন ডলার মানে প্রায় দশ কোটি টাকা!”

“কিন্তু এটা যে একটা নকল ডায়েরি নয় তার প্রমাণ কী? রবার্ট হুক একই বিষয়ে দুটো ডায়েরি রাখতে যাবেন কেন?”

“ইডিয়টের মতো কথা বলিস না। একটায় হয়তো সংক্ষেপে জিনিসগুলো টুকতেন, অন্যটাতে বিশদ করে লিখতেন। আর তাছাড়া এই ডায়েরিটাতে হয়তো অন্য সময়ের কথা রয়েছে। কি মশাই হতে পারে না?” একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল প্রমথ।

“তা তো পারেই স্যার।”

“আর এটা যদি নকলও হয়, রামমোহনের ডায়েরিটাও তো ফ্যালনা নয়। ইন্টারেনেটেই পেলাম যে, রামমোহন ১৮৩১ সালে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, ১৮৩৩-এ ব্রিস্টল শহরের কাছে মারা যান। ওই সময়টাতে রামমোহনের সঙ্গে ইউনিটারিয়ান চার্চের খুব যোগাযোগ ছিল। ডায়েরিটা যদি তখন লেখা হয়, তাহলে চার্চের লোকরা ওটা পেতে মোটা রকমের টাকা দিতে দ্বিধা করবে না।”

“দাঁড়া দাঁড়া, ওটা যে রামমোহনের ডায়েরি তার কোনো প্রমাণ আছে?”

প্রমথ রেগে গিয়ে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একেনবাবুর বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে সে এসে বলল, এক ভদ্রলোক একেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে

এসেছেন।

ঘোষণাটা কোনো প্রস্তুতির সময় দেবার জন্য নয়। কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোককে আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু ঠিক কোথায় মনে করতে পারলাম না। গায়ের রঙ বেশ শ্যামলা, কাঁচাপাকা চুল, মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারা। বাইফোকাল চশমাটা নাকের উপর একটু নেমে এসেছে। পরনে ধুতি, পায়ে ফ্যান্সি চপ্পল, গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবির উপর দামী কাশ্মিরী শাল জড়ানো। আঙুলে নানা ধরনের পাথরের বেশ কয়েকটা আঙটি। ভদ্রলোক মনে হয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসী, সংসারের যাবতীয় ফাঁড়া উপদ্রব খণ্ডাবার জন্য ওগুলো ধারণ করেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি একেনবাবু?"

আমি মাথা নেড়ে একেনবাবুকে দেখিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বোধহয় নিরাশ হলেন। একেনবাবু এমনিতেই রোগা, বেঁটে, আন-ইম্প্রেসিভ। তার ওপর আজ যে পায়জামাটা পরেছেন, সেটা গোড়ালি থেকে অন্তত ইঞ্চি ছয়েক উঁচুতে লটকে আছে। ফুলহাতার শার্টটা যে অবস্থায়, ওরকম শার্ট মা-র চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ঘরমোছা বানিয়ে ফেলত! তবে সেই শার্টের কিছুটা অবশ্য রোঁয়া-ওঠা হাতকাটা সোয়েটারে ঢাকা পড়েছে। সেটা ভালো না মন্দ— সে নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। মোটমাট, এই চেহারা আর পোশাক যার, সে কি কখনো ডিটেকটিভ হতে পারে!

সন্দেহ নিরসনের জন্যই বোধহয় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি এক সময়ে সি.আই.ডি-তে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"ব্যারিস্টার বিকাশ সেনকে চেনেন?"

"নিশ্চয় চিনি স্যার, নামকরা লোক।"

"ওঁর কাছেই আপনার খবর পেয়েছি। আমার নাম শুভংকর কুণ্ডু। কুণ্ডু টি-এস্টেটের নাম শুনেছেন?"

"সে কি স্যার, অতবড়ো টি গার্ডেন-এর কথা জানব না!"

"ওটা আমার।"

"মাই গড স্যার!"

একেনবাবুর শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভাব দেখে শুভংকরবাবু খুশি হলেন, "তবে এখন আর বাগানটা অত বড়ো নেই।" তারপর আমাদের দিকে এক লহমা তাকিয়ে বললেন, "আপনার কাছে একটা ব্যাপারে সাহায্যের জন্য এসেছি, কিন্তু সেটা একটু প্রাইভেট।"

"আপনি নিঃসন্দেহে এঁদের সামনে সব খুলে বলতে পারেন। ইনি হচ্ছেন বাপিবাবু, আর ইনি প্রমথবাবু। এঁরা দু-জনেই পণ্ডিত মানুষ স্যার— নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়ান আর রিসার্চ করেন। আমার কাজেও ওঁরা বহু সাহায্য করেন।"

আমি আর প্রমথ ভদ্রলোককে নমস্কার করলাম। একবার ভাবলাম বলি, একেনবাবুর প্রথম কথাটা যদি বা অর্ধসত্য হয়, শেষের কথা প্রায় পুরোটাই অসত্য। আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাতে একেনবাবুর আদৌ কোনো উপকার হয় কিনা ঘোরতর সন্দেহ আছে।

কাজের মেয়েটি নিশ্চয় একেনবউদিকে খবর দিয়েছিল, চা এসে গেল।

"দুধ-চিনিতে অসুবিধা নেই তো স্যার, ওটাই খাই আমরা।"

"না, না, ঠিক আছে।" বলে ভদ্রলোক তার কাহিনি শুরু করলেন।

"দেখুন আমার একটিই মেয়ে। স্কুলে পড়ছে, হায়ার সেকেন্ডারির ফাইনাল ইয়ার। আমার যা কিছু সম্পত্তি ওই পাবে। আমি আর আমার স্ত্রী খুব সাবধানে ওকে বড়ো করেছি যাতে কুসঙ্গে না পড়ে। বুঝতেই তো পারছেন একে সুন্দরী, তার ওপর বাপের সব সম্পত্তি পাবে অনেক বদ ছেলেই ফুসলাবার চেষ্টা করবে। ও যখন মাধ্যমিকের ফাইনাল দিচ্ছে তখন আমার ভাগ্নের পরিচিত একটি ছেলেকে ওর প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলাম। ছেলেটা বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে এম.এ পড়ছিল। সাধারণ ঘরের ছেলে, কিন্তু পড়াশুনোয় ভালো। অর্থকষ্টের মধ্যে আছে জেনে ওকে ভালো টাকা দিয়েই রেখেছিলাম। আমার স্ত্রী পরে আবিষ্কার করলেন ছেলেটার বদ-অভিসন্ধি আছে, পড়ানোর নাম করে আমার মেয়ের মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছে! শোনামাত্র ওকে তাড়িয়ে একজন বৃদ্ধ মাস্টারমশাইকে টিউটর রেখেছি। বাড়ির ধারে কাছে ছোঁড়াকে আসতে দিই না।

"যাইহোক, শ্রীময়ীর আঠেরো বছর পূর্ণ হবে এই জানুয়ারিতে। ওর বিয়ের জন্য একটি সুপাত্র ঠিক করেছি। অবস্থা, মানমর্যাদা, সবকিছুতেই আমাদের সঙ্গে ম্যাচ করেছে। পাত্রপক্ষেরও আমার মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। তারপরেই শুরু হয়েছে একটা উৎপাত।" কথাটা বলে শুভংকরবাবু গলা খাঁকারি দিলেন।

"উৎপাত স্যার?"

"হ্যাঁ, উৎপাতই বলতে পারেন। হঠাৎ একটা উড়ো চিঠি, যার বয়ান... আমার মেয়ে একজনের সঙ্গে প্রেম করছে, সেটা গোপন রেখে আমি মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই খবর পাত্রপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হবে যদি না পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

"কোথায় টাকা দিতে হবে? কী ভাবে দিতে হবে? কোনো নির্দেশ নেই। শুধু লেখা আছে, পরে সেটা জানানো হবে, আর এটা হল আমার ফার্স্ট ওয়ার্নিং।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি স্যার, আপনার মেয়ে যে প্রেম করছেন, সেটা আপনি জানলেন কী করে? এটা তো একটা বাজে খবরও হতে পারে।"

"একটা চিঠির কপি ওই চিঠির সঙ্গে এসেছিল। আমার মেয়েরই হাতের লেখা এবং নিঃসন্দেহে প্রেমপত্র। পরে একটা অচেনা লোক বার দুই ফোনও করেছে। বলেছে, ওদের কাছে আরও কিছু চিঠির কপি আছে, যেখানে অনেক খারাপ খারাপ কথাও রয়েছে। ওগুলো যদি পাত্রপক্ষের হাতে যায়, তাহলে লজ্জায় মুখ দেখানো কঠিন হবে!"

"আমি একটু কনফিউসড স্যার, এ যুগের মেয়ে হাতে চিঠি লিখবেন কেন ইমেল বা টেক্সট না করে!"

"আমিও সেটা ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার মেয়ে একটু অন্যরকম। হাতে লিখতে ভালোবাসে। ওর ষোলো বছরের জন্মদিনে তিরিশ জন বন্ধুকে হাতে লিখে নিমন্ত্রন্ন করেছিল। আমি বলেছিলাম কার্ড ছাপিয়ে দিচ্ছি। না, সেটা নাকি পার্সোনাল হবে না!"

"বুঝলাম স্যার, প্রেমপত্র তো পার্সোনাল হতেই হবে। কিন্তু আপনার মেয়ের হাতের লেখা কেউ তো নকলও করতে পারে। ওটা যে সত্যি সত্যিই আপনার মেয়ে লিখেছেন সে ব্যাপারে আপনি শিওর?"

"ওর মা ওকে চিঠির কপিটা দেখিয়েছে। চাপে পড়ে স্বীকার করেছে, পুরোনো টিউটর অজয়ের সঙ্গে চিঠি চালাচালি ও করে। আমার সঙ্গে ওর কোনো কথা হয়নি, কারণ অজয়কে চাকরি থেকে তাড়ানোর পর মেয়ে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলে না।"

"আই সি, কিন্তু চিঠি চালাচালি করেন কী করে?"

"সেটাই রহস্য। ওর ওপর সব সময়ে কড়া নজর রাখা হয়, কোনো সময়েই একা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। শপিং করতে গেলেও হয় ওর মা বা আমি সঙ্গে থাকি।

মুশকিল হচ্ছে মেয়েটা ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। অজয়কে যখন তাড়াই, তখন একবার সুইসাইডের চেষ্টা করেছিল। তাই যতটা কড়াকড়ি করা সম্ভব ততটা করি না। গান শিখতেও যায়। লাইব্রেরিতেও যায়। তবে কখনোই একা নয়। আর কেউ না হোক বিজু, মানে আমার বহুদিনের বিশ্বস্ত ড্রাইভার সঙ্গে থাকে। বিজুকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছি, ও কখনো নেমকহারামি করবে না।"

"তাহলে তো ফুল-প্রুফ অ্যারেঞ্জমেন্ট," প্রমথ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলল।

শুভংকরবাবু শ্লেষটা ধরতে পারলেন না। বললেন, "সেটাই তো ভেবেছি। কিন্তু এর মধ্যে কী করে চিঠি চালাচালি হচ্ছে আমার মাথায় ঢুকছে না।"

মেয়ের প্রতি ভদ্রলোকের এ-রকম ডমিনেটিং অ্যাটিচুড মোটেই ভালো লাগছিল না। প্রমথ যে বেজায় চটেছে সেটা ওর পরের কথাতেই বুঝলাম। বলল, "আপনার মেয়ে লিখতে জানে, বাড়িতে কাগজপত্রও আছে, আর চিঠি ছুড়ে ফেলার মতো জানলাও নিশ্চয় আছে বাড়িতে?"

"আমার বাড়ি আপনি দেখেছেন?"

"না।"

"দেখলে বুঝতেন সেটা অসম্ভব। বাড়ির চারদিকে অনেকটা জমি ছেড়ে উঁচু দেয়াল।"

"কোনো কাজের লোক মারফতও তো চিঠি পাঠাতে পারেন?" আমি বললাম।

"সবাই বিশ্বস্ত। এই দুষ্কর্ম করে চাকরি খোয়ানোর সাহস কারো হবে না।"

"মেয়ের ঘরে কখনো কোনো চিঠি দেখেছেন?"

"না, ওর ঘরে আমি যাই না। আমার স্ত্রীও চান না আমি যাই। আমার মেয়েকে আমি চিনি। যদি আমি ওর ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র ঘাঁটতে শুরু করি তাহলে ভয়াবহ কিছু একটা ঘটবে। তবে আমার স্ত্রী ওর ঘরে মাঝেমধ্যে যান। কিন্তু উনি খুব অ্যালার্ট নন। মেয়ে লেখাপড়া করছে না চিঠি লিখছে, সেটা ওঁর পক্ষে ধরতে পারা কঠিন।"

মনে মনে বললাম, বাঁচোয়া।

একেনবাবু এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথা শুনছিলেন, এবার মুখ খুললেন, "তা স্যার, আপনি আমার কী সাহায্য চান?"

"আমি চাই আপনি বার করুন কী ভাবে এই চিঠি চালাচালি চলছে? কাকে ও চিঠি লিখছে? কে আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে? মোটমাট পুরো রহস্যের উদ্ঘাটন। তারপর তাদের সিধে করার ভার আমার।"

"আমি একটু কনফিউসড স্যার, আপনার মেয়ে তো স্বীকারই করেছেন উনি অজয়বাবুকে চিঠি লিখছেন!"

"আমি শিওর নই। হয়তো আমাকে রাগানোর জন্যে কথাটা বলেছে অথবা ভাঁওতা দিয়েছে যাতে আসল লোককে না খুঁজে শুধু অজয়ের উপর নজর রাখি।"

"এটা কেন মনে হচ্ছে স্যার?"

"কারণ চিঠির যে কপিটা আমি পেয়েছি তাতে অজয়ের উল্লেখ নেই।"

"আই সি, আপনি পুলিশকে খবর দিয়েছেন?"

"খেপেছেন! ওরা কিছু জানা মানে পত্রিকাগুলো জানবে, এটা তো একটা মুখরোচক কাহিনি!"

"আপনি যে চিঠিটা পেয়েছেন স্যার, আর সেই সঙ্গে আপনার মেয়ের চিঠির কপিটা কি আমি দেখতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন, মুশকিল হল দুটোর কোনোটাই আমি খুঁজে পাচ্ছি না! সাবধানে

কোথাও রেখেছি... কিন্তু ঠিক কোথায় মনে করতে পারছি না। তবে আপনাকে যা বললাম তার বেশি কিছু চিঠিতে ছিল না। স্রেফ দু-লাইনের চিঠি, আর মেয়ের চিঠিটাও অর্ডিনারি প্রেমপত্র।"

একেনবাবু চুপ করে রয়েছেন দেখে শুভংকরবাবু বললেন, "দেখুন একেনবাবু, পারিশ্রমিকের জন্য আপনি ভাববেন না। আপনি এখন আমেরিকায় গোয়েন্দাগিরি করেন আমি শুনেছি, এখানেও আপনার প্রাপ্তি বেশি ছাড়া কম হবে না। ডলারের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা আমার আছে।"

"তা বুঝতে পারছি স্যার। কিন্তু আমি এখানে অল্প ক'দিনই আছি, অন্য কিছু কাজও আছে। একটু ভেবে দেখি স্যার।"

"টাকার অঙ্ক কত হলে আপনি ভাবা বন্ধ করবেন? আমার বংশমর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন, আর সময়ও আমার হাতে বেশি নেই।"

ভদ্রলোকের ঔদ্ধত্য আমার ভালো লাগছিল না। প্রমথ তো একেবারে খেপেই গেল!

"আপনার মেয়ে যাকে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করলে আপনার সম্মান কেন নষ্ট হবে? আর টাকার জোরে সত্যি-কথা লুকিয়ে অন্য জায়গায় মেয়ের বিয়ে দিলে আপনার সম্মানহানি হবে না?"

শুভংকরবাবু বোধহয় এ-রকম কিছু শুনতে হবে কল্পনা করেননি! মুখটা লাল হয়ে গেল। রাগ সামলে বললেন, "কী বলছেন আপনি?"

"খুব সহজ কথাই বলছি। টাকা দিয়ে আমাদের কিনে যদি কাজ হাসিল করতে চান, তাহলে ভুল জায়গায় এসেছেন। একেনবাবুকে আপনি চেনেন না।"

প্রমথকে উপেক্ষা করে শুভংকরবাবু একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাজটা কি আপনি নেবেন না?"

"একটু ভেবে দেখি স্যার। প্রমথবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। ওঁর সঙ্গে আলাদা আলোচনা না করে আমি কথা দিতে পারছি না।"

কিছুক্ষণ সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে বোধহয় নিজের রাগটা সামলাবার চেষ্টা করলেন শুভংকরবাবু। তারপর বললেন, "কবে আপনি আপনার ডিসিশন জানাবেন?"

"কাল সকালেই স্যার, যদি আপনি সময়টুকু দেন।"

"বেশ," বলে দায়সারা একটা নমস্কার করে শুভংকরবাবু চলে গেলেন। চা ঠান্ডা হয়ে গেল, মুখও দিলেন না।

।। ৪।।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমি প্রমথকে বললাম, "একেনবাবুর বেশ একটু টু-পাইস আসছিল, কেন তুই বাগড়া দিলি?"

"চুপ কর, পয়সা দিয়ে লোকটা পৃথিবী কিনতে চায়! প্রেমের মূল্য যারা দিতে জানে না, তাদের মানুষ বলে আমি গণ্য করি না। তাছাড়া এসব ছেঁদো কাজ না নিয়ে একেনবাবুর উচিত ডায়েরি চুরির ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করা।"

"আই সি, সেইজন্যেই পয়সার কাজটা না নিয়ে বিনি-পয়সার কাজটা করুন, তাই তুই চাস?"

আমার আর প্রমথর মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি চলছে, তখন শুনলাম একেনবাবু বলছেন, "ইন্টারেস্টিং স্যার, খুবই ইন্টারেস্টিং।"

"কী ইন্টারেস্টিং?" জিজ্ঞেস করলাম।

"এই চিঠি চালাচালির ব্যাপারটা। এই রকম খবরদারির মধ্যে চিঠি-চাপাটি চালিয়ে যাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। না স্যার, শুভংকরবাবুর মেয়ের এলেম আছে।"

"আমার কী মনে হয় জানেন, শুভংকরবাবুর স্ত্রী মেয়ের এই চিঠি চালাচালির ব্যাপারটা জানেন এবং সমর্থনও করেন। এতে রহস্যের কিছুই নেই। মেয়েটির প্রেমিক নিজেই প্রেমিকার বিয়ে বন্ধ করার জন্য শুভংকরবাবুকে চিঠি দিয়েছে। ব্ল্যাকমেলিং-এর ব্যাপারটা পুরো ফল্স প্রিটেন্স।"

"হতে পারে স্যার, খুবই সম্ভব।"

"তবে অবাক লাগছে এই ভেবে ভদ্রমহিলা যখন জানেন মেয়ে একজনকে ভালোবাসে, তাহলে স্বামীকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে বারণ করছেন না কেন? মেয়ে সুখী হোক, সব মায়েই তো চায়।"

"ওই রকম একটা স্বামীকে বাধা দেবেন মহিলা, তুই পাগল হয়েছিস নাকি?" প্রমথ বলে উঠল।

"কেন এটা বলছিস! স্ত্রী চান না বলে তো ভদ্রলোক মেয়ের ঘরে যেতেও সাহস পান না!"

"সেটা স্ত্রীর ভয় নয়, সুইসাইড-প্রোন মেয়ের ভয়ে। কি বলেন একেনবাবু?"

"আপনি আর স্যার ভুল বলেন কবে!"

"থ্যাঙ্ক ইউ। আর বুঝলেন একেনবাবু, আমি মত পালটাচ্ছি কাজটা আপনি নিয়েই নিন। মোটা রকম পারিশ্রমিক নিয়ে খুঁজে বার করুন তো প্রেমিকটি কে? তারপর সাইডে প্রেমিককে বলুন কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিতে। ক'দিন বাদে মেয়েটি সাবালিকা হলে আমরাই না হয় উদ্যোগ নিয়ে ওদের বিয়ের দিয়ে দেব, দেখি বুড়ো বাপ আটকায় কী করে!"

"কিন্তু স্যার, উনি রেগে গিয়ে যদি ভয়ঙ্কর কিছু...।"

"'অনার কিলিং'-এর কথা ভাবছেন? এমনিতে বাপির সঙ্গে সহমত হই না, কিন্তু এটা ও ভুল বলেনি... কলকাতায় 'অনার কিলিং'-এর মতো কিছু ঘটবে না। বড়জোর খেপে গিয়ে শুভংকরবাবু মেয়ের মুখদর্শন করবেন না, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। তা করুন। প্রেমিকের মুখ তো মেয়ে দর্শন করতে পারবে। আর সম্পত্তি হারাবার ভয়ে প্রেমিক যদি পিছিয়ে যায়, তাহলে সে বিয়ে না হওয়াই ভালো। মোদ্দা কথা, প্রেমের জয় হবে, আপনি দু-পয়সা ঘরে তুলবেন, বউদিও খুশি হবেন।"

"তা হবেন," একেনবাবু মাথা নাড়লেন।

পরদিন ভোরবেলায় শুভংকরবাবুকে কাজটা নেবার খবর দিয়ে একেনবাবু অ্যাকশনে নামলেন। প্রথমে মিসেস কুণ্ডু, মানে শুভংকরবাবুর স্ত্রী-র সঙ্গে আমরা দেখা করলাম। ওঁদের কন্যার কী জানি কেনা-কাটার ছিল, কিন্তু মিসেস কুণ্ডুর একটু জ্বর জ্বর ছিল বলে তিনি বেরোননি, স্বামী মেয়ের সঙ্গে গেছেন। তাতে মিসেস কুণ্ডু একটু চিন্তিত মনে হল। মেয়ের সঙ্গে বাবার একেবারেই বনে না, কথাবার্তাও বহুদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু ওঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে শুভংকরবাবুই মেয়েকে নিয়ে ঘুরছেন। এরমধ্যে ক'দিন আগে লাইব্রেরি থেকে দু-জনে ফেরার পর মেয়ে নিজেই বাবার ঘরে গিয়ে নীরবতা ভেঙে তুমুল

ঝগড়া করেছে। কারণটা মিসেস কুণ্ডু জানেন না। তারপর আবার কথা বন্ধ। আসলে দু-জনেই ভীষণ একরোখা। এইরকম আরও অনেক কথা বললেন। ওঁর কথা শুনে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল□ মেয়ের জন্য যে সম্বন্ধ স্বামী করেছেন, সেখানেই বিয়েটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন, কারণ পাত্রটি সত্যিই ভালো। পাত্রটি কত ভালো জানতে না পারলেও পাত্রীটি যে অপরূপ সুন্দরী, সেটা দেওয়ালে টাঙানো ছবি থেকেই বুঝলাম। ফুলের উপমা বহু-ব্যবহৃত হয়ে খেলো হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও ছবিগুলো দেখলে সেটাই প্রথম মনে আসে। এই রকম সুন্দর মিষ্টি একটি মেয়ে, প্রেম প্রস্ফুটিত হবার এক্কেবারে উপযুক্ত বয়স। কোথায় তার সুযোগ দেওয়া হবে, না গোয়েন্দা লাগিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে! ও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, শুভংকরবাবুর মতো ওঁর স্ত্রীরও সন্দেহ আছে যে, মেয়ের চিঠি চালাচালি অজয়ের সঙ্গে কিনা, যদিও মেয়ে তাই বলেছে। অজয়কে উনি মাঝেমধ্যে দেখেছেন। যেমন লাইব্রেরিতে অজয়ও আসে, কিন্তু সব সময়েই দূরত্ব বাঁচিয়ে চলে। কখনোই তাকে কাছে এসে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেননি। তবে ওঁর একটা ভয় আছে শুভংকরবাবুর ভাগ্নে সুবীরকে নিয়ে। তার সঙ্গে মেয়ে সব সময়েই হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করে। এতদিন উনি এ নিয়ে চিন্তা করেননি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপন ভাই-বোন তো ওরা নয়! মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যেও তো মাঝেসাঝে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে! কিন্তু সেটা উনি শুভংকরবাবুকে বলার সাহস পাননি, পাছে সেই নিয়ে অশান্তি হয়।

একেনবাবু প্রশ্ন করলেন, "সুবীরবাবু কি প্রায়ই বাড়িতে আসেন, স্যার □ মানে ম্যাডাম?"

"প্রায় প্রতিদিনই আসে। ওঁর ব্যবসার অনেক কিছুই সুবীর দেখছে কিনা।"

"তারমানে প্রতিদিনই সুবীরবাবুর সঙ্গে আপনার মেয়ের কথা হয় ম্যাডাম?"

"তা হয়।"

"কলেজে যখন আপনার মেয়ে যান, তখন কি সব সময়েই আপনার সঙ্গেই থাকেন?"

"তা থাকে।"

"ম্যাডাম, যখন প্রাইভেট ব্যাপার, মানে বাথরুমে...।"

"না, তখন একলাই যায়।"

"সেই সময়ে কি আর কোনো মেয়ে বাথরুমে যান?"

"তাকে দিয়ে চিঠি চালাচালি হয় কিনা ভাবছেন? না, সেটা আমি খেয়াল করেছি। অবশ্য আগে বাথরুমে গিয়ে কেউ যদি চিঠি রেখে আসে তবে অন্যকথা।"

বুঝলাম এই ব্যাপার নিয়ে কর্তা-গিন্নীর মধ্যে অনেক আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে।

"মেয়ের লেখা একটা চিঠি আপনি দেখেছেন জানি, কিন্তু ওটা ছাড়া অন্য কোনো চিঠি বা ওকে লেখা কোনো চিঠি কি আপনি দেখেছেন ম্যাডাম?"

"হ্যাঁ, দূর থেকে মেয়ে দেখিয়েছে, কিন্তু বলেছে ওগুলোতে হাত দেবার চেষ্টা করলে ও সুইসাইড করবে।"

"কেন দেখিয়েছেন বলে আপনার মনে হয়?"

"আসলে এটা ওর বাবাকে চ্যালেঞ্জ। বাবা যতই চেষ্টা করুক না কেন ওর এই চিঠি চালাচালি বন্ধ করতে পারবে না, চিঠিগুলো দেখিয়ে সেটাই আমাকে বলেছে।"

"চিঠিগুলো কি আপনি পড়েছেন ম্যাডাম?"

"আরে না, ছি ছি! দূর থেকে আমাকে দেখিয়েছে।"

"দূর থেকে যখন দেখেছেন, ওগুলো তো বাজে কাগজও হতে পারে, তাই না

ম্যাডাম?”

সম্ভাবনাটা বোধহয় মিসেস কুণ্ডু ভাবেননি। শুধু বললেন, “মিথ্যে বলার পাত্রী আমার মেয়ে নয়। ও বলেছে নিয়মিত চিঠি পায় এবং চিঠি লেখে।”

“আপনার কী মনে হয় ম্যাডাম, কোত্থেকে চিঠিগুলো আসছে?”

“কে জানে, হয় কলেজ বা লাইব্রেরি। ওই দুটো জায়গাতেই ও নিয়মিত যায়।”

“গান শিখতেও তো যান?”

“তা যায়।”

“আপনার মেয়ে কি খুব বই পড়তে ভালোবাসেন ম্যাডাম?”

“আগে তো পড়ত না। আসলে এ বাড়িতে বই পড়ার বাতিক কারোরই ছিল না। ইদানীং দেখি নিয়মিত বই আনে।”

“কী এত পড়েন ম্যাডাম?”

“কে জানে, বইয়ের একটা লিস্ট বানিয়েছে, সেই লিস্ট মিলিয়ে দুটি করে বই নিয়ে আসে, এটাই দেখি।”

লিস্ট বানিয়ে ছেলেবেলায় আমাকেও বাবা জোর করে বই পড়িয়েছেন, নোবল প্রাইজ পাওয়া লেখকদের বই। তাই আশ্চর্য হলাম না। একেনবাবু অবশ্য লিস্টটা দেখতে আগ্রহ দেখালেন। মিসেস কুণ্ডু একটু ইতস্তত করে মেয়ের ঘর থেকে লিস্টটা নিয়ে এলেন। লিস্টটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং। কোনো বিখ্যাত লেখকের বই সেখানে নেই। যে বইগুলো আছে, তার একটার নামও আমি দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। এ-রকম অখ্যাত লেখকদের বই পড়ে সময় নষ্ট করার কারণ কী? কারণটা অবশ্য মিসেস কুণ্ডু নিজের থেকেই বললেন। মেয়ের খুব ইচ্ছে বই প্রকাশনা সংস্থা খোলে। অচেনা অজানা লেখকদের মধ্যে যাদের প্রতিভা আছে তাদের আবিষ্কার করার চেষ্টা করছে। এদের বই ছাপিয়েই শুরু হবে প্রকাশনার জয়যাত্রা। খুব একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া নয়, আবার একেবারেই যে বাজে তা বলছি না। সতেরো বছর বয়সে নানান স্বপ্ন থাকবেই। কিন্তু মনে হয় না এ ব্যাপারে শুভংকরবাবুর খুব একটা সহায়তা কন্যা পাবে।

আমরা যখন উঠছি, তখন শুভংকরবাবুর ভাগ্নে সুবীর এসে হাজির। ভালোই হল ওর কাছ থেকেও যা খোঁজ নেওয়ার নেওয়া যাবে। সুবীর দেখলাম একেনবাবুর কথা শুভংকরবাবুর কাছে ইতিমধ্যেই শুনেছে। একেনবাবু সরাসরি প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা স্যার, অজয়বাবু তো আপনার বন্ধু, তাই না?”

“ছিল, এখন আর যোগাযোগ নেই।”

“কেন স্যার?”

“আসলে অজয় শ্রীময়ীর সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি করছিল দেখে মামা খেপে গিয়ে ওকে তাড়ান। তারপর আমাকেও বলেছেন যোগাযোগ না রাখতে। আমি মামাকে এ নিয়ে চটাতে চাইনি।”

“শ্রীময়ীদেবীর সঙ্গে কি অজয়বাবুর কোনো যোগাযোগ আছে?”

“যদি থেকেও থাকে, আমি বলতে পারব না।”

“আপনি কি জানেন স্যার, আপনার মামা কেন আমাকে ডেকেছেন?”

“হ্যাঁ, শ্রীময়ীর সঙ্গে কার পত্রালাপ চলছে, সেটা বার করার জন্য।”

“কার সঙ্গে উনি পত্রালাপ করছেন আপনার ধারণা আছে?”

“ধারণার সঙ্গে বাস্তবের কী সম্পর্ক?”

“তবু শুনি না স্যার, আপনার ধারণা কী?”

সুবীর একটু ইতস্তত করে বলল, “মনে হয় অজয়ের সঙ্গে।”

“এটা কেন মনে হচ্ছে স্যার?”

“অজয়কে আমি চিনি। ও যদি কিছু করবে ঠিক করে, তা করবেই কেউ আটকাতে পারবে না।”

“কিন্তু এটা তো এক তরফা ব্যাপার নয়, এখানে মিস শ্রীময়ীও চিঠি লিখছেন।”

“শ্রীময়ীও খুব একরোখা মেয়ে। এ ব্যাপারে অজয়ের সঙ্গে মিল।”

“আই সি। তা এই অজয় এখন কী করেন স্যার?”

“অনেক কিছুই করে কানে আসে, কিন্তু ঠিক কী করে সত্যিই আমি জানি না। দুঃখের কথা হি ওয়াজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। বয়োকেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। শুধু পড়াশুনোই নয়, ছেলেবেলা থেকেই গাছপালা, মাটি, জল, ইত্যাদি নিয়ে কত যে এক্সপেরিমেন্ট করত! বাড়িতে ছোটোখাটো ল্যাবোরেটরি করেছিল বন্ধুবান্ধবের টাকায়। আমিও কিছু টাকা দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আরেকজন জগদীশ বসু হবে।”

“আপনি যে বললেন ‘অনেক কিছুই করেন’, সেগুলো কী স্যার?”

“দেখুন, এগুলো সত্যি কি মিথ্যা আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। যেটা সত্যি, সেটা হল নিতান্ত সাধারণ অবস্থা থেকে ও হঠাৎ বেশ কিছু টাকা হাতে পেয়েছে! মাঝেমধ্যে হংকং, ব্যাঙ্কক এইসব জায়গায় যায়। কাশ্মীর, আফগানিস্তানের মতো জায়গাতেও গিয়েছে। কেউ কেউ বলে ও নাকি একটা স্মাগলিং রিং-এর সঙ্গে যুক্ত, টেররিস্ট লিঙ্কও আছে। উলটো দিকে সি.আই.এ-এর হয়ে কাজ করছে সেটাও শুনেছি।”

“দাঁড়ান স্যার, দাঁড়ান! আপনি না একটু আগে বললেন ওঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, এগুলো জানলেন কী করে?”

“কী আশ্চর্য, আমাদের কমন ফ্রেন্ডস তো আছে!”

“বুঝলাম স্যার। ও আরেকটা কথা, এ বাড়িতে আপনার সঙ্গেই মিস শ্রীময়ীর সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ, আপনাকে কি উনি কিছু বলেছেন ওঁর চিঠিপত্রের ব্যাপারে?”

“কিচ্ছু না। না বলে আমাকে বাঁচিয়েছে।”

“কেন স্যার?”

“বললে মামাকে বলতে হত, নইলে আমি জেনেও কিছু জানাইনি বলে আমার সর্বনাশ করতেন, আর বললে শ্রীময়ীর সর্বনাশ হত!”

“এটা মন্দ বলেননি স্যার। আচ্ছা অজয়বাবুর ঠিকানাটা আপনার জানা আছে?”

“ও থাকে ডোভার লেনে। ঠিকানাটা বলতে পারব না, কিন্তু বাড়ির ডিরেকশনটা দিতে পারি।”

“তাই দিন স্যার।”

সুবীর একটা কাগজে এঁকে বুঝিয়ে দিল কোথায় যেতে হবে। গড়িয়াহাট রোড থেকে ঢুকে ক’টা বাড়ি পরে পড়বে সেটাও বলে দিল। সুতরাং বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হবার কারণ নেই।

“একটা ফোন করে যাবেন, নইলে ওর দেখা পাওয়া কঠিন।”

“ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে?”

“সুবীর ওই কাগজেই নম্বরটা লিখে দিল।”

আমরা চলে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একেনবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে সুবীরকে জিজ্ঞেস করলেন,

"আরেকটা কথা স্যার, আর কাউকে কি আপনি সন্দেহ করেন যার সঙ্গে মিস কুণ্ডুর বন্ধুত্ব থাকতে পারে?"

"না, আর কাউকে মনে আসছে না।"

"আপনার সঙ্গে মিস কুণ্ডুর সম্পর্কটা এখন কীরকম?"

"হোয়াট ডু্য ইউ মিন? ও আমার বোন!" সুবীরের গলায় বিরক্তির ভাব স্পষ্ট।

"আরে না স্যার, ওঁর সঙ্গে শুভংকরবাবুর তো বাক্যালাপ নেই, আর আপনি শুভংকরবাবুর প্রিয় ভাগ্নে, তার কোনো এফেক্ট... তাই প্রশ্নটা করলাম...এনি ওয়ে, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

বেরিয়ে এসে প্রমথ বলল, "চোরের মন বোঁচকার দিকে। যেই জিজ্ঞেস করলেন শ্রীময়ীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা, কেমন ঝাঁঝিয়ে উঠল দেখলেন।"

"তাই তো দেখলাম স্যার।"

"মিসেস কুণ্ডু হয়তো ঠিকই সন্দেহ করছেন। হয়তো অজয়কে দাঁড় করানো হয়েছে একটা ফলস টার্গেট হিসেবে। এটা সুবীর আর শ্রীময়ীর জয়েন্ট প্ল্যান।"

"কথাটা ভুল বলিসনি," আমি বললাম, "ফ্র্যাঙ্কলি মেয়েটার যা দুর্দান্ত চেহারা, কে-না প্রেমে পড়তে চাইবে! তবে বিয়ে করতে পারবে না। রিলেশনশিপটা নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে।"

"হু কেয়ার্স?"

"হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট কেয়ার্স। আইন বলে তো একটা ব্যাপার আছে।"

"আপনি কী বলেন একেনবাবু?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

একেনবাবু বললেন, "আমি একটু কনফিউসড স্যার।"

"কেন?"

তার কোনো উত্তর দিলেন না। টিপিক্যাল একেনবাবু। মাঝে মাঝে বকবকিয়ে কানের পোকা বার করে দেন, মাঝে মাঝে মৌনব্রত নেন।

একেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছেই প্রমথ বলল, "বউদি, চা হবে?"

"হবে ভাই, কিন্তু কাজ হল?"

"আপনার কর্তাকে জিজ্ঞেস করুন, তিনিই তো গোয়েন্দা।"

বউদি একেনবাবুর দিকে তাকাতেই উনি বললেন, "খুবই কনফিউসিং।"

"তোমার তো সব কিছুই কনফিউসিং," বলে একেনবউদি চায়ের তদারক করতে গেলেন।

"কি কনফিউসিং বলুন তো, সুবীর আর মিস কুণ্ডুর ব্যাপারটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সেটা তো বটেই স্যার, কিন্তু আমি ভাবছি শুভংকরবাবুর কথা।"

"ওতে কনফিউশনের কী আছে?"

"না, আমি ভাবছি স্যার যে, আজকালকার মেয়েরা তো খুচখাচ প্রেম অনেকেই করে, কিন্তু তাতে কি বিয়ে ভেস্তে যায়? মানে, যদি সত্যিকারের সিরিয়াস কিছু না হয়। শুভংকরবাবু তো সোজাসুজি পাত্রপক্ষকে বলতেই পারতেন মেয়ের একজনের সঙ্গে ভাব ছিল, কিন্তু এখন আর তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। এ নিয়ে এত টেনশন কেন?"

"এক্স্যাক্টলি," প্রমথ বলল। "নিগোশিয়েটেড ম্যারেজে যেসব মেয়েদের জিওগ্রাফি, মানে

গায়ের উঁচু-নীচু ভালো, তাদের হিস্ট্রি জানতে গেলেই মুশকিল। আর যাদের হিস্ট্রি ভালো, তাদের যা জিওগ্রাফি... দেখলে পাত্রপক্ষের পছন্দ হবে না।”

“তুই চুপ করবি,” আমি বললাম। “অত্যন্ত ডিসরেস্পেক্টফুলি কথা বলিস মেয়েদের সম্পর্কে।”

“ডিসরেস্পেক্টের কী দেখলি! আমি বলছি বাস্তব সত্য। তুই একটা বাজে চেহারার মেয়েকে বিয়ে করবি?”

“হ্যাঁ, পুরুষরা তো সব কন্দর্পকান্তি, তাদের সবার জন্যই অপ্সরার দরকার হবে। আসল কথা মানুষের মনটা কেমন, অন্যগুলো সব বাহ্যিক।”

“গুড। কিন্তু এও তো সত্যি, আজ সব জেনেও তোর সঙ্গে যদি শ্রীময়ীর বিয়ের কথা ওঠে, তুই ওর মনটা পরীক্ষা করার আগেই উর্ধশ্বাসে ছুটবি বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য।”

“তুই থামবি, মেয়েটা আমার হাঁটুর বয়সি!”

“বাপির সঙ্গে তর্ক করে আমি সময় নষ্ট করব না,” প্রমথ একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল। “আপনি বলুন, শুভংকরবাবুর এত টেনশনের কারণটা কী?”

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে।

“আই হ্যাভ নো ক্লু স্যার।” একেনবাবু বিস্কুটে কামড় বসিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন।

।। ৫।।

পরদিন একেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম যে, উনি অজয়কে ফোনে ধরতে পেরেছেন। অজয় খুব ব্যস্ত। বাড়িতে দেখা হবে না, তবে সন্ধ্যার সময়ে অগ্রগামী লাইব্রেরিতে কিছুক্ষণের জন্য আসবে। সেখানে আমাদের মিনিট দশ-পনেরো সময় দিতে পারে। দ্যাট্স ইট।

ঠিক হ্যায়, সন্ধ্যার সময়ই সবাই যাব।

একেনবাবু দেখলাম অগ্রগামী লাইব্রেরির উপর একটু চটা। বললেন, “যাই বলুন স্যার, যাচ্ছেতাই সার্ভিস লাইব্রেরিটার। নিউ ইয়র্কের কম্যুনিটি লাইব্রেরিগুলোতে গিয়ে এদের ট্রেনিং নেওয়া উচিত।”

বিরক্তির কারণটা একটু বাদেই জানলাম। একেনবউদির কার্ড হারিয়ে যাওয়ায় নতুন কার্ড করাতে কয়েকদিন আগে বউদিকে নিয়ে লাইব্রেরি গিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টা লাগবে কার্ড বানাতে। বেশ কিছু ফেরত দেওয়া বই একটা টেবিলে জমা করা আছে, মনে হয় খানিক বাদে বাদে ওগুলো র‍্যাকে তোলা হয়। বউদির পছন্দের একটা বই ওখানে দেখতে পেয়ে চাইতেই ডেস্ক-লাইব্রেরিয়ান বললেন, কার্ড না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ বইয়ের কার্ড আর মেম্বারশিপ কার্ড একসঙ্গে ক্লিপ করে জমা রেখে বই ইস্যু করা হয়।

একেনবাবু বললেন, “আধ ঘণ্টা বাদেই তো কার্ডটা পেয়ে যাবেন!”

কে শোনে?

একেনবাবুর মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল। লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা স্যার, যদি দুটো বই চাই, কার্ড তো একটা?”

“তাহলে দুটো কার্ড লাগবে। যতগুলো বই একসঙ্গে নিতে চান, ততগুলো কার্ড

করাতে হবে।”

অত্যন্ত সেকেলে নিয়ম! একেনবাবু ঠিক করলেন সুযোগ পেলে কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে হবে। তিনটে বই নিতে চাইলে তিনটে কার্ড? ননসেন্স!

ওঁরা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার্ড আসার অপেক্ষা করছেন, একটি সুন্দরী মেয়ে এসে টেবিলে রাখা আরেকটা বই চাইতেই কার্ড না নিয়েই লাইব্রেরিয়ান বইটা ইস্যু করে দিলেন। একেনবাবু সেটা দেখতে পেয়ে প্রশ্ন তুলতেই লাইব্রেরিয়ান বললেন, ‘কার্ডটা ওঁর গাড়িতে আছে, ড্রাইভার এখুনি এসে দিয়ে যাবে।’

আসল ব্যাপারটা পরে জানা গেল, মেয়েটি লাইব্রেরির এক ট্রাস্টির মেয়ে!

প্রমথ কাহিনিটা শুনে বলল, “ওগুলো বাজে কথা, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আপনি যদি আঠেরো-উনিশ বছরের তন্বী হতেন, আপনিও বইটা পেতেন। হুমদো মোটা লোক হলেও পেতেন, তবে কিনা ডেস্ক-লাইব্রেরিয়ানের হাতে দশ-বিশ টাকা ধরিয়ে দিতে হত। আপনার তো জানা উচিত। পুলিশে চাকরি করতেন এতদিন... দেশটা তো এভাবেই চলে।”

“জানি স্যার, ভেরি ব্যাড।”

“আপনার কিন্তু ওই মেয়েটিকে কনফ্রন্ট করা উচিত ছিল,” আমি বললাম। “কেন বাবার সুবাদে এভাবে অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে?”

“সেটা মন্দ বলেননি স্যার। এবার যখন দেখা হবে সেই প্রশ্নটাই করব।”

“তার মানে?”

“মানে স্যার, মেয়েটি হলেন মিস শ্রীময়ী। কাল ছবি দেখেই চিনতে পারলাম।”

সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায় অজয় যেতে বলেছিল। আমরা তার কিছুক্ষণ আগেই গিয়ে পৌঁছোলাম। মোবাইলে ফোন করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একজন সুবেশ যুবক অজয় বলে নিজের পরিচয় দিল। তারপর বলল, “কী ব্যাপার বলুন তো, আমার খোঁজ কেন করছেন?”

একেনবাবু ইনিয়ে বিনিয়ে আসল কারণটাতে পৌঁছোনোর আগেই অজয় বলল, “দেখুন, আমি তাস লুকিয়ে খেলি না। শুভংকরবাবু আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন কে তাঁর মেয়েকে চিঠি লিখছে আর কে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে বার করতে, তাই তো?”

“অনেকটা তাই স্যার।”

“তার উত্তর হল, আমি চিঠি লিখছি, কিন্তু আমি ভয় দেখাচ্ছি না। কারণ তার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। শ্রীময়ীকে আমি ভালোবাসি, আমি ওকে বিয়েও করব। শ্রীময়ীর বাবা আপনার মতো একশো গোয়েন্দা দিয়েও সেটা আটকাতে পারবেন না।”

একেনবাবু বললেন, “কিন্তু স্যার, উনি যদি বিয়ে না দেন।”

“ওঁকে বিয়ে দিতে হবে কেন, শ্রীময়ী যেদিন আঠেরো বছরে পা দেবে, সেদিনই আমরা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করব। শুভংকর কুণ্ডু সেটা ঠেকাতে পারবেন?”

“কিন্তু স্যার, উনি তো ওঁর সম্বন্ধ অন্য জায়গায় করেছেন!”

“সে বিয়ে হবে না, কারণ শুভংকরবাবুর মারণাস্ত্র আমার হাতে আছে।”

“কী স্যার সেটা?”

“সেটা আপনাকে বলব কেন?” কথাটা শেষ করতে না করতেই অজয়ের ফোন বাজল। “আপনি এসে গেছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আসছি...” বলে হাত তুলে আমাদের ‘বাই’

বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

আমরা অবশ্য অত দ্রুত বেরোতে পারলাম না। আমার সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল, সেটা খুলে সিকিউরিটিকে দেখাতে হবে। আমার আগে জনা দুই ছিল। তারা আবার অনেক বই নিয়ে যাচ্ছে। সেগুলো ইস্যু করা হয়েছে কিনা দেখতেও একটু সময় লাগল। তবে একই নিয়ম সবার জন্য নয়। যে হেড লাইব্রেরিয়ান সেদিন বললেন, সব কর্মচারীদের ব্যাগ চেক করা হয়। উনি নিজেই আমার সামনে একটা বড় ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, সিকিউরিটি টুঁ শব্দ করল না।

।। ৬।।

এরমধ্যে একদিন শুভংকরবাবু এলেন। কেসটা এতটুকু এগোয়নি দেখে মনে হল বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

"আপনার কত খরচ হয়েছে?" একেনবাবুকে প্রশ্ন করলেন।

"বিশেষ কিছুই নয় স্যার।"

"তাও এই টাকাটা রাখুন," বলে একটা পাঁচ হাজার টাকার চেক হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "ভেবেছিলাম, ব্যাপারটার একটা কিনারা করে ফেলবেন, কিন্তু কিছুই পারলেন না! বিয়ের বন্দোবস্ত করছি, অথচ কী ঘটতে চলেছে জানি না।"

আমরা সবাই চুপ।

"আমাদের বনেদি পরিবার। আমার বাবা ও জ্যাঠা এখনও বেঁচে। শেষে অঘটন ঘটলে তার পরিণতি কী হবে, সেটা আপনারা কতটা বোঝেন জানি না।"

আমরা সবাই বাঙাল, বাপ-ঠাকুরদা উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছেন। বনেদিয়ানা বস্তুটা কী সেটা আমরা বুঝি না, সেইজন্যই নিশ্চয় মন্তব্যটা করা।

"আমারা আপ্রাণ চেষ্টা করছি স্যার," একেনবাবু সাফাই গাইলেন।

"বহু পড়াশুনো করে ফেল করলেও সেটা ফেলই," বলে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

শুভংকরবাবু চলে যেতে আমি বললাম, "ভদ্রলোক বোধহয় জবাব দিয়ে গেলেন।"

প্রমথ বলল, "'বোধহয়' কথাটা আর জুড়ছিস কেন। সোজা ফুটিয়ে দিয়ে গেলেন। তখনই আমি বলেছিলাম, এইসব ছেঁদো কাজ না নিতে!"

এরমধ্যে আমি আর প্রমথ দু-দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে শুনলাম মস্ত সুখবর, একেনবউদি অবশেষে আমেরিকা যেতে রাজি হয়েছেন। একেনবাবু খুশীতে ডগমগ। বললেন, "বুঝলেন স্যার, ফ্যামিলিকে যে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারব ভাবিনি। এবার আমেরিকাতে গিয়ে কোনো দুর্ভাবনা থাকবে না। ফ্যামিলি দূরে থাকলে স্যার, বুঝতেই তো পারছেন... একটা টেনশন।"

প্রমথ গম্ভীর ভাবে বলল, "আপনিও টেনশন-মুক্ত, আমরাও।"

"কেন স্যার?"

"এতদিন আপনার হ্যাপা সামলাতে সামলাতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এখন আপনিও বউদিকে নিয়ে নিরিবিলিতে থাকবেন, আমাদেরও ঝাড়া হাত-পা।"

"কেন স্যার, আমি কি এতই জ্বালিয়েছি আপনাদের?"

"প্রমথর কথা ছাড়ুন তো! ওখানে গিয়ে আপনাদের জন্য কাছাকাছি একটা জায়গা

দেখতে হবে।”

“বাপি কাছাকাছি কেন বলছে জানেন তো? যাতে বউদির রান্না যখন তখন গিয়ে খেয়ে আসতে পারে।”

“কী আশ্চর্য স্যার, ফ্যামিলি ওখানে থাকলে আপনারা অন্য কোথাও হাবিজাবি খাবেন, এটা কি হয় নাকি?”

“কেন মশাই, আমি কি বাজে রাঁধি?” প্রমথ তেড়ে উঠল।

“না, না, তা নয় স্যার। ফ্যামিলি খুশি হবে আপনারা খেলে। আপনাদের খুব পছন্দ করে ও।”

কথাটা মিথ্যে নয়, একেনবউদি একজন গ্র্যান্ড বউদি। একেনবাবু বাঙাল, কিন্তু উনি কলকাতার মেয়ে। এত যত্ন করেন আমাদের দু-জনকে, মনে হয় আমরা ওঁর আপন ভাই।

আদরের তাড়নায় প্রমথ তো একদিন বলেই ফেলল, “আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করেন বউদি!”

“কী যে বলেন ভাই, ওঁকে তো আমি চিনি, আপনারা দু-জন ওখানে না থাকলে কোথায় খেত, কী করত, ভাবতেও ভয় করে।” তারপর একটু মিষ্টি হেসে বললেন, “উনি কী বলেছেন জানেন?”

“কী?”

“আপনাদের বৌ খোঁজার জন্য নাকি আমাকে চেষ্টা করতে হবে।”

“রক্ষে করুন বউদি, ওইটি করবেন না,” আমি বললাম। “দেশে আসা ছেড়ে দেব ভাবছিলাম মায়ের বিয়ের তাগিদের জন্য। এখন ওখানে গিয়ে যদি আপনার তাগাদা শুরু হয়, তাহলে ইউরোপে কোথাও চাকরির খোঁজ করতে হবে। তবে হ্যাঁ, প্রমথ আর ফ্র্যান্সিস্কার বিয়েটা মনে হয় আপনাকেই ওখানে দিতে হবে। এখানে ও খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছে না।”

“চুপ কর শালা! সরি বউদি, বাপিটা এত ইডিয়টের মতো কথা বলে, মাথা ঠান্ডা রাখা কঠিন হয়ে যায়।”

“থাক ভাই, বউদির কাছে আর অত লজ্জা পেতে হবে না।”

“একটু পাওয়া ভালো বউদি,” আমি বললাম। “তাতে যদি মুখটা একটু শুদ্ধ হয়। ভাগ্যিস ফ্র্যান্সিস্কা বাংলা জানে না, নইলে আউট-রাইট ওকে রিজেক্ট করত।”

“করত না, কারণ গালাগালগুলো আমি তোকে দিই এ ট্রুলি ডিসার্ভিং ক্যান্ডিডেট। চাস তো খিস্তিগুলো ট্র্যান্সলেট করে বলে দিস, তারপর দেখিস কী রিয়্যাকশন হয়।”

“মাপ কর, ওগুলো আন্-ট্র্যানস্লেটেবল।”

যাক সে কথা, একেনবাবু আর একটা মোক্ষম খবর দিলেন। শুভংকরবাবু শেষ পর্যন্ত মেয়ের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি ঠিক করেছেন অজয়ের সঙ্গেই শ্রীময়ীর বিয়ে দেবেন। হঠাৎ এই অ্যাবাউট টার্নের কারণটা একেনবাবু সঠিক জানেন না। যদিও আমি আঁচ করতে পারছিলাম যে, পাত্রপক্ষের কাছে অপমানিত হবার মানসিকতা ওঁর ছিল না। সংসারে কিছু কিছু লোক আছে যারা জীবনে কারোর কাছে নীচু হতে বা খোঁটা খেতে রাজি নয়। তারা যা করবে, যা ভাববে, সেটাই চূড়ান্ত ও শেষ কথা। তিনি নিজেই সম্বন্ধ ভেঙে অজয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন মাথা উঁচু করে। নিশ্চয় বিয়ে ভেঙে দেবার একটা কারণও জানিয়েছেন পাত্রপক্ষকে। বলেছেন, কেন পাত্রকে বা তার পরিবারকে ওঁর পছন্দ হয়নি। একেনবাবু অবশ্য শুভংকরবাবুর কাছ থেকে ব্যাপারটা শোনেননি। সুবীর এর মধ্যে

ফোন করেছিল একদিন, তার কাছেই জেনেছেন।

প্রমথ বলল, "চেকটা ক্যাশ করেছেন তো? তাড়াতাড়ি করুন, নইলে ওটা হয়তো স্টপ পেমেন্ট করে দেবেন সব কিছু যখন মিটেই গেছে।"

।। ৭।।

আমাদের আমেরিকা ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে। এরমধ্যে একদিন সকালে একেনবাবুর বাড়িতে বসে গল্প করছি, প্রমথ এল। হাতে একটা বই, 'টেররিস্ট এন্ড কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার'। আমি ওর কাছ থেকে বইটা নিয়ে পাতা উলটোতে উলটোতে বললাম, "তোর হল কী, এইসব পড়ছিস!"

"হাতে নিয়ে ঘুরছি, পড়ছি না তো!"

"হাতে নিয়েই বা ঘুরছিস কেন?"

"আর বলিস না, আমার মেসো গতকাল জোর করে হাতে ধরিয়ে দিল... এই দুর্দান্ত বই নাকি সকলের পড়া উচিত! 'না' বলতে পারলাম না, আজ গিয়ে ফেরত দেব।"

"না পড়েই?"

"কেন, তাতে হয়েছে কী, মেসো তো আর পরীক্ষা নিতে যাচ্ছে না?"

"তুই অত্যন্ত ডিজঅনেস্ট।"

"চুপ কর, জ্ঞান দিস না। ও ভালোকথা, অগ্রগামী লাইব্রেরির সেই ডেস্ক-লাইব্রেরিয়ান মারা গেছেন, শুনেছিস?"

"তুই কী করে জানলি?"

"গতকাল মেসোর বাড়িতেই শুনলাম। মাসতুতো ভাই খুব নাটক-ফাটক করে। ওদের দলের সঙ্গেই ওই ডেস্ক-লাইব্রেরিয়ান অভিনয় করেতেন। দুর্দান্ত অ্যাক্টর। হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে কয়েকদিনের মধ্যেই গন।"

"কীসে মারা গেলেন স্যার, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় নাকি?"

আমি জানি ওটাতে একেনবাবুর দারুণ ভয়। খুঁজে খুঁজে পত্রিকায় দেখেন ক-জনের ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে।

"তা বলতে পারব না। তবে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, রক্তবমি এইসব নাকি উপসর্গ ছিল। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক।"

আমি বললাম, "অসম্ভব নয়। তবে হার্ট অ্যাটাকে কি রক্তবমি হয়?"

"নির্ঘাত ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া স্যার," একেনবাবু বললেন। "আমরাও তো লাইব্রেরিতে গেছি। বেশ কয়েকটা মশা ছিল স্যার ওখানে। আমাদের না হলে বাঁচি!"

"ছাড়ুন তো মশাই, অত ভয় থাকলে নিউ ইয়র্কে গিয়ে বসে থাকুন!"

প্রমথর ধমকে বোধহয় একটু কাজ হল। একেনবাবু কিছুক্ষণের জন্য চুপ করলেন।

আমি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বললাম, "কী একেনবাবু, শুভংকরবাবু কি মেয়ের বিয়েতে আপনাকে নেমন্তন্ন করবেন বলে মনে হয়?"

"কে জানে স্যার, তবে না করলেই বাঁচি?"

"কেন মশাই, গিফট কিনতে হবে বলে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"কী যে বলেন স্যার!"

"ঠিকই বলি, আপনার মাথা কোন দিকে যায়, সেটা আমার জানা আছে। তবে চিন্তার কী আছে, সস্তার গিফট দেবেন আর পেট পুরে খাবেন। পয়সা দিব্বি উশুল হবে।"

"আপনি না স্যার, সত্যি!"

"ঠিক আছে, আর জ্বালাব না। আর ফ্র্যাঙ্কলি এ নিয়ে আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। শুভংকরবাবু দু-সপ্তাহের জন্য ইংল্যান্ড না কোথায় জানি যাচ্ছেন, তিনি ফিরলে তারপর বিয়ের আয়োজন হবে। তার আগেই আমরা নিউ ইয়র্কে।"

"তুই এত কথা জানলি কী করে?"

"ইংল্যান্ড কিনা জানি না, তবে বাইরে যাচ্ছেন সেটা অজয়ের কাছে শুনলাম।"

"অজয়ের কাছে?"

"হ্যাঁ। মেসোর বাড়ি থেকে ফেরার পথে চানাচুর কিনতে উজ্জ্বলায় থেমেছিলাম। বিশাল লাইন, সেখানে অজয়ের সঙ্গে দেখা। অবাকই হলাম আমাকে চিনতে পেরেছে দেখে। একেনবাবুর কথা জিজ্ঞেস করল। বলল, 'মনে হচ্ছে আপনার গোয়েন্দা-বন্ধু আমাদের বিয়েটা আটকাতে পারলেন না।' তখনই শুভঙ্করবাবুর বাইরে যাবার খবরটা বলল।"

আমি একেনবাবুকে বললাম, "দেখুন তো, কাজটায় একটা পয়সাও পেলেন না, অথচ শুধু শুধু দুর্নাম কুড়োলেন।"

পত্রিকা টেবিল থেকে পত্রিকাটা তুলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে একেনবাবু বললেন, "তাই তো দেখছি স্যার।" তারপরেই একটা আর্তনাদ, "সর্বনাশ স্যার!"

"কী হল মশাই?"

"দেখেছেন পত্রিকার খবর?"

"কী?"

অগ্রগামী লাইব্রেরির আরও দু-জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে... জ্বর, শ্বাসকষ্ট, রক্তবমি। ঠিক ওই লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোকের মত। আমি বলছি স্যার, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া ছাড়া এটা আর কিছুই হতে পারে না। আই অ্যাম ইন ডিপ ট্রাবল স্যার।"

"আপনি তো আচ্ছা পাগল! গন্ডায় গন্ডায় লোক লাইব্রেরিতে প্রতিদিন যাচ্ছে, কারো কিছু হচ্ছে না, শুধু আপনারই হবে?"

"হবে স্যার, হবে। আমার ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ হয়।"

এমন সময়ে একটা গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল সুবীর। ঘরে ঢুকে একেনবাবুর হাতে একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, "মামা একটু আগে এয়ারপোর্টে চলে গেলেন। গাড়িতে ওঠার সময়ে ওঁর খেয়াল হল, আপনার পুরো ফি দেওয়া হয়নি। তাই ভাগ্নের উপর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।"

"পুরো ফি! আমি তো কিছুই করলাম না স্যার।"

"সেটা আপনি মামা ফিরে এলে বলবেন, এখন তো এটা ধরুন।" বলে খামটা একেনবাবুর হাতে প্রায় জোর করে গছিয়ে দিলেন।

খামটা টেবিলে রেখে একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় উনি যাচ্ছেন স্যার?"

"লন্ডনে। তারপর বোধহয় প্যারিসও যাবেন। মামার ডিসিশন সব সময়ই লাস্ট মোমেন্টে। যাইহোক গুনে নিন। দশ হাজার টাকা থাকার কথা।"

একেনবাবু বললেন, "সত্যি স্যার, এটা কিন্তু আমি নিতে পারি না। পাঁচ হাজার দিয়ে গেছেন, এখন আবার দশ হাজার! কিছু করারই তো সুযোগ পেলাম না!"

"সুযোগ পাবেন কী করে, মামা মত পালটালে? ধরে নিন, এটা ওঁর মত পালটাবার খেসারত। তবে ভালোই করেছেন মত পালটেছেন, অন্য জায়গায় বিয়ে হলে বোনটা অসুখী হত।"

"মতটা পালটালেন কেন স্যার?"

"তা তো বলতে পারব না, অজয়কে জিজ্ঞেস করুন। তবে এলেম আছে ছেলেটার!"

"বিয়েটা হচ্ছে কবে স্যার?"

"ডেট এখনও ঠিক হয়নি, মামা ফিরলে ফাইনালাইজড হবে। মনে হয় জানুয়ারির শেষে।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং! একটু চা বলি স্যার?"

"না, থ্যাঙ্ক ইউ। আমায় এখুনি বেরোতে হবে শ্রীময়ীকে নিয়ে, ড্রাইভার হঠাৎ ছুটি নিয়েছে।"

"ভালো কথা স্যার, আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম অগ্রগামী লাইব্রেরিতে বেশ কয়েক জনের অসুস্থ হওয়া নিয়ে। মিস শ্রীময়ীকে ক'দিন অন্তত ওখানে না-যেতে বলবেন। যদি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়, তাহলে কখন যে কী হয়ে যায়!"

"তাই নাকি, জানতাম না তো!"

"আজকের খবর, স্যার।"

"ঠিক আছে বলে দেব। লাকিলি ও বেশ কয়েকদিন লাইব্রেরিতে যায়নি জানি।"

"তাহলে তো চমৎকার। আরকটা প্রশ্ন স্যার, এই অগ্রগামী লাইব্রেরির একজন ট্রাস্টি তো আপনার মামা। আর ক-জন ট্রাস্টি আছেন?"

"আরও দু-জন, কেন বলুন তো?"

"লাইব্রেরি সিস্টেম-এর ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে একটু আলোচনা করতাম। এই যে স্যার, এক-একটা বইয়ের জন্য এক-একটা কার্ড করা... যাক গে স্যার, ওঁদের সঙ্গে দেখা হলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। ওই দু-জন ট্রাস্টির নাম জানেন স্যার?"

একেনবাবু ঠিক কী বলতে চান, সুবীরের মাথায় ঢুকল না। কিন্তু উত্তরটা দিল, "অন্য দু-জন নামেই ট্রাস্টি। একজন বিকাশ দত্ত, হাঁটুর ব্যথায় শয্যাশায়ী, কানেও শোনেন না। মাঝে মাঝে মামার জন্য ওঁকে দিয়ে ট্রাস্টের কোনো কাগজে সই করাতে যা ঝামেলা হয়! আরেকজন সুরঞ্জন মিত্র। এখন মুম্বাইয়ে থাকেন, কালেভদ্রে কলকাতায় আসেন।"

"তাহলে তো এবার আলোচনাটা হবে না স্যার।"

"আপনি হেড লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। উনিই প্রায় চালান লাইব্রেরি।"

"বেশ, তাই বলব। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।"

"আচ্ছা চলি।"

"আসুন স্যার।"

প্রমথ এই ফাঁকে পত্রিকাটা তুলে নিয়ে পড়ছিল। সুবীর চলে যেতেই বলল, "কী অসুখ হয়েছে কিছু না জেনে খামোকা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার ভয় দেখালেন কেন বলুন তো? সিম্পটমগুলোও তো ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার নয়।"

"কেন স্যার?"

"এই যে রক্তবমি, জ্বর, বুকে ব্যথা এগুলি কি সব ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে হয়?"

"জ্বর আর গায়ে ব্যথা তো হয় স্যার। হয়তো সেইসঙ্গে অন্য কোনো অসুখও হচ্ছে।"

হঠাৎ প্রমথর কাছ থেকে নেওয়া বইটার একটা পাতায় চোখ পড়ল। আমি আর ঠাট্টা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। বললাম, “বুঝলেন, একেনবাবু, সিম্পটমগুলো সব অ্যানথ্রক্সের। নিশ্চয়, নিরীহ বুক-লাভারদের মারবে বলে ‘হেট-বুক’ টেররিস্টরা গুচ্ছের মশাকে অ্যানথ্রক্স খাইয়ে অগ্রগামী লাইব্রেরিতে ছেড়ে দিয়ে গেছে।”

প্রমথ যোগ করল, “শুধু বুক-লাভার কেন, ‘হেট-কলকাতা’ গ্রুপ মশা ব্যবহার করে সারা কলকাতাকেই ধ্বংস করতে পারবে। শুধু একটাই সমস্যা, মশা অ্যানথ্রক্স জীবাণু খেলেও ছড়াতে পারে না।”

একেনবাবু বোধহয় সেই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্যেই বইটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

“কি মশাই, ভয় দূর হয়েছে?”

একেনবাবু আমাদের হাসিঠাট্টায় কান না দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, “আই ওয়াজ এ ফুল স্যার, আই ওয়াজ এ ফুল।” তারপরেই ঘরে অদৃশ্য হলেন।

একেনবাবুর এইসব খ্যাপামিতে আমরা অভ্যস্ত। তাই চেঁচিয়ে বউদিকে বললাম, “বউদি আর এক কাপ চা হবে নাকি?”

খানিক বাদে একেনবাবু ফিরে আসতে প্রমথ বলল, “সেলফ-রিয়্যালাইজেশনটা এত লেটে হল কেন?”

“কী স্যার?”

“এই যে, ‘আই ওয়াজ এ ফুল’ কথাটা বললেন।”

“আই মে বি এ বিগার ফুল স্যার।”

“তার মানে?”

“তার মানে স্যার, এয়ারপোর্ট পুলিশকে শুভংকরবাবুর ব্যাগ সার্চ করতে বললাম।”

“কী বলছেন যা-তা!”

“তাই তো বলছি স্যার, আই মে বি এ বিগার ফুল।”

“দাঁড়ান, দাঁড়ান, কী ব্যাপার বলুন তো?”

“জানি না স্যার, একটা থিওরি, জাস্ট এ থিওরি।”

“আঃ, বলুন না ব্যাপারটা কী!”

“আগে চা-টা আসুক স্যার।”

।। ৮ ।।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে।

একেনবাবু বললেন, “চা-টা আগে খান স্যার, তারপর বলছি।”

চা খাচ্ছি। একেনবাবু ঘন ঘন পা নাড়াচ্ছেন, কিন্তু কিচ্ছু বলছেন না! চা শেষ হতে না হতেই আরেকটা ফোন।

একেনবাবু প্রায় লাফিয়ে উঠে চলে গেলেন। তারপর একটু বাদে ফিরে এসে বললেন, “যাক স্যার, ডায়েরি দুটো পাওয়া গেছে।”

“কী পাওয়া গেছে?” জিজ্ঞেস করলাম।

“ডায়েরি দুটো স্যার, যেগুলো অগ্রগামী লাইব্রেরি থেকে চুরি হয়েছিল।”

“কোথায় পাওয়া গেছে?”

“শুভংকরবাবুর ব্যাগের মধ্যে।”

“দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান।” প্রমথ ধমকের সুরে বলল, “কোয়েশ্চেন-অ্যানসার-এর ফরম্যাট ছেড়ে পরিষ্কার করে বলুন। আমাদেরই এখন কনফিউসড করে দিচ্ছেন!”

“বলছি স্যার, বলছি। আসলে ব্যাপারটা সত্যিই বেশ গোলমেলে! আমার প্রথম থেকেই একটা সন্দেহ ছিল, শুভংকরবাবুর মত একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক— কেন এত বিচলিত হচ্ছেন একটা উড়ো চিঠি পেয়ে? না হয় ওঁর মেয়ের বিয়ে ভেঙেই যাবে। কিন্তু বংশ-মর্যাদা নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করা কেন... অবশ্য এই ‘অনার-কিলিং’-এর খবর-টবর শুনে মনে হল স্যার, পরিবারের সুনাম রক্ষার জন্য বাপ যদি নিজের মেয়েকে পর্যন্ত খুন করতে পারে— তাহলে তো সব কিছুই সম্ভব! সে যাইহোক, এবার রহস্যের কথায় আসি।

শুভংকরবাবু দুটো জিনিস বুঝতে পারছিলেন না। কী করে তাঁর চোখ এড়িয়ে মেয়ে চিঠি চালাচালি করছেন, আর কে চিঠিগুলো দিয়ে ওঁকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছেন। একজন সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেট হলেন যাঁকে ওর মেয়ে চিঠি লিখছেন। কারণ মেয়ের অন্য কোথাও বিয়ে হোক, তিনি অবশ্যই সেটা চাইবেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে স্যার, তিনি ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করবেন কেন, বরং সোজাসুজি পাত্রপক্ষকে জানিয়ে বিয়েটা ভেস্তে দেবেন।”

“অথবা ডুডুও খাব, তামাকও খাব,” প্রমথ বলল। “ব্ল্যাকমেল করে টাকা হাতাবেন এবং পাত্রপক্ষকে জানিয়েও দেবেন।”

“পসিবল স্যার, অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু এটাও সম্ভব যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এই সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সে কথা আপাতত থাক। আগে আসি স্যার, চিঠি চালাচালির ব্যাপারটাতে। চিঠি চালাচালি যে অজয়বাবুর সঙ্গে মিস কুণ্ডু করছেন, সেটা নিয়ে সন্দেহ নেই। রহস্য হল, কী ভাবে চিঠি চালাচালি হচ্ছে। কিন্তু একটু ভাবতেই বুঝলাম, ইট ইজ সো সিম্পল। লিস্ট থেকে পর পর একটা করে বই নেওয়া, আর সেই বইয়ের মধ্যে চিঠি ঢুকিয়ে লাভারকে পাঠানো।”

“দাঁড়ান মশাই, কী করে সেটা সম্ভব?” প্রমথ প্রশ্ন তুলল, “সে বই তো অন্য কারো হাতে যেতে পারে!”

“না স্যার, যে অ্যারেঞ্জমেন্ট ওঁরা করেছিলেন, তাতে পারে না। ভেবে দেখুন স্যার, একেবারেই অখ্যাত লেখকের অজানা বইয়ের লিস্ট। কে ওই বই পড়ার জন্য হাপিত্যেশ করে থাকবে! বইগুলো সব সময়েই লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে। আর বইগুলো ফেরত দেবার পরে সেগুলো আলমারিতে ওঠার আগেই আরেকজন বইটা ইস্যু করে নেবে। লাইব্রেরিতে যাবার টাইমিংটা ঠিক রাখতে পারলে তো এতে কোনো অসুবিধা থাকে না স্যার।”

আমি বললাম, “বুঝেছি। শ্রীময়ী এসে চিঠি-লুকোনো বইটা জমা দেবে, আর বইটা রিসিভ হয়ে র‍্যাকে যাবার আগেই অজয় সেটা নিজের নামে ইস্যু করাবে। তারপর নিজের চিঠি ঢোকানো বইটা জমা দেবে। শ্রীময়ী খানিক বাদে লিস্টের আরেকটা বই আলমারি থেকে তুলে এনে সেটা আর অজয়ের সদ্য জমা-দেওয়া বইটা লাইব্রেরিয়ানকে দিয়ে ইস্যু করিয়ে বাড়ি ফিরবে। অন্য কারো হাতে পড়ার সম্ভবনা নেই।”

“এক্স্যাক্টলি স্যার। সেটাই আমি দেখেছিলাম, যখন মিস শ্রীময়ী টেবিলে ফেরত আসা একটা বই ইস্যু করে নিলেন। তখন অবশ্য বুঝিনি ব্যাপারটা। কিন্তু প্রমথবাবু আমার

চোখটা খুলে দিলেন।”

“আমি!”

“হ্যাঁ স্যার, আপনি বললেন না যে, টাকা ফেললে আমিও ওই ভাবে বই নিতে পারতাম। তখনই ক্লিয়ার হতে শুরু করল চিঠি চালাচালির সহজ প্ল্যানটা। অর্থাৎ এর জন্য একটা সাহায্যের দরকার। সেই সাহায্যটা করতে পারেন সার্কুলেশন ডেস্কে বসা লাইব্রেরিয়ান। আমার ধারণা স্যার অজয়বাবু ওকে টাকাপয়সা দিয়ে হাত করিয়ে এই বন্দোবস্তটা করেছিলেন। এটা স্যার চমৎকার চলছিল। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোকও বুঝতে পারছিলেন কী হচ্ছে! মুশকিল হল, উনি লোভ সামলাতে পারেননি... সুন্দরী মেয়েকে লেখা প্রেমপত্র আর সুন্দরীর লেখা উত্তর... এগুলো কি না পড়ে পারা যায় স্যার? একটু সুযোগ পেলেই উনিও লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠিগুলো পড়তে শুরু করলেন। মিস শ্রীময়ীর একটা চিঠির মধ্যেই অজয় পেয়ে গেলেন শুভংকরবাবুকে ঘায়েল করার মারণাস্ত্র আর ওই লাইেব্রিয়ানমশাই পেয়ে গেলেন তাঁর ব্ল্যাকমেলের হাতিয়ার।”

“মারণাস্ত্র!”

“হ্যাঁ স্যার, ওই ডায়েরি চুরির ব্যাপারটা। ওই ব্যাপারটা স্যার আমাকে একটু ভাবিয়েছিল। ছিঁচকে চোর ওটা চুরি করবে না, ওর মূল্যই বুঝবে না। একজন গবেষক তার মূল্য বুঝলেও, সেটা বিক্রি করবার যে মার্কেট, সেখানে সহজে ঢুকতে পারবে না। আপনাদের মনে আছে কিনা, আমরা যখন ডায়েরি দুটো দেখতে গিয়েছিলাম, তখন শুনেছিলাম দুটোই অদৃশ্য হয় লাইব্রেরির একজন ট্রাস্টি সেগুলো দেখে যাবার পরে। ট্রাস্টিদের একজন হলেন শুভংকরবাবু আর একমাত্র তিনিই গত দু-সপ্তাহের মধ্যে বেশ কয়েকবার লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন অবশ্য মিস শ্রীময়ীকে পাহারা দেবার জন্য। ব্যবসার সূত্রে বিদেশে ওঁর অনেক কানেকশন আছে। উনি কি ডায়েরি-দুটো সরাতে পারেন? অসম্ভব নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা মিস শ্রীময়ীর চোখে পড়ে যাওয়াটাও খুবই সম্ভব। তারপর যখন মিসেস কুণ্ডুর কাছে শুনলাম লাইব্রেরি থেকে ফিরে বাবা আর মেয়ের তুমুল ঝগড়ার কথা, চিন্তা শুরু করলাম তার কারণটা কী হতে পারে? যে মেয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছে, হঠাৎ কী এমন ঘটল, যার জন্য সেই মেয়ে বাবার ঘরে ঢুকে চেঁচামেচি করবে? আর মেয়ের সঙ্গে ঝগড়ার কারণটা শুভংকরবাবুই বা কেন স্ত্রীকে জানাবেন না? একটু স্ট্রেঞ্জ স্যার, তাই না? তাহলে কি এর সঙ্গে ডায়েরি-চুরির ব্যাপারটাই জড়িত?”

“কিন্তু শ্রীময়ী অজয়কে এটা জানাল কেন?”

“শুধু অনুমান করতে পারি স্যার। লাইব্রেরিতে বাবার এই আচরণে মিস শ্রীময়ী মনে মনে দগ্ধ হচ্ছিলেন। এমনিতেই শুভংকরবাবুর ওপর মিস শ্রীময়ীর রাগ ছিল, এখন তাতে ঘৃতাহুতি পড়ল... যে-বাবা বংশ-মর্যাদা রক্ষার জন্য অজয়বাবুর সঙ্গে ওঁর বিয়ে আটকাচ্ছেন, তিনি কিনা আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে অম্লান বদনে ডায়েরি চুরি করছেন! কী শকিং! কাকে এটা জানাবেন, প্রিয়তমকে ছাড়া? কিন্তু ফলটা হল শুধু অজয়বাবু না, আমাদের লাইব্রেরিয়ানমশাইও এই গোপন তথ্যটি জেনে গেলেন। যে চিঠিতে শুভংকরবাবুকে ভয় দেখানো হয়েছিল, সেটা মেয়ের পুরোনো প্রেমের কথা ভাবি-শ্বশুরবাড়িতে জানানো নিয়ে নয়, ডায়েরি চুরির ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া নিয়ে। এই কারণেই চিঠিটা স্যার শুভংকরবাবু আমার হাতে দেননি, পুলিশকেও ব্যাপারটা জানাতে চাননি। বুঝলেন স্যার, কী বলছি?”

“এ পর্যন্ত বুঝলাম, কিন্তু তারপর?”

"তারপর স্যার, শুভংকরবাবু আমাদের উপর ভরসা রাখতে পারলেন না। সোজা অজয়বাবুর দ্বারস্থ হলেন। ওঁর প্রথমে ধারণা হয়েছিল, হয়তো অজয়বাবুই মিস শ্রীময়ীকে পাওয়ার জন্য ওঁকে ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু অজয়বাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন, সেটা নয়। অজয়বাবুও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, আর কে ব্যাপারটা জানতে পারে, বিশেষ করে চিঠির একটা জেরক্স কপি যখন শুভংকরবাবু পেয়েছেন। ওঁদের মধ্যে নিশ্চয় একটা চুক্তি হল, অজয়বাবু লোকটিকে খতম করবেন আর শুভংকরবাবু তাঁর কন্যাকে অজয়বাবুর হাতে সমর্পণ করবেন।"

"মাই গড," আমি বললাম।

"কিন্তু অজয় এ প্রস্তাবে রাজি হল কেন? সে তো এমনিতেই শ্রীময়ীকে পাচ্ছিল!" প্রমথ প্রশ্ন তুলল।

"অর্থ অনর্থম স্যার। আমার ধারণা টাকার লোভে। মিস শ্রীময়ীকে হয়তো পেতেন, কিন্তু শ্বশুরের সম্পত্তি পেতেন না। এক্ষেত্রে দুটোই মিলল। যেমন শ্বশুর, তেমনি জামাই স্যার। অজয়বাবু এলেমদার লোক, আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রুপের সঙ্গে কানেকশন ওঁর নিশ্চয় ছিল। সেই সূত্রেই অ্যানথ্রক্সের মতো ভয়াবহ পাউডার উনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। লাইব্রেরিয়ানকে মারাটা কোনো প্রব্লেমই নয়। মনে আছে স্যার, আমেরিকাতে একজন পোস্টম্যান আর এক মহিলা চিঠিতে অ্যানথ্রক্স থাকায় মারা গিয়েছিলেন?"

"তা আর নেই!"

অজয়বাবু নিশ্চয় সেটা জানতেন। খামের ভেতরে অ্যানথ্রক্স পাউডার ছড়িয়ে, যে-রকম সাধারণত লেখেন তেমন একটা চিঠি সেখানে ঢোকালেন। এসব করতে গিয়ে নিজে যাতে মারা না যান, তার জন্য সব রকম সতর্কতা নিশ্চয় নিয়েছিলেন। এবার বইয়ের মধ্যে খামটা পুরে, বইটা সাবধানে লাইব্রেরিতে ফেরত দিয়ে এলেন, যেমন সাধারণত দিয়ে আসেন। তবে এই বইটা লিস্ট-এর বাইরে ছিল, যাতে মিস শ্রীময়ী এটা না নেন। এও হতে পারে স্যার, ইতিমধ্যেই অজয়বাবু সম্পর্কে শুভংকরবাবুর সঙ্গে মিস শ্রীময়ীর সমঝোতা হয়ে গেছে। সুতরাং মিস শ্রীময়ী লাইব্রেরিতে আর যাবেন না। অজয়বাবু জানতেন লাইব্রেরিয়ান বইটা খুলে খাম থেকে চিঠি বার করে পড়বেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যানথ্রক্সের জীবননাশী জীবাণু নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গিয়ে ঢুকবে। যার ফল দিন কয়েকের মধ্যেই অবধারিত মৃত্যু।"

"শুভংকরবাবু লন্ডন যাচ্ছিলেন কেন?"

"ওই ডায়েরি দুটো বেচতে স্যার। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। যে পার্টি কিনবে, তারা পরখ করে দেখবে। তাই নিজেই নিয়ে যাচ্ছিলেন।"

আমি বললাম, "ভাগ্যিস, প্রমথ বইটা এনেছিল, নইলে আপনার অ্যানথ্রক্সের থিওরিটা ভেস্তে যেত।"

"এখনও যেতে পারে স্যার। লাইব্রেরি থেকে যারা অসুস্থ হয়েছেন হাসপাতালে তাঁদের আলাদা করে রেখে পরীক্ষা করানোর কথা পুলিশকে বলেছি। পরীক্ষার রেজাল্ট না পাওয়া পর্যন্ত এখনও থিওরি। অজয়বাবুর বাড়িও সার্চ করা হচ্ছে স্পেশাল টাস্কফোর্স দিয়ে।"

"যে গল্প আজ শোনালেন, তাতে ভাবছি কাগজের চিঠি পড়াই ছেড়ে দেব। এখন থেকে স্রেফ, ইমেল।" প্রমথ গম্ভীরভাবে বলল।

খুনের আগে খুনী খোঁজা!

বইয়ের গ্রুপ ॥ বইয়ের চ্যানেল

।। ১।।

এবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে এসে আমাদের পুরনো আড্ডাটা আবার জমে উঠেছে। প্রতি সন্ধ্যাতেই আমি একবার একেনবাবুর বাড়িতে ঢুঁ মারি। প্রমথও আসে। শনি-রবিবার ওঁর বাড়িতে সকালে আমাদের চা আর জলখাবার বাঁধা। একেনবাবু পুলিশের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় পুরোনো একজন সহকর্মীকে নিয়ে একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। পার্টনার অবশ্য এখনও চাকরি করছেন, খাতায় কলমে নামটা হল তাঁর স্ত্রীর। ছুটিতে এসে ওঁর বেতনহীন সহকারী হলাম আমি আর প্রমথ। তবে বেতন হিসেবে যদি একেনবউদির অফুরন্ত স্নেহ, ভালোবাসা এবং স্বহস্তে রান্না চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ধরা যায়, তাহলে তার পরিমাণ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

শনিবার সকালে গরম গরম শিঙাড়া আর জলভরা সন্দেশ নিয়ে একেনবাবু, আমি আর প্রমথ চা খাচ্ছি। একেনবউদি ভেতরে গেছেন, একেনবাবু ঝালমুড়ির বায়না তুলেছেন বলে।

প্রমথর মুখ পত্রিকার আড়ালে, কিন্তু মাঝেমাঝেই বাক্যবাণ ছাড়ছে।

"আপনি মশাই যা-তা, এত খাবার সামনে, তাও ঝালমুড়ির জন্য পোঁ ধরলেন, দেখুন তো বউদিকে আবার ছুটতে হল!"

"আসলে স্যার, আপনারা আসেন, তাই এই শনি-রবিটা ভালো করে খাই।"

"আর অন্যদিন বউদি আপনাকে কিছু খেতে দেন না?"

"তা নয় স্যার।"

"তাহলে?"

"আপনার সঙ্গে স্যার কথায় পারা মুশকিল।"

ঠিক সেই সময়ে একেনবউদি এক বাটি ঝালমুড়ি নিয়ে ঢুকলেন।

"কি ভাই, এত মন দিয়ে কী পড়ছেন?" প্রমথকে প্রশ্ন করলেন একেনবউদি।

এইবার প্রমথ কাগজটা নামাল।

"দেখছিলাম বউদি, একেনবাবুকে কোনো কাজে লাগাতে পারি কিনা, নইলে তো আপনাকে সারাদিন জ্বালিয়ে মারবেন।"

"কিছু পেলেন?" মুখ টিপে হেসে একেনবউদি জিজ্ঞেস করলেন।

"একটা কেস আছে, কিন্তু সিম্পল চুরির কেস, একেনবাবুর মন ভরবে না।"

"তবু শুনি না।"

“সতীশ মিত্রের অফিসে চুরি।”

“সতীশ মিত্র, মানে উকিল সতীশ মিত্র? গড়িয়াহাটে যাঁর বিশাল বাড়ি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“ঠিক। ওঁর অফিস থেকে নানান ফাইলপত্তর চুরি হয়েছে।”

“দেখি,” বলে আমি প্রমথর হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিলাম। সতীশ মিত্রের নাম বেশ কিছুদিন হল খবরের কাগজে খুব বেরোচ্ছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলায় তিনিই প্রধান উকিল।

দেখলাম, ইতিমধ্যেই রাজনীতির খেলা শুরু হয়েছে। বিরোধী নেতারা বলছে যে, এটা সাধারণ চুরি নয়, মামলার দরকারি নথিপত্র চুরি করার জন্যই শাসকদল এটা করিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য দেরাজ একটা ভাঙা হয়েছে বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু খোয়া যায়নি, কারণ তার আগেই বাড়ির কাজের লোক আওয়াজ পেয়ে উপর থেকে নেমে আসায়, চোর পালিয়েছে।

“এই নিয়ে এখন বন্ধ না হলে বাঁচি,” আমি বললাম। হলে কাল আমাদের দীঘা যাওয়া মাটি।

বলতে ভুলে গেছি, আমরা অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম দিন কয়েকের জন্য দীঘায় যাব। রোববার সকালে রওনা দেবার কথা।

“তুই একটা ইডিয়ট,” প্রমথ বলল। “রবিবার কখনো বন্ধ হয়, তাহলে ফায়দাটা কোথায়? বন্ধ হলে সোমবার বা শুক্রবার। আমরা যাচ্ছি রোববার, ফিরছি মঙ্গলবার, সুতরাং সেফ।”

বন্ধ-এর কথায় একেনবাবু উত্তেজিত হলেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে টিভিটা চালালেন। টিভি-তে অবশ্য এ নিয়ে কিছুই শুনলাম না। মিনিট দশেক পঞ্চায়েতের ইলেকশন নিয়ে নানান বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা শোনার পর প্রমথ দুত্তোর বলে উঠে টিভিটা বন্ধ করল।

এমন সময়ে বাইরের দরজায় বেল। একেনবাবুর বাড়ির কাজের মেয়ে নমিতা এসে খবর দিল, এক ভদ্রলোক একেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান, খুব জরুরি।

“দেখো, আবার কী ঝামেলা এল,” বলে একেনবউদি ভেতরে চলে গেলেন।

।। ২।।

একটু বাদে লাঠি হাতে একটু কুঁজো হয়ে যে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন তাঁর বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। দেখে মনে হয় শৌখিন লোক। কাঁচাপাকা চুল, গায়ে কাজ-করা সবুজ সিল্কের দামি পাঞ্জাবি। চোখে গোল্ড রিমের হাই পাওয়ারের চশমা, তাও দেখতে বোধহয় একটু কষ্ট হচ্ছে। আমাদের তিন জনকে দেখে বললেন, “আমি একটু একেনবাবুর সঙ্গে কথা বলব।”

প্রমথ সামনে ছিল, একেনবাবুকে দেখিয়ে বলল, “ইনিই একেনবাবু।”

“আপনি!” ভদ্রলোকের কথার সুরে বিস্ময়, সংশয়, নিরাশা ইত্যাদি অনুভূতিগুলির মিশ্রণ। এতে এখন আর অবাক হই না, একেনবাবুও মনে হয় মজাই পান।

আগন্তুকের বিস্ময়সূচক ‘আপনি’-র উত্তরে বললেন, “হ্যাঁ স্যার, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?”

ভদ্রলোক ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর পকেট থেকে একটা নোটের বান্ডিল বার করে একেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা রাখুন।"

ভদ্রলোকের মাথায় নিশ্চয় গোলমাল আছে, নইলে এভাবে কোনো কথাবার্তা না বলে, কেউ টাকা এগিয়ে দিতে পারে! না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

"এটা?"

"কুড়ি হাজার আছে, অ্যাডভান্স।"

"তা-তো বুঝলাম স্যার, কিন্তু কাজটা কী?"

"আমার খুনিকে আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

লোকটা যে সম্পূর্ণ উন্মাদ, সে বিষয়ে এবার আর সন্দেহ রইল না।

একেনবাবু মাথাটা একটু চুলকে বললেন, "আমি একটু কনফিউসড স্যার, আপনার খুনিকে খুঁজে বার করব!"

"ঠিকই শুনেছেন।"

"কিন্তু আপনি তো বেঁচে আছেন স্যার!"

"এখনও আছি, কিন্তু বেশিদিন থাকব না।"

প্রমথ আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, "একদিন তো আমরা সবাই মরব।"

ভদ্রলোক প্রমথর দিকে একটা চকিত অবজ্ঞা-দৃষ্টি দিয়ে একেনবাবুকে বললেন, "আমাকে খুন করার চেষ্টা চলছে আমি জানি। পুলিশের উপর আমার ভরসা নেই, খুনই হয়তো হব। তাই আগে থেকেই তদন্তের ভারটা আপনাকে দিয়ে যেতে চাই।"

"কারা চেষ্টা চালাচ্ছেন স্যার, মানে আপনাকে খুন করার?"

"সেটা জানলে আর আপনার সাহায্য চাইছি কেন?" ভদ্রলোকের গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল।

"এবার বুঝলাম স্যার। আপনি জানেন খুন করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু ঠিক কারা চালাচ্ছে সেটা জানেন না।"

"এক্স্যাক্টলি।"

"কিন্তু কীভাবে বুঝলেন স্যার, আপনাকে খুন করার চেষ্টা চলছে?"

উত্তরে ভদ্রলোক একটা বড়ো সাদা খাম এগিয়ে দিলেন।

"পড়ুন।"

খামের মধ্যে তিনটে চিঠি। চিঠির উপর এক নম্বর, দু-নম্বর আর তিন নম্বর লেখা।

সাদা কাগজে কালো কালিতে লেখা প্রথম চিঠিটা:

শ্যামল দত্ত: তোমার পাপের শাস্তির দিন রবিবার রাত্রে....

ব্যাস আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় চিঠিটাও একই ভাবে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা।

শ্যামল দত্ত: দানধ্যানে প্রায়শ্চিত্ত হয় না, পাপের শাস্তি পেতেই হবে, অন্তিম দিনের জন্য প্রস্তুত হও□ এই রবিবার।...

তৃতীয় চিঠিটা, কম্পিউটারে ছাপানো। কোনো সম্বোধন নেই। শুধু লেখা: রবিবারই শেষ রজনী। □ ব্যাস আর কিচ্ছু নেই।

আমরা যখন চিঠিটা পড়ছি, ভদ্রলোক বললেন, "প্রথম চিঠিটা আমার লেটার বক্সে কেউ রেখে গিয়েছিল ঠিক ছ'দিন আগে। পরের চিঠিটা তিনদিন আগে, সেটাও ছিল লেটার বক্সে। শেষ চিঠিটা পেয়েছি কাল রাতে। বিগ বাজারে গিয়েছিলাম, কেউ আমার গাড়ির মধ্যে রেখে গিয়েছিল।"

চিঠিটা উলটেপালটে দেখে একেনবাবু বললেন, "আপনি স্যার শ্যামল দত্ত?"

ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে শ্যামল দত্ত, কিন্তু তাও একেনবাবুর প্রশ্নটা করা চাই। এইজন্যেই প্রমথ একেনবাবুকে তুলোধোনা করে। বলে, 'একটা সিম্পল জিনিস আপনার মাথায় ঢুকতে দু-ঘণ্টা লেগে যায়, আবার মোস্ট কমপ্লেক্স প্রব্লেম আপনি সলভ করেন, আপনি মশাই বিধাতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি!'

প্রশ্নটা শুনে ভদ্রলোক মনে হল একটু বিরক্তই হলেন। কী জানি বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে বললেন, "হ্যাঁ।"

"পাপের শাস্তি..." একেনবাবু আস্তে আস্তে আবার পড়লেন, তারপর ঘাড় চুলকে বললেন, "এটার অর্থ কী? কী পাপ? বুঝতে পারছেন কিছু স্যার?"

"না, অন্তত জ্ঞানত কোনো পাপ-কাজ করেছি বলে তো জানি না।"

"পুলিশকে স্যার চিঠিগুলোর কথা জানিয়েছেন?"

"ওদের জানিয়ে কিছু লাভ হয়?" ভদ্রলোক এবার একটু উত্তেজিত হলেন। "প্রথম চিঠিটা পেয়ে ভেবেছিলাম কেউ ফাজলামি করছে। কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিটা পেয়ে একটু দুশ্চিন্তা হল। থানায় গিয়েছিলাম। ডিউটি অফিসার যিনি ছিলেন, পাত্তাই দিলেন না। বললেন, 'মশাই, এসব ফালতু জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমাদের নেই।' আমি বললাম, 'এ-রকম হুমকি দেওয়া চিঠিকে আপনি ফালতু বলছেন?' উনি ঠাট্টা করলেন, 'নিশ্চয় পুজোয় চাঁদা-টাদা দেননি, তাই ক্লাবের ছেলেরা পেছনে লেগেছে।'

"আমি দু-হাজার টাকা চাঁদা দিই পুজোয়, কিন্তু লোকটার সঙ্গে এ নিয়ে কিছু বলতে প্রবৃত্তি হল না। তারপর এই তৃতীয় চিঠি। আমি এখন শিওর ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস। ক'দিন আগে পত্রিকায় আপনার কথা পড়েছিলাম, নিউ ইয়র্কের নানান মার্ডার মিস্ট্রি সলভ করে আপনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তাই সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।"

"কিন্তু পুলিশ হয়তো ভুল বলেনি স্যার, হতে পারে কেউ স্রেফ আপনাকে ভয় দেখিয়ে মজা পাচ্ছে। হত্যার হুমকি দিয়ে যদি কেউ টাকা চাইত, তাহলে অবশ্য দুশ্চিন্তার কারণ থাকত।"

কথাটা শ্যামলবাবুর মোটেই মনঃপূত হল না। গলাটা একটু চড়িয়েই বললেন, "শুধু লেটার বক্সে চিঠিগুলো পেলে হয়তো কথাটা মানতাম, কিন্তু শেষ চিঠিটা পেয়েছি গাড়িতে, তার মানে আমার অজান্তে কেউ আমার পেছনে ঘুরছে। সেটা শুধু স্রেফ মজা করার জন্য?"

"সেটাই একটু স্ট্রেঞ্জ স্যার, মানছি। আপনার ড্রাইভার কাউকে দেখেনি?"

"সে ব্যাটা এক দেশওয়ালির সঙ্গে বসে খইনি খাচ্ছিল। গাড়ির দরজাও লক করেনি। যদিও আমি বার বার ওকে বলেছি, গাড়ি লক না করে দূরে কোথাও যাবি না। কিন্তু কে কার কথা শোনে!"

"কতদিন আপনার চাকরি করছে ড্রাইভারটি?"

"কাজ করেছিল বহুকাল। ইদানীং নেশাভাঙ করে কাজে ফাঁকি দিচ্ছিল, ধমক-ধামকে কাজ হচ্ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার পর ওকে তাড়িয়েছি, আমারই খাবে, অথচ হুকুম মানবে না, এটা তো বরদাস্ত করতে পারি না।"

"তা তো বটেই স্যার। কিন্তু, চিঠিটা বিগ বাজারেই আপনার গাড়িতে কেউ রেখেছিল, সেটা কী করে বুঝলেন?"

"কারণ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে সেটা ছিল না।"

"আপনি শিওর স্যার?"
"হ্যাঁ। আমার সিটের উপর ওটা পড়েছিল।"
"কিন্তু বাড়িতে যখন গাড়িতে উঠলেন, তখন তো অন্যমনস্ক হয়ে চিঠির উপরেও বসতে পারেন।"
"আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন না?" ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়ে বললেন।
"না স্যার, অবিশ্বাসের কোনো ব্যাপার নয়। আসলে এই তিন নম্বর চিঠিটার কাগজটা একটু দোমড়ানো-মোচড়ানো, তাই প্রশ্নটা মনে এল।"
ভদ্রলোক একটু যেন থতমত খেলেন। তারপর উত্তেজিত হয়ে বললেন, "না, আমার পরিষ্কার মনে আছে ওঠার সময়ে সিটে কিচ্ছু ছিল না।"
এই সামান্য প্রশ্নে এত উত্তেজিত হবার কি আছে বুঝলাম না। তবে লোকটা খ্যাপা, সুতরাং নর্মাল লজিকে ওঁর ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না।
"তাহলে স্যার ছিল না," একেনবাবু বললেন।
"আপনার কথার ধরন দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনিও ওই পুলিশের মতো আমার চিন্তাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আপনি কেসটা নেবেন কিনা, বলুন!"
"কী মুশকিল স্যার, নেব না তো বলিনি। কিন্তু..."
"'কিন্তু' কী?"
"ধরুন স্যার, কিছুই যদি না ঘটে।"
একেনবাবু কী বলতে চাচ্ছেন শ্যামল দত্ত মনে হয় আঁচ করলেন। বললেন, "অর্থাৎ আমি যদি না মরি, তাই তো? এই টাকা আমি আর ফেরত চাইব না। এটা কনসাল্টেশন ফি হিসেবে রাখবেন। তাতে আপনার আপত্তি আছে?"
"সে কি স্যার, আপত্তি কেন থাকবে! ঠিক আছে স্যার, আপনার এই কেসটা নিচ্ছি।"
"থ্যাঙ্ক ইউ।" ভদ্রলোক মনে হল একটু স্বস্তি পেয়ে আরাম করে বসলেন।
একেনবাবু চিঠিগুলোতে আরেকবার চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনার কোনো শত্রু আছেন যিনি আপনার মৃত্যু চান?"
"দেখুন, আমি ব্যবসায়ী, অনেকের সঙ্গে আমার লেনদেন, তাতে দু-একজন নিশ্চয় আমার উপর সন্তুষ্ট নয়। তাদের কেউ কেউ আমার মৃত্যু কামনা করতেই পারে, কিন্তু খুন করতে চাইবে বলে তো আমার মনে হয় না।"
"এই কেউ কেউ-রা কারা?
শ্যামলবাবু চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "না, অকারণে কাউকে আমি জড়াতে চাই না।"
"আপনার কোনো বিজনেস পার্টনার আছেন?"
"বেশির ভাগ বিজনেসেরই আমি সোল প্রোপ্রাইটার। দুটো পার্টনারশিপ ব্যবসা আছে। একজন পার্টনার হলেন, শিবদাসবাবু শিবদাস রায়। দ্বিতীয়জন হলেন, শৈবাল চৌধুরী।" নামদুটো বলে শ্যামলবাবু যোগ করলেন, "দু-জনেই অ্যাবাভ এনি সাসপিশন।"
"আই সি। আচ্ছা স্যার, আপনি মারা গেলে আপনার সম্পত্তি কে পাবে?"
ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। "আমি অবিবাহিত, থাকার মধ্যে আছে আমার এক ভাইপো। দাদা মারা যাবার পরে ছোঁড়াটার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেশি নেই। পড়াশুনো ছেড়ে একটা যাত্রা না নাটকের দলে ঢুকে একেবারে বখে গেছে। আর আছে আমার একটি বিশ্বস্ত অনুচর বিনয়। বিনয় প্রায় আটবছর আমার কাছে আছে। আমিই ওকে কলেজে পড়িয়েছি। এখন আমার কাজকর্ম দেখাশোনা করে। আমার সম্পত্তি আমি

বিনয়কে উইল করে দিয়েছি। তবে ভাইপোকে বঞ্চিত করিনি, লাখ দুয়েক টাকা ওর জন্যেও রেখেছি।"

"আপনার উইলের কথা কি স্যার আপনার ভাইপো আর বিনয় জানেন?"

"আলবাত জানে, লুকিয়ে আমি কোনো কাজ করি না। তবে..." কিছু একটা বলতে গিয়ে শ্যামল দত্ত হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

"তবে কী স্যার?"

"ভাবছি এটা ঠিক হল কিনা?"

"কোনটে স্যার?"

"মানে এই উইলটা। ভাইপোটা যত নচ্ছারই হোক, যে-দাদা আমাকে মানুষ করেছে তারই একমাত্র ছেলে। আমার চেনা-জানা দু-একজন বলছেন বিনয়কে সব কিছু উইল করে দেওয়াটা বিবেচনার কাজ নয়। আপনার কী মনে হয়?"

শ্যামলবাবুর কথা যত শুনছিলাম, ততই অবাক হচ্ছিলাম। উইল করে সেটা ঠিক করেছেন কিনা সেই নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতর সামনে স্বগতোক্তি করা, আবার তার মতামত নেওয়া!

"উইল তো স্যার আপনার ইচ্ছে, যা চান তাই করবেন।"

"ঠিক, আর বিনয় চমৎকার ছেলে।"

"বিনয়কে আপনি কতদিন চেনেন?"

"ওই যে বললাম, আট বছর।"

"আপনার কাছে আসার আগে বিনয়বাবু কোথায় থাকতেন?"

"একটা অনাথ আশ্রমে। সেখানে যখন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন ও স্কুল ফাইনাল দিচ্ছে। ওকে দেখে আমার ভালো লেগে গেল। আশ্রমের মেট্রনের সঙ্গে কথা বলে ওকে আমি নিয়ে আসি।"

"বিনয়ের বাবা-মা নেই?"

"মা ছিল। বাপের কথা কেউ জানে না। আমার সঙ্গে ওর দেখা হবার কিছুদিন আগে ওর মা মারা যায়।"

"ওঁর অন্য কোনো আত্মীয়স্বজন নেই?"

"না। কিন্তু বিনয় সম্পর্কে এত প্রশ্ন করছেন কেন, আপনি কি বিনয়কে সন্দেহ করছেন? হি ইজ এ ফাইন বয়।"

"কী মুশকিল স্যার, কিছুই তো ঘটেনি, সন্দেহ করার কি আছে!"

"কিন্তু তাও তো ওকে নিয়ে প্রশ্ন করছেন!" শ্যামলবাবু নিজের অসন্তোষ আর চাপলেন না।

"ঠিক আছে স্যার, করব না। তবে একটা কথা, আপনার মনে যখন খুন হওয়া নিয়ে একটা খটকা লেগেছে, আপনি কোনো সিকিউরিটি কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। একজন বডি গার্ড নিয়ে ঘুরুন কিছুদিন।"

শ্যামলবাবুর কথাটা বোধহয় মনঃপূত হল। "আমিও সেটাই ভাবছিলাম। আচ্ছা চলি।" বলে উঠে যাবার উদ্যোগ করলেন।

"এই চিঠি তিনটে আমি রেখে দিতে পারি স্যার?"

"নিশ্চয়।"

"দাঁড়ান, স্যার, একটা রসিদ দিয়ে দিই।"

"কীসের রসিদ? এই চিঠি তিনটের জন্য!"

"না স্যার, এই যে টাকাটা দিলেন তার।"

"রসিদ নিয়ে আমি কী করব! শুধু কাজটা মনে করে করবেন।"

"কী যে বলেন স্যার, দীর্ঘদিন বাঁচবেন আপনি। আপনার লাঠিটা ফেলে যাচ্ছেন স্যার।"

"থ্যাঙ্ক ইউ," বলে ভদ্রলোক লাঠিটা তুলে নিলেন। "ও, হ্যাঁ," পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন শ্যামলবাবু, "আমার উকিলের ঠিকানা আর ফোন নম্বর। ওঁকে আমি বলে যাব আমি বেঁচে থাকি বা না-থাকি আপনার সব খরচাপাতি যেন উনি দিয়ে দেন।"

একেনবাবুকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শ্যামল দত্ত চলে গেলেন।

একেনবাবুর কাছ থেকে শ্যামল দত্তের দেওয়া কাগজে উকিলের নামটা দেখলাম। সতীশ মিত্র। নীচে বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নম্বর। আর কিছু লেখা নেই।

"সতীশ মিত্র! এর অফিসে চুরি হবার খবরই তো সেদিন পত্রিকায় দেখলাম!" আমি বলে উঠলাম।

"তাই তো দেখছি স্যার।"

"বাঃ, এতো চমৎকার যোগাযোগ!" প্রমথ বলল, "এই ছুতোয় উকিল মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে, তার চুরির ব্যাপারটারও ফয়সল্লা করুন। আরও টু-পাইস ঘরে আসবে।"

"কী যে বলেন স্যার!"

"ভুলটা কী বললাম মশাই? ভালো কথা, এই শ্যামল দত্ত লোকটা মরুক-বাঁচুক, আই ডোন্ট কেয়ার, বিশ হাজার টাকা ফোকোটে পেয়েছেন... আজ রাতেই বউদিকে ফাইভ-স্টার রেস্টুরেন্টে ভালোমন্দ খাওয়ান। চাইলে আমরাও যেতে পারি।"

"অত তাড়াহুড়ো করিস না," আমি বললাম। "নোটগুলো জাল কিনা, সেটা আগে জানা দরকার। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যজনক লাগছে।"

একেনবাবু দেখলাম মন দিয়ে নোটগুলো পরীক্ষা করছেন। "না স্যার, জেনুইন জিনিসই মনে হচ্ছে।"

"তাহলে বউদিকে জানিয়ে দেওয়া যাক রান্নাবান্নার ঝামেলা আজ না করতে। কাল সকালেই তো আবার সবাই দীঘা রওনা দিচ্ছি! বউদি, বউদি!" বলে প্রমথ চিৎকার জুড়ল।

ও বলতে ভুলে গেছি, আমার আর প্রমথর এই দীঘা যাত্রা একেনবাবুদের দশম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে। একেনবাবুকে আমরাই জোর করেছিলাম বউদিকে নিয়ে দীঘায় যেতে, কিন্তু একেনবউদির ভীষণ লজ্জা! একেনবাবু আবার লজ্জাটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এই বলে, হিন্দু বিবাহ মতে ওঁদের বিয়েটা ঠিক সিদ্ধ নয়। সেটার বার্ষিকী উদ্যাপন করাটা একেবারেই ঠিক হবে না।

শুনে প্রমথ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠেছিল, "কী আজেবাজে বকছেন! না কি এটা আপনার খরচ বাঁচাবার ফন্দি?"

"আরে না স্যার, কতই বা খরচ! আসলে আমার আর ও-র মধ্যে সম্পর্কটা সপিণ্ড।"

"সপিণ্ড-টা কী?"

"সপিণ্ড সম্পর্কের বিচার হয় স্যার মায়ের দিক থেকে তিন পুরুষ আর বাবার দিক থেকে পাঁচ পুরুষ ধরে। একজন যদি অন্যজনের সপিণ্ড সম্পর্কের কেউ হয়, অথবা তৃতীয় কেউ যদি দু-জনের সপিণ্ড সম্পর্কের পড়ে তাহলে বিয়েটা সিদ্ধ হয় না।"

"হোয়াট ননসেন্স, দক্ষিণভারতে তো মামা-ভাগ্নিতেও বিয়ে হচ্ছে।"

"ওটা স্যার লোকাচার, হিন্দু বিয়ের আইনে লোকাচারকে মানা হয়।"

"এইসব ফালতু জিনিস কোত্থেকে জানলেন?"

"কী করব স্যার, এইসব আইনগুলো একটু জানতে হয়, পুলিশে কাজ করতাম না!"

"তাহলে আর কী করা, আপনার অসিদ্ধ বউকে নিয়েই দীঘাতে আনন্দ করে আসুন।" আমি বললাম।

কথাটা শুনে একেনবউদি লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, "ওঁর কথা ছাড়ুন তো! বিয়ের পর কোত্থেকে আবিষ্কার করেছে আমার ঠাকুরদা-র ঠাকুরদা নাকি ওঁরও ঠাকুরদা-র ঠাকুরদা।"

প্রমথ বলল, "বউদি, আমরা কি আপনার কর্তার কোনো কথায় কান দিই, ওঁর অর্ধেক জিনিসই তো বানানো।"

"তাহলে ভাই আপনারা দু-জন আমাদের সঙ্গে চলুন।"

।। ৩।।

আমরা ছিলাম নিউ দীঘায়। জায়গাটা পুরোনো দীঘার চেয়ে পরিচ্ছন্ন, লোকজনও কম। তবে দীঘার সেই বিখ্যাত ঝাউবন এখন প্রায় নেই বললেই চলে। নীল সমুদ্রের বুকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা দেখলাম মুগ্ধ হয়ে। একদিন কাছাকাছি কাননগড়ে অমরাবতীর কৃত্রিম লেকে বোটিং করে এলাম। একেনবাবুর মতো লোক যিনি কোথাও গেলে ঘ্যানঘ্যান করে মারেন, তিনিও একদিন বলে ফেললেন, "যাই বলুন স্যার, মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে এলে, শরীর-মন দুটোই ঝরঝরে হয়ে যায়। তবে খাবারটাই ট্রাবল দেয়।"

"তাই বলে বউদিকে দিয়ে রান্না করানোর ফ্যাচাং তুলবেন না!" প্রমথ একটু ধমকের সুরে বলল।

"কী যে বলেন স্যার, ও-ও তো রিল্যাক্স করতে এসেছে।"

"আপনার এই সূক্ষ্ম অনুভূতি এখনও আছে দেখে মোহিত হলাম।" প্রমথ কখনোই একেনবাবুর পেছনে না লেগে পারে না।

একেনবাবু অবশ্য এসব গায়ে মাখেন না।

মঙ্গলবার কলকাতায় এসে আমরা যখন পৌঁছোলাম, তখন প্রায় বিকেল পাঁচটা।

একেনবাবু বাড়িতে ঢোকামাত্র স্নান করতে ছুটলেন। একেনবউদি বললেন, "আপনারা ভাই সবাই আজ রাতের খাওয়া খেয়ে যাবেন।"

"আজকেই আবার রাঁধবেন বউদি?" প্রমথ বলল।

"দেখছিলেন তো বাইরের খাবার খেয়ে ওঁর অবস্থা!"

"আপনি বউদি বড্ড ইনডাল্জ করেন একেনবাবুকে, সেইজন্যেই মাথায় চড়ে বসেন।"

"ঠিক আছে ভাই, আর করব না," বলে বউদি সস্নেহে প্রমথর তাকিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

আমি আর প্রমথ টেবিলের উপরে স্তূপাকৃত গত কয়েকদিনের পত্রিকাগুলো তুলে নিলাম।

দীঘাতে এ ক'দিন খবরের কাগজ পড়ার কোনো মুডই ছিল না। হোটেলে খাওয়া-দাওয়া আর ঘুম ছাড়া সমুদ্রের বীচ-এ বসেই কাটিয়েছি। কলকাতা আছে কি নেই ভুলে গিয়েছিলাম।

পত্রিকার প্রথম পাতাতেই আমার চোখ আটকে গেল।

বউবাজারের ধনী ব্যবসায়ী শ্যামল দত্তের সন্দেহজনক মৃত্যু!

আমি চেঁচিয়ে প্রমথকে বললাম, "কী সর্বনাশ প্রমথ, সেই ভদ্রলোক মারা গেছেন।"

আমি নামটাও বলিনি, কিন্তু প্রমথ বুঝল ঠিক। বলল, "বলিস কিরে খুন?"

প্রমথ সামনের চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার পাশে বসল।

হেডিং-এর নীচে সংক্ষিপ্ত খবর।

শ্যামল দত্তর মৃতদেহ বাঘাযতীন স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধারে রবিবার দুপুরে পাওয়া গেছে। আঘাতের চিহ্ন দেখে পুলিশ সন্দেহ করছে এটা আত্মহত্যা নাও হতে পারে। লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে। মৃত্যুর কারণ জানার জন্য ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে।

ব্যাস আর কিছু নেই।

প্রমথ বলল, "মাই গড, ভদ্রলোকের সন্দেহ তাহলে ভুল নয়, আমরাই পাত্তা দিচ্ছিলাম না।"

একেনবাবু স্নান সেরে বেরোতেই আমরা পত্রিকাটা ওঁকে দিলাম।

একেনবাবু পত্রিকাটা পড়ে বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার!"

"কী করবেন এখন," প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো কেসটা নিয়েছেন!"

"তা নিয়েছি স্যার, কিন্তু এটা যে আত্মহত্যা নয়, সেটা তো আমরা জানি না।"

"আপনি কী বলতে চান মশাই? রবিবার আমাকে কেউ খুন করবে বলে আপনাকে ভাঁওতা দিয়ে ভদ্রলোক নিজে আত্মহত্যা করেছেন! উনি খ্যাপা, না আপনি খ্যাপা?"

"তা নয় স্যার। পুলিশ আগে ওদের কাজটা শেষ করুক। খুন প্রমাণিত হলে তো আমাকে কাজে লাগতেই হবে।"

"অর্থাৎ বউদির হাতের রান্না না খাওয়া পর্যন্ত আপনি কিছু করবেন না, এই তো?"

একেনবাবু আমার দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "প্রমথবাবু না স্যার, সত্যি!"

আমি প্রমথকে বললাম, "ওঁকে একটু সুস্থির হয়ে বসতে দিবি? এক্ষুনি না ছুটলেও তো চলে।"

"তোর মুণ্ডু," বলে প্রমথ রান্নাঘরে গেল। বোধহয় চায়ের তদারক করতে।

প্রমথ যেতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী বুঝছেন?"

"ভেরি কনফিউসিং স্যার, ভেরি কনফিউসিং।"

চা খাবার পর একেনবাবু নিজেই পকেট থেকে মোবাইল বার করলেন। তাতে চার্জ নেই। তখন উঠে দেয়ালের পাশে রাখা টেলিফোন তুলে কাকে জানি ফোন করলেন। অন্যপক্ষের কথা বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু এটুকু বুঝলাম শ্যামল দত্তের মৃত্যু নিয়েই কথা হচ্ছে। এও বুঝলাম, যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি খুব একটা কো-অপারেটিভ নন। খানিকক্ষণ কথা বলার পর কিছুটা হতাশ হয়েই একেনবাবু চেয়ারে এসে বসলেন।

"কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?"

একেনবাবু সোজাসুজি কথাটার উত্তর দিলেন না। বললেন, "রাখাল ছুটিতে, তাই

একটা ঝামেলা।”

রাখালবাবু সি.আই.ডি-র লোক। এককালে একেনবাবুর কলিগ ও শাগরেদ দুই-ই ছিলেন।

“কেন, যে ফোন ধরল, সে আপনাকে চেনে না?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“চিনবে না কেন স্যার। তবে সবাই তো একরকম নয়।”

এ নিয়ে আর কিছু জানা যাবে না, তাই প্রশ্ন করলাম না।

এ-রকম কোনো একটা ঘটনা ঘটলে, বিশেষ করে বাংলা পত্রিকায় বেশ কয়েকদিন ধরে খুব মাতামাতি হয়। তদন্ত কদ্দুর এগিয়েছে তা নিয়ে অনেক খবরাখবর বেরোয়। তার কতটা সত্যি অবশ্যই একটা প্রশ্ন। আসলে এ ধরনের খবর পাবলিক খুব পছন্দ করে। কাগজে কিছু বেরোনো মানেই সেটা ধ্রুব-সত্য। সেই সত্য অনুসারে এটি হত্যাকাণ্ড। এর প্রত্যক্ষদর্শীও নাকি রয়েছে। এক রিক্সাওয়ালা নাকি একটি যুবককে দেখেছিল একজন বৃদ্ধকে ধরাধরি করে রেললাইনের ধার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।... পাঠকরা ভাবতেও চায় না, এ ধরনের স্পর্শকাতর এবং গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে পুলিশ রিপোর্টারদের এসব জানাবে কেন?

।। ৪।।

পরদিন দুপুরে একেনবাবুর ফোন পেলাম। উনি আর প্রমথ উকিল সতীশ মিত্রের বাড়িতে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ যাবেন, আমি আসব কিনা। ঠিক হল, গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে পেট্রল পাম্পের সামনে ছ'টার একটু আগে আমি যাব, সেখানে উনি আর প্রমথ আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

সতীশ মিত্রের বাড়ি পেট্রল পাম্প থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। উনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শ্যামল দত্ত একেনবাবুকে ওঁর মৃত্যুর তদন্তের ভার দিয়ে গেছেন শুনে উনি তো অবাক! আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকালেন, আমরা হয় উন্মাদ অথবা ওঁর সঙ্গে বদ-রসিকতা করতে এসেছি! যাইহোক, ভাগ্যক্রমে একেনবাবুর নামটা ওঁর কাছে অপরিচিত নয়। তাই ধৈর্য ধরে পুরো ব্যাপারটা শুনলেন। তারপর বললেন, শ্যামল দত্ত ওঁকে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যাননি। এও বললেন যে, শ্যামলদত্ত ওঁকে দিয়ে তাঁর উইলটা করিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন আগে।

“তাতে কি উনি ওঁর সমস্ত সম্পত্তি বিনয়বাবুকে দিয়ে গিয়েছেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“হতে পারে, আমার মনে নেই।” ওঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে মনে হল, এ নিয়ে উনি আলোচনা করতে চান না।

“উইলটা কি আপনার কাছেই আছে স্যার?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

“কেন বলুন তো?”

“না, মানে কয়েকদিন আগে আপনার এখানে একটা চুরি হয়েছিল, তাই ভাবলাম ওটা যদি চুরি হয়ে থাকে।”

“না, চুরি যায়নি। আর চুরিও এখান থেকে কিছু হয়নি। পত্রিকাগুলো তিলকে তাল

করেছে। আর কিছু জানতে চান?"
"তাহলে উইলটা আপনার কাছেই আছে?"
"না, শ্যামলবাবু কিছুদিন আগে ওটা ফেরত নিয়ে গেছেন।"
"কেন স্যার?"
"তা বলতে পারব না। আমার জুনিয়ারকে ফোন করেছিলেন। এ বিষয়ে আমি আর কিছু জানি না। জুনিয়ারও জানে না, কারণ ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।"
"শ্যামলবাবু থাকতেন কোথায় স্যার?"
সতীশ মিত্রের ভ্রু কুঞ্চিত হল। "কসবায়। আপনাদের ঠিকানা দেননি?"
"না স্যার, শুধু আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে গিয়েছেন।"
"স্ট্রেঞ্জ! যাক, আর কিছু জানতে চান?"
ভদ্রলোকের সময়ের দাম আছে, আর আমাদের জন্য সময় নষ্ট করতে চান না মনে হল।
"আচ্ছা স্যার, আসি।" একেনবাবু উঠে পড়লেন, সেই সঙ্গে আমরাও।

উকিল মশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেসটা কী বলুন তো, শ্যামলবাবু পরিষ্কার বলে গেলেন যে সতীশ মিত্রের কাছে উনি তদন্তের জন্য যা টাকা লাগে রেখে যাবেন, অথচ সতীশ মিত্র বলছেন কিছুই জানেন না!"
"মনে হয় টাকাটা উকিল মশাই মেরে দিয়েছেন। যার টাকা তিনি তো আর খোঁজ নিতে আসবেন না।" প্রমথ সবকিছুই নেগেটিভলি দেখে।
"আরেকটা সম্ভাবনা হল," আমি বললাম, "হয়তো সতীশ মিত্রকে ইনস্ট্রাকশন দেবার আগেই উনি খুন হয়েছেন।"
"কে জানে স্যার," একেনবাবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "তবে ডেফিনিটলি কনফিউসিং।"
"আপনি কিছু একটা ভাবছেন," প্রমথ একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল।
"তা একটু ভাবছি স্যার।"
"ঝেড়ে কাশুন না, আপনার ভাবনাটা আমাদেরও একটু ভাবতে দিন।"
"আজ সকালে রাখালকে ধরতে পেরেছি, কাজে জয়েন করেছে। ওর কাছে শুনলাম পুলিশ শ্যামলবাবুর মৃত্যুটা আত্মহত্যা বলেই ভাবছে।"
"আত্মহত্যা!"
"তাই তো বলল, স্যার।"
"তাই যদি হবে, তাহলে ভদ্রলোক আমাদের কাছে খুন হতে যাচ্ছেন কাহিনি ফাঁদলেন কেন? বিশ হাজার টাকাই বা দিলেন কেন? মেকস নো সেন্স!"
"সেটাই তো কনফিউসিং স্যার।"
আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আত্মহত্যা সন্দেহ করার কারণটা কী?"
"মারা যাবার কিছু আগে তিনি একটা এস.এম.এস পাঠিয়েছিলেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' বলে।"
"কাকে পাঠিয়েছিলেন?"
"বিনয়বাবুকে।"
"বিনয়? মানে যাকে উনি ওঁর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন!"
"ঠিক স্যার।"

“এস.এম.এস-টা যে উনিই করেছেন তার প্রমাণ কী?”

“শ্যামলবাবুর ফোন থেকেই করা হয়েছে স্যার।”

“তা বুঝলাম,” প্রমথ বলল, “কিন্তু কেউ তো ওকে খুন করেও ওঁর ফোন থেকে এস.এম.এস করতে পারে। পারে না?”

“তা পারে স্যার।”

“তাহলে?”

“পুলিশের কাছে খবর উনি প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসারে ভুগছিলেন, ডাক্তাররা ওঁকে তিনমাসের মতো সময় দিয়েছিল। মৃত্যুকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন না, তার ওপর ক্যানসারের যন্ত্রণা!”

আমি আর প্রমথ চুপ করে রইলাম। পুলিশের চিন্তাটা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে শ্যামলবাবুর আমাদের কাছে এসে ওই সব বলার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

একেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন, “যে লোকটা কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যাচ্ছে, তাকে কেউ খুন করতে চাইবে কেন? কী লাভ?”

“হয়তো যে খুন করেছে খবরটা জানত না। অথবা, এটা আপনার সেই আইডিয়াল জুয়েলরির কাফলিংক-এর কেসের মতো... খুন করা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে।” আমি বললাম।

“হতে পারে স্যার।”

“আবার নাও হতে পারে,” প্রমথ বলল। “পুলিশ এক্ষেত্রে হয়তো ঠিকই বলছে এটা পিওর এন্ড সিম্পল কেস অফ সুইসাইড। যদিও তাতে একেনবাবুর ক্ষতি।”

“তার মানে?”

“ওঁর ফি-টা মাঠে মারা যাবে।”

“ফি-টা দিচ্ছে কে? দেবার তো কোনো লোক নেই। কী মশাই, চুপ করে আছেন কেন?”

“কী আর বলব স্যার,” বলে একেনবাবু মুখে কুলুপ আঁটলেন।

।। ৫ ।।

শ্যামল দত্তর মৃত্যু নিয়ে হয়তো আমরা কেউই আর মাথা ঘামাতাম না, যদি না হঠাৎ শিবদাস রায় বলে এক ভদ্রলোক বৃহস্পতিবার সকালে আমাদের আড্ডায় এসে হাজির হতেন। শিবদাস রায় নামটা চেনা চেনা কেন লাগছিল সেটা পরিষ্কার হল যখন জানলাম উনি শ্যামলবাবুর বিজনেস পার্টনার ছিলেন। শিবদাসবাবু জানালেন, শ্যামলবাবু ওঁকে বলে গিয়েছেন, যদি কোনো কারণে ওঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়, তার তদন্তের জন্য যা খরচাপাতি লাগে একেনবাবুকে যেন দেন।

যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, শ্যামলবাবু অন্তত একজনকে একেনবাবুকে কাজে নিযুক্ত করার কথাটা জানিয়েছেন।

শিবদাসবাবুও দেখলাম সমস্ত ব্যাপারটাতে বেশ কনফিউসড। কেন শ্যামলবাবু খুন হবেন বলে ভয় পাচ্ছিলেন শিবদাসবাবু জানতেন না। শ্যামলবাবুকে জিজ্ঞেসও করেছিলেন মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করতে হবে কেন! সন্তোষজনক কোনো উত্তর পাননি। শিবদাসবাবু

জানতেনও না শ্যামলবাবুর ক্যানসারের কথা! জেনেছেন বিনয়ের কাছ থেকে শ্যামলবাবুর মৃত্যুর পর। একেনবাবুর কাছে উনি এসেছেন ওঁর পার্টনার ও বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করতে। তবে শিবদাসবাবুর কাছ থেকে জানতে পারা গেল শ্যামলবাবু উইল করে ভাইপো সত্যব্রতর জন্য দু-লাখ টাকা ছাড়া পুরো সম্পত্তিই বিনয়কে দিয়ে গেছেন।

"উনি কি ওঁর উইল পালটাবার কথা ভেবেছিলেন?"

সঠিক উত্তর শিবদাসবাবু দিতে পারলেন না। তবে বললেন, "ভাইপোর ভাগটা একটু বাড়াবার কথা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিল। যেদিন মারা যায়, তার দিন দুই আগে বলেছিল নতুন একটা উইল করেছে বা করছে। খুব মন দিয়ে কথাটা শুনিনি, জোর করে বলতে পারব ন। করে থাকলে ওঁর উকিল সতীশ মিত্র জানবেন।"

একেনবাবু বললেন, "সতীশ মিত্র কিন্তু সে-রকম কিছু বলেননি।"

"তাহলে হয়তো 'করছি' বলেছিল, শেষ পর্যন্ত করেনি।"

"উইল করতে তো উকিল লাগে না, দু-জন সাক্ষী থাকলেই যথেষ্ট," প্রমথ গম্ভীর ভাবে বলল।

"তাই নাকি? রেজিস্ট্রি-টেজিস্ট্রি করতে হয় না?" শিবদাসবাবু প্রশ্ন করলেন।

বিজ্ঞের মতো সাক্ষীর কথাটা বললেও প্রমথও নিশ্চয় জানে না। জানলে প্রশ্নের উত্তরে নির্বাক হয়ে থাকার পাত্র সে নয়!

যাইহোক, শিবদাসবাবু একেনবাবুকে বললেন, তদন্তের কাজে টাকা যা প্রয়োজন ওঁকে জানাতে। বিশ হাজার টাকার অ্যাডভান্স দেওয়ার কথা উনি জানেন। সেটা শেষ হলেই উনি আবার কিছু অ্যাডভান্স করে যাবেন।

এখন পর্যন্ত একবার উকিল সতীশ মিত্রের বাড়ি যাওয়া আর দুয়েকটা ফোন কল ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করা হয়নি। সুতরাং আবার আগাম টাকা নেবার প্রশ্ন নেই।

শিবদাসবাবুর কাছ থেকে বিনয়বাবুর ফোন নম্বর আর ঠিকানাটা সংগ্রহ করা গেল। সত্যব্রতর ঠিকানাটা ওঁর জানা নেই। তবে জেনে যত তাড়াতাড়ি পারেন জানিয়ে দেবেন বললেন। শ্যামলবাবুর আর এক বিজনেস পার্টনার শৈবাল চৌধুরী আবার শিবদাসবাবুর বন্ধু। ওঁর ঠিকানা আর ফোন নম্বরও শিবদাসবাবুর কাছ থেকে পাওয়া গেল।

"ভালোকথা স্যার, ওঁর ডাক্তার কে ছিলেন?"

"ওর নানান সমস্যা ছিল, অনেকের কাছেই যেত। সবার নাম বলতে পারব না। তবে ছোটোখাটো অসুখে আমি আর ও দু-জনেই ডাক্তার অমল সেন-এর কাছে যেতাম।"

এক অমল সেনের চেম্বার আমি দেখেছি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে শরৎ বসু রোডের উপর।

"যাঁর চেম্বার শরৎ বসু রোডে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, উনিই।"

"সবার ঠিকানাই তো দিলেন স্যার, এবার আসল লোকের ঠিকানাটা দিন।"

"আসল লোক! ও..." ভদ্রলোক এবার বুঝতে পারলেন, "এই নিন আমার কার্ড। এতে আমার মোবাইলের নম্বরও আছে। যখন দরকার মোবাইলেই করবেন, নইলে আমাকে ধরা মুশকিল।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।" শিবদাসবাবু যখন চলে যাচ্ছেন, একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্যার, আপনার সঙ্গে শ্যামলবাবুর শেষ দেখা কবে হয়?"

শিবদাসবাবুকে একটু ভাবতে হল, "তা প্রায় দিন পনেরো আগে।"

"তখনই আপনাকে আমার কথা বলেছিলেন?

"না না, আপনার কথা বলেছিলেন ফোনে, এই কয়েকদিন আগে। আসলে ওর শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছিল না। নইলে আগে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের দেখা হত। অফিসে আসত নিয়মিত।"

"ঠিক আছে স্যার, আপনাকে আর আটকাব না।"

শিবদাসবাবু চলে যাবার পর একেনবাবু দেখি চোখ বুজে ঘন ঘন পা নাচাচ্ছেন।

একেনবাবুর চিন্তা সুরু হলে ঘন ঘন পা নাচানো সুরু হয়। প্রমথ ওঁকে বহুবার বলেছে, 'এই বিশ্রি হ্যাবিটটা ছাড়ুন তো মশাই।'

একেনবাবু প্রতিবারই করুণভাবে বলেছেন, 'কী করব স্যার, আপনা-আপনিই নাচে।'

'ননসেন্স! এগুলো হচ্ছে ভলান্টারি মাসল, আপনা-আপনি নাচলেই হল!'

তাতে ক্ষণকালের জন্য নাচানি থেমেছে ঠিকই, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার নবোদ্যমে শুরু হয়েছে। প্রমথ যে প্রমথ, সেও এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। পৃথিবীতে নাকি কিছু কিছু লোক আছে যাদের মানুষ করা সম্ভব নয়!

আমি একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ভাবছেন বলুন তো?"

একেনবাবু পা নাচানি থামিয়ে বললেন, "একটু চা পেলে মন্দ হত না।"

"আপনারই তো বাড়ি মশাই এটা, বাপিকে বলছেন কেন!" তারপরেই হাঁক দিয়ে প্রমথ বলল, "বউদি, আপনার পতিদেবতার চা লাগবে।"

দূর থেকে উত্তর এল, "এই তো খেলেন।"

"এইসব দাম্পত্য খিটিমিটির মধ্যে আমাকে জড়াবেন না, আমি শুধু অনুরোধটা রিলে করছি।"

সহাস্য উত্তর এল, "আচ্ছা ভাই, সবাইকেই দিচ্ছি।"

একেনবউদির আবার প্রমথকে খুব পছন্দ। ওঁর ধারণা প্রমথর জন্যেই ওঁর কর্তা একটু সিধে থাকেন।

"চা তো আসছে, এবার বলুন কী ভাবছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"স্টুয়ার্ট সাহেব সব সময়ে ওঁর লোকদের বলতেন, ফলো দ্য মানি ট্রেইল অথবা ফাইন্ড দ্য উওম্যান।"

"আপনার আস্পর্ধা তো কম নয় মশাই, বউদির করা চা খাচ্ছেন, আর বউদির জাতকে গালমন্দ করছেন! সব ক্রাইমের পেছনেই মেয়ে জড়িত, এটা একটা কথার কথা হল!" প্রমথ বলল।

"কী যে বলেন স্যার, এটা কি আমার কথা! স্টুয়ার্ট সাহেবের কথা। আর মেয়ে ছাড়া টাকার কথাটাও তো আছে।"

"শ্যামলবাবুর চেহারা দেখে তো মনে হল না খুব একটা উওম্যানাইজার বলে," আমি বললাম। "কিন্তু টাকার ব্যাপার থাকতে পারে। বিনয় যদি আঁচ করে শ্যামলবাবু উইল পালটে ভাইপোকে একটা বড়ো অংশ দিতে চলেছেন, তাহলে সেটা উকিলের কাছে জমা পড়ার আগে শ্যামলবাবুকে সরিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয় একটা সম্ভবনা।"

"তুই বলছিস বিনয়ই খুন করেছে?" প্রমথ জিজ্ঞেস করল।

"আমি একটা পসিবিলিটির কথা ভাবছি। আপনি কী বলেন একেনবাবু?"

"অবশ্যই সেটা একটা সম্ভাবনা স্যার।"

একেনবাবু আমার কথায় সায় দিচ্ছেন দেখে আমি উৎসাহিত হলাম। বললাম, "শুধু সম্ভাবনা নয়, আমার মনে হচ্ছে এটাই ঘটেছে। নইলে যে লোকটা এমনিতেই তিন-চার

মাস বাদে মারা যাচ্ছে, তাকে খুন করে কী লাভ? লাভটা এইখানে যে উনি তিন মাস বাঁচলে বিনয়বাবুর আর্থিক ক্ষতি।”

“তুই বলছিস, এস.এম.এস-টা বিনয়ই ওঁর মোবাইল থেকে করেছিল?”

“নিশ্চয়, পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য যে এটা আত্মহত্যা।”

“দ্যাটস টু সিম্প্লিস্টিক এন্ড অবভিয়াস!” প্রমথ আমাকে উড়িয়ে দিল। পুলিশ যদি এত সহজেই ধোঁকা খায়, তাহলে এদেশে কোনো খুনি ধরা পরবে না!” তারপর একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “আপনার চেলা রাখালবাবু কী বলেন?”

“আপনি স্যার বড্ড লজ্জা দেন, রাখাল আমার চেলা হবে কেন! তবে রাখাল আজ বিকেলে আসছে।”

“তাহলে আমরাও আসব। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?”

“শুনছেন স্যার, প্রমথবাবুর কথা। আপনারা আসবেন তার জন্য আবার পারমিশন লাগবে?”

।। ৬।।

পুলিশের থিওরিটা কী, সেটা অবশ্য কিছুটা আমরা আঁচ করতে পারলাম রাখালবাবুর কথায়। পুলিশ প্রথমে শ্যামলবাবু খুন হয়েছিলেন বলেই সন্দেহ করছিল। তার একটা কারণ, ওঁর উইলটা পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে ওঁর ভাইপোই সেটা আবিষ্কার করে ওঁর খাটের নিচ থেকে। উইল হারানোর সমস্যা মেটার পর তিনটে জিনিস পুলিশের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এক নম্বর হল, শ্যামলবাবু ক্যানসারে খুবই শারীরিক কষ্ট পাচ্ছিলেন। খুব হেভি ডোজে পেইন কিলার খেয়ে দৈনন্দিন কাজ ম্যানেজ করছিলেন। এ ভাবে বাঁচার অর্থ হয় না, এই কথা বিনয় এবং ওঁকে দেখাশুনো করার জন্য যে-দুটি কাজের লোক ছিল তাদের একাধিক বার বলেছেন। দ্বিতীয়ত, উনি ব্যথার জন্য অফিসে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। ঘরে বসে হাঁফিয়ে উঠে এক-আধবার বাইরে যেতেন। এই বাইরে গিয়েই কারোর সঙ্গে দেখা হয় এবং কোনো একটা দুঃসংবাদ পান। তাতে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে বাড়িতে ফেরেন। দুঃসংবাদটা ঠিক কী, বিনয় বা ওঁর বাড়ির কাজের লোকদের কেউই বলতে পারেনি। শরীরের কষ্ট ছাড়াও মানসিক কষ্টটাও ওঁর পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, মৃত্যুর দিন উনি ভোরবেলা কাউকে না জানিয়েই একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। সাধারণত উনি একজন কাউকে সঙ্গে নিতেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে বিনয়কে যে এস.এম.এস পাঠিয়েছিলেন, সেটা তো খবরেই বেরিয়েছে। কিন্তু...

এইবার বুঝলাম এই ‘কিন্তু’-টার জন্যেই রাখালবাবুর আগমন।

রাখালবাবু এত সহজে এটাকে সিম্পল আত্মহত্যা বলে মানতে রাজি নন। তবে উনি নিজে এই তদন্তের দায়িত্বে নেই। যে তদন্ত করছে, সে রাখালবাবুর সহকর্মী। রাখালবাবু তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন আত্মহত্যার পেছনে কোনো চাপ ছিল কিনা অনুসন্ধান করতে। এমন কী হত্যার সম্ভাবনাটাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করতে। কার সঙ্গে দেখা হওয়ায় শ্যামলবাবু ওই রকম বিচলিত হয়ে ফিরেছিলেন? ওঁর আত্মহত্যার পেছনে কি সেই লোকটির কোনো অবদান ছিল? কেউ কি শ্যামলবাবুকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছিল?

একেনবাবু রাখালবাবুকে জানালেন শ্যামলবাবু মৃত্যুর আগে তিনটি চিঠি পেয়েছিলেন।

তিনটি চিঠিতেই ওঁকে রবিবার খুন করা হবে জানানো হয়েছিল, আর খুন উনি রবিবারই হন। রাখালবাবু শুনে নিশ্চিত হলেন, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কিন্তু কেন এই খুন? সেটাই এখন মস্ত বড়ো প্রশ্ন। একেনবাবুর কাছ থেকে চিঠিগুলো নিয়ে রাখালবাবু মন দিয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, "এই চিঠিগুলো কি আমি নিয়ে যেতে পারি স্যার?"

"নিশ্চয়, কিন্তু ভাই একটা শর্তে?"

"কী শর্ত?"

"তোমার এই সহকর্মীটি যেন আমার প্রশ্ন-টশ্ন থাকলে ঠিকমতো উত্তরটা দেন।"

"একদম ভাববেন না দাদা, আপনার যা প্রশ্ন থাকবে আমায় জানাবেন, আমি উত্তর এনে দেব।"

রাখালবাবু চলে যেতে প্রমথ বলল, "আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, চিঠিগুলো দিয়ে দিলেন ওতে তো অনেক ক্লু লুকিয়ে থাকতে পারে?"

"তা পারে স্যার।"

"তাহলে?"

"আমি তো হ্যান্ড-রাইটিং এক্সপার্ট নই স্যার। সেই পুলিশেরই সাহায্য নিতে হত। রাখালের কাছ থেকে সেটা এখন পাওয়া যাবে।" বলে পকেট থেকে মোবাইলটা বার করলেন।

"আপনি মশাই মহা ধান্দাবাজ! এদিকে ভাব দেখান ভাজামাছটি উলটে খেতে জানেন না।"

একেনবাবু মোবাইলে কাকে জানি ধরার চেষ্টা করছিলেন, প্রমথর কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়লেন, ভাবটা প্রমথবাবুকে নিয়ে আর পারা যায় না!

"হ্যালো, বিনয়বাবু আছেন?... আমাকে চিনবেন না, আমার নাম একেন সেন। শ্যামলবাবু আমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে গিয়েছেন, সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।... কী কাজ? সেটা দেখা হলে বলব।... কালকে আপনি বাইরে যাচ্ছেন? আজকে সময় হবে?... ঠিক আছে স্যার, আজকেই আসব।... এই ধরুন আধ ঘণ্টার মধ্যে।"

ফোনটা বন্ধ করে একেনবাবু বললেন, "স্যার, আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?"

"আছে।"

"তাহলে চলুন, একটু বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

।। ৭।।

বিনয়ের বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে। শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা। একেনবাবু আমাদের পরিচয় দিয়ে আসার কারণটা যখন বললেন, তখন সতীশ মিত্রের মতো বিনয়ও খুবই অবাক হল। চিঠি পাঠিয়ে কেউ যে ওঁকে খুন করবে বলেছিল, সেটা বিনয় একেবারেই জানত না।

"কী আশ্চর্য, আমাকে তো উনি এসব কিছুই বলেননি!"

"ওঁর হাবেভাবেও আপনি কিছু টের পাননি?"

বিনয় এক মুহূর্ত চুপ করে আস্তে আস্তে বলল, "একথা ঠিক যে, মৃত্যুর কয়েকদিন

আগে কিছু একটা ঘটেছিল! উনি বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন। আমি কারণটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোনো উত্তর দেননি। আমিও পীড়াপীড়ি করিনি। কিন্তু এর পেছনে যে এসব চলছে...” গলাটা ধরে এল। কথাটা আর শেষ করতে পারল না। খুবই শোকগ্রস্ত বুঝতে অসুবিধা হল না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বিনয় বলল, “উনি আমার পিতৃতুল্য ছিলেন। অসুখে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন, সেই কষ্ট সহ্য না করতে পেরে চলে যাওয়া হয়তো কিছুটা বুঝি, কিন্তু এখন আপনি যা বলছেন সে তো ভয়ঙ্কর কথা! আপনি তাহলে সন্দেহ করছেন....” ‘খুন হয়েছেন’ কথাটা বিনয় উচ্চারণ করতে পারল না।

“চিঠির সঙ্গে মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে,” বিনয়কে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন একেনবাবু। তারপর বললেন, “আমি শুনেছি স্যার, ডাক্তার ওঁর আয়ু আর মাত্র কয়েক মাস আছে বলেছিলেন, সেটা কি সত্যি?”

“আমাকে আবার স্যার বলছেন কেন,” বিনয় সঙ্কোচের সঙ্গে বলল।

“ওটা ওঁর অভ্যাস। নিজের স্ত্রীকেও ম্যাডাম বলেন, গায়ে মাখবেন না,” এই প্রথম প্রমথ মুখ খুলল।

“আপনি জানতেন স্যার যে ওঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে?”

“হ্যাঁ, ডাক্তাররা ওঁকে বড়োজোর মাস ছয়েক সময় দিয়েছিলেন। এরমধ্যে যা যা করণীয় করে নিতে বলেছিলেন।”

“এসব ক্ষেত্রে সাধারণত করণীয়র মধ্যে তো একটা উইল থাকে স্যার। কোনো উইল কি উনি করেছিলেন বলে আপনি জানেন?”

বিনয় একটু ইতস্তত করে বলল, “ওঁর একটা আগেই করা ছিল।”

“আই সি। ওঁর তো অজস্র সম্পত্তি স্যার, কারা পাচ্ছেন?”

“প্রায় সবই আমাকে দিয়ে গেছেন,” বিনয়কে বেশ নিষ্প্রভ শোনাল।

“আপনি ছাড়া ওঁর আর কোনো আপনজন নেই স্যার?”

“ওঁর এক ভাইপো আছেন। তাকেও কিছু টাকা দিয়ে গেছেন।”

“ওঁর ভাইপোর নাম ঠিকানা আপনার জানা আছে?”

বিনয় ড্রয়ার খুলে একটা কার্ড বার করে দিল।

সত্যব্রত দত্ত, নীচে যোধপুর পার্কের একটা ঠিকানা আর ফোন নম্বর। একেনবাবু পকেট থেকে পেন বার করে নিজের ডায়েরিতে সেটা লিখতে যাচ্ছেন দেখে বিনয় বলল, “আপনি কার্ডটা রেখে দিন। ওঁর আরও একটা কার্ড আমার কাছে আছে।”

“উনি কী করেন স্যার?”

“অভিনয়। থিয়েটার, টেলিফিল্ম, মাঝেমাঝে যাত্রাতেও করেন।”

একেনবাবু কার্ডটা পকেটস্থ করে বললেন, “আচ্ছা স্যার, আজ তাহলে চলি।”

আমরা যখন দরজার কাছাকাছি বিনয় জানতে চাইল, “আমি কি এই চিঠিগুলোর কথা পুলিশকে জানাব?”

“পুলিশ জানে,” বলে কান চুলকোতে চুলকোতে কয়েক পা এগিয়ে একেনবাবু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। “ভালোকথা স্যার, যাবার আগে একটু জেনে যাই, আপনি কত বছর হল এখানে আছেন?”

প্রশ্নের আকস্মিকতায় বিনয় একটু বিস্মিত। “প্রায় আট বছর।”

“তার আগে?”

“ক্রিশ্চান মিশনারিদের একটা অনাথ আশ্রমে ছিলাম।”

“আপনার বাবা-মা?”

"বাবাকে দেখিনি। মা খুব অভাবের মধ্যে ছিলেন, আমাকে বছর পাঁচেক বয়সে আশ্রমে রেখে দিয়ে চলে যান। সেখানেই বড়ো হয়েছি।"

"মা-কে আপনি আর দেখেননি স্যার?"

"না।"

"কোন আশ্রমে ছিলেন আপনি?

"ফাদার লাফিয়ের আশ্রমে।"

"সেটা কোথায়?"

"কটক থেকে মাইল দশেক দূরে পারিপোতা বলে একটা জায়গায়।"

"আর একটা কথা, শ্যামলবাবু নাকি ওঁর উইলটা কিছুদিন আগে উকিল সতীশ মিত্রের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, সেটা কোথায় আছে জানেন?"

"নিয়ে আসার ব্যাপারটা আমি জানতাম না। কিন্তু ওটা পাওয়া গেছে ওঁর তোষকের নীচে। সত্যব্রতবাবুই খুঁজে পেয়ে পুলিশকে দিয়েছেন।"

"যেটা পাওয়া গেছে সেটা আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"উইলটা নকল নয় তো?"

"না, না, নকল কেন হবে!"

"উইলের আর কোনো কপি আছে আপনার কাছে?

"আমার কাছে! না-তো।"

"ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, শ্যামলবাবু যেদিন সকালে মারা যান, সেদিন আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমাকে শিবদাসবাবু ডেকেছিলেন একটা জরুরি ব্যাপারে আলোচনার জন্য।"

"কী ব্যাপারে?"

"সেটাই বলতে পারব না। ওঁর বাড়ি গিয়ে শুনি উনি বাড়ি নেই। তার পরেই তো অঘটন ঘটল। আর জানা হয়নি ব্যাপারটা কী। হয়তো অতটা জরুরি নয়, নইলে জানাতেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, চলি। আপনার সময় আর নষ্ট করব না।"

"সময় নষ্টের কি আছে, যদি দরকার হয় আবার আসবেন। এই সময়ে বাড়িতেই সাধারণত থাকি।"

বাইরে বেরিয়ে প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "আপনি মশাই বিনয়ের কুষ্ঠি-ঠিকুজি নিয়ে এত মেতেছেন কেন?"

"কে জানে স্যার, সবার সম্পর্কেই আমার জানতে ইচ্ছে করে।"

"বুল শিট্," প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি দিনকে দিন বেশি প্যাঁচালো হচ্ছেন।"

"দেখছেন স্যার," আমার দিকে তাকিয়ে একেনবাবু বললেন, "প্রমথবাবুকে সত্যি কথা বলাও বিপদ।"

"তাহলে আর কষ্ট করবেন কেন, মিথ্যেই বলুন।"

"আপনিও স্যার, প্রমথবাবুর মতো কথা বলছেন।"

আমি মুচকি হাসলাম।

"একটা কথা বলি স্যার।"

"বলে ফেলুন," প্রমথ বলল।

"আপনাদের হাতে কি আরেকটু সময় আছে?"

"ঝেড়ে কাশুন না মশাই, ভনিতা না করে।"

"তাহলে ওই সত্যব্রতবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করে যেতাম।"

"এখন তো সন্ধে পার হতে চলল, অ্যাক্টর মানুষ ওকে কি এত সহজে পাবেন?"

"দেখছি স্যার।"

একেনবাবুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সত্যব্রতকে ধরা গেল। আমাদের সঙ্গে দেখা করতেও ওঁর আপত্তি নেই।

সত্যব্রত থাকে যোধপুর পার্কের পোস্ট অফিসের কাছে। দোতলা বাড়ি, নীচের তলায় একটা গানের স্কুল। সত্যব্রত আমাদের বয়সি বা আমাদের থেকে একটু ছোটোই হবে। শ্যামলবাবুর ভাইপো বোঝা যায়, মুখে শ্যামলবাবুর আদল আছে। আমাদের আসার কারণটা জেনে বলল, "আমার সঙ্গে তো কাকার প্রায় কোনো সম্পর্কই ছিল না, এ বিষয়ে কী বলব!"

"আপনার সঙ্গে কাকার শেষ দেখা কবে হয়েছিল স্যার?"

"মাস তিনেক আগে। উনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"কেন জানতে পারি স্যার?"

"উনি একটা উইল করেছিলেন, সেটা জানাতে।"

"আপনাকে নিশ্চয় কিছু দিয়ে গেছেন?"

সত্যব্রত একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "নামমাত্র, লাখ দুয়েক। পুরোটাই দিয়ে গেছেন ওঁর পেয়ারের লোক বিনয়কে। অথচ...।" সত্যব্রত একটু থামলেন।

"অথচ?"

"কাকুকে মানুষ করেছিলেন আমার বাবা। বাবা না থাকলে ওঁকে পথে পথে ঘুরতে হত।"

"আপনার সঙ্গে কি ওঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না?"

"ছিল। উনি আমাকে আইন পড়িয়ে ওকালতি ব্যবসাতে ঢোকাতে চেয়েছিলেন। ওঁর চাপে পড়ে পড়েছিলাম, পরীক্ষায় পাশও করেছিলাম। কিন্তু উকিলগিরি করা আমার ধাতে নেই। অভিনয় করতে ভালো লাগে, সেটাই করতে শুরু করলাম। ওঁর আপত্তিতে কান দিইনি, তাতেই বিগড়ে গেলেন। একদিন জানিয়েই দিলেন মুখদর্শন করতে চান না আমার। আমিও যাইনি ওঁর কাছে।"

"মুখদর্শন তো শেষে করলেন স্যার।"

"তার মানে?"

"মানে উইলের কথা জানাতে।"

"ও হ্যাঁ।"

"বিনয়বাবু সম্পর্কে আপনি কী জানেন স্যার?"

এমন সময়ে ওঁর একটা ফোন এল। "এক সেকেন্ড," বলে ফোনে কার সঙ্গে একটু কথা বললেন। মনে হল বেশ বিরক্ত। "আরে ফোনে কেন, মোবাইলে করবে তো!... ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আসছি..." ফোন শেষ করে একেনবাবুকে বললেন, "নতুন নতুন লোক সব প্রডাকশনে এসেছ... কমপ্লেন করছে, 'ফোনে আপনাকে পাচ্ছি না!' বুঝুন, মোবাইল রয়েছে কী করতে? মোবাইল ছাড়া আমাদের ধরা যায়! যাইহোক, কী জানি বলছিলেন?... বেশি সময় কিন্তু দিতে পারব না, আজ রাতে খানিক বাদেই আমার

শ্যুটিং।”

“জিজ্ঞেস করছিলাম স্যার, বিনয়বাবু সম্পর্কে আপনি কী জানেন?”

“প্রায় কিছুই না। একটা অনাথ আশ্রম থেকে হঠাৎ ঘটা করে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে বি.কম পাশ করালেন। সেই থেকে বিনয়ই ওঁর কাজকর্ম সব কিছু দেখছে এবং আমার ধারণা এরমধ্যে বেশ কিছু হাতিয়েও নিয়েছে।”

“এখন তো আর হাতাবার দরকার নেই স্যার, সব কিছুই উনি পাচ্ছেন।”

“তাই তো মনে হয়।”

“মনে হয় কেন বলছেন স্যার?”

“কার কাছে জানি শুনলাম, কাকু উইলটা বাতিল করে নতুন উইল করার কথা ভাবছিলেন।”

“সেই উইলে কি আপনাকে বেশি কিছু দেবার কথা ভাবছিলেন?”

“আমি কী করে বলব! শোনা কথা।”

“কার কাছে শুনেছিলেন?”

বোধহয় শিবদাসবাবুর কাছ থেকে কিংবা ওঁরই অফিসের কারোর কাছ থেকে। সত্যি কথা বলতে কী, কাকুর সম্পত্তির উপর আমার কোনো লোভ নেই। লোভ থাকলে ওঁর উইলটা খুঁজতাম না। উইলটা আমিই ওঁর ঘর থেকে খুঁজে পেয়ে পুলিশকে দিই।”

“তাইতো শুনলাম স্যার।”

“আমাকে দু-লাখ টাকা দিয়ে গেছেন। না দিলেও চলত। আমার এই বাড়ি আছে। অ্যাক্টিং করে আর স্ত্রীর গানের স্কুল থেকে ঠাকুরের কৃপায় মন্দ আসে না। আমাদের ভালোই কেটে যায়।”

“নীচের স্কুলটা আপনার স্ত্রী-র স্যার?”

“হ্যাঁ।”

“উনিই গান শেখান স্যার?”

“হ্যাঁ।”

“বাঃ, দারুণ তো স্যার! আপনি অভিনেতা, উনি গায়িকা!”

একেনবাবুর এই সব অর্থহীন বকবকানিতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু সত্যব্রত নয়, তাই একটু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল।

“আমি কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি স্যার, আপনারা হলেন শিল্পী-দম্পতি।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।”

“আচ্ছা স্যার, বিনয়বাবুর স্ত্রীও গান-টান গান?”

“ওর কোনো স্ত্রী আছে বলে তো জানি না। হঠাৎ এই প্রশ্ন?”

“এমনি স্যার। আপনার স্ত্রী আছে জানতাম না, তাই ভাবলাম ওঁরও হয়তো স্ত্রী আছে।”

একেনবাবুর এই প্রশ্নের না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু, আমিই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। প্রমথ বলল, “চলুন একেনবাবু, ওঁকে তো শ্যুটিং-এ যেতে হবে!”

“ও হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আসি স্যার, নমস্কার।”

নীচে নেমে এসে প্রমথ একেনবাবুকে এই মারে কি সেই মারে, “আপনি একটা যাচ্ছেতাই মশাই, কী উলটোপালটা কথা বলতে শুরু করেছেন, গাঁজা ভাঙ খেয়েছেন নাকি?”

একেনবাবু বললেন, “আসলে স্যার বিনয়বাবু সম্পর্কে কতগুলো প্রশ্ন মাথায় ঘুরছিল।

তাই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।”

“বিনয়বাবু সম্পর্কে প্রশ্ন বিনয়বাবুকে করুন, সত্যব্রতকে কেন করছেন? কী ভাবলেন বলুন তো আপনাকে?”

।। ৮।।

সত্যব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা হবার দু-দিন পরে রাখালবাবু আমাদের সান্ধ্য-আড্ডায় এসে একটা বম্বশেল ফাটালেন। পুলিশ নাকি মোটামুটি নিশ্চিত যে শ্যামলবাবুকে খুন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিনয়কে খুনি সন্দেহে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। বিনয়কে সন্দেহ করার কারণ একাধিক। প্রথমত, শ্যামলবাবু নতুন একটা উইল করতে যাচ্ছিলেন, তাতে বিনয়ের জন্য অল্প কিছু রেখে বেশির ভাগই সত্যব্রতবাবুকে দেবার প্ল্যান ছিল। বিনয় সেটা ঘটতে দিতে চায়নি। দ্বিতীয়ত, বিনয় পুলিশকে জানিয়েছিল যে, বিনয়কে শ্যামলবাবু এস.এম.এস পাঠিয়েছিলেন মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগে। কিন্তু মোবাইল কোম্পানির কাছে খবর নিয়ে জানা গেছে যে, ভোরবেলাতে বিনয়ের মোবাইল ফোনটা বাঘাযতীন স্টেশনের কাছে ছিল। বিনয় এখন বলছে যে, ওর ফোনটা সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছিল না। দুপুরবেলা আবিষ্কার করে ওটা সোফার উপরেই ছিল, একটা পত্রিকার নীচে। তখনই এস.এম.এস মেসেজটা দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানায়। তৃতীয়ত, সকালবেলা যখন শ্যামলবাবুর মৃত্যু হয়েছে, তখন বিনয় বাড়িতে ছিল না। বিনয় বলেছে যে, শিবদাসবাবু ওকে একটা জরুরি ব্যাপারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শিবদাসবাবুর মনে পড়ছে না যে উনি বিনয়কে ডেকেছিলেন বলে। ইনফ্যাক্ট শিবদাসবাবুই শ্যামলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সেদিন সকালে এসেছিলেন, তখন শ্যামলবাবু বা বিনয় কাউকেই পাননি। সবচেয়ে যেটা ড্যামেজিং সেটা হল, প্রত্যক্ষদর্শী এক রিক্সাওয়ালার কথা। সে বলেছে একজন নীলপাঞ্জাবি-পরা লোক একজন বৃদ্ধকে ধরাধরি করে বাঘাযতীন স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধার দিয়ে হাঁটছিল। বিনয়ও সেদিন নীলপাঞ্জাবি পরে বেরিয়েছিল।

আমি প্রমথকে বললাম, “কীরে আমি যখন বলছিলাম বিনয়ই খুন করেছে, তখন তো আমার কথাটাকে উড়িয়ে দিলি এখন দ্যাখ, আমার লজিকে কোনো ভুল ছিল কিনা।”

প্রমথ ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না। বলল, “যেটা প্রথমে লজিক্যাল মনে হয়, সেটাই শেষপর্যন্ত বেঠিক হয়। মিস্ট্রি নভেলগুলো ভালো করে পড়িস? পড়লে দেখতিস, পুলিশরা তোর মত অতি-সরল যুক্তি ব্যবহার করে একজনকে ধরে, পরে দেখা যায় যে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।”

আর্গুমেন্ট খণ্ডন করার এ-রকম অর্থহীন প্রচেষ্টা প্রমথও খুব একটা করে না। আজ করে শুধু আমাকেই অপমান করল না, পুলিশের লোক রাখালবাবুকেও করল।

আমি বললাম, “তুই একটা ইডিয়ট। আমাকে অপমান করছিস কর, রাখালবাবুকে জড়াচ্ছিস কেন?”

“উনি তো তদন্ত করছেন না, ওঁকে অপমান করব কেন।” প্রমথর নির্বিকার উত্তর।

একেনবাবু দেখলাম চুপচাপ পা নাচাচ্ছেন। আমি বললাম, “কী মশাই, কী ভাবছেন?”

“কিছু না স্যার। আচ্ছা ভাই রাখাল, শ্যামলবাবুর উইলটা কার কাছে আছে?”

"পুলিশের হেফাজতে।"

"তোমরা নিশ্চিত, যেটা আছে সেটাই ওঁর শেষ উইল?"

"অন্য কোনো উইলের খবর তো কেউ জানে না।"

"ভাগ্যিস উইলটা পাওয়া গেল," একেনবাবুর পা দেখলাম ঘন ঘন নাচছে। একটা কিছু ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে। একবার শুধু বললেন, "বুঝলে ভাই, এই বিনয় সম্পর্কে একটু জানা দরকার।"

।। ৯।।

একেনবাবুর বিনয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ যে কতটা প্রবল, সেটা পরদিনই বুঝলাম। নানা জায়গায় ফোন করে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে ফাদার লাফিয়ে কী কাজে জানি কলকাতায় এসেছেন। আছেন ওয়াইএমসিএ-তে। শুধু তাই নয় ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও বাগিয়ে নিয়েছেন। সন্ধ্যায় আমার ছোটমাসির বাড়ি যাবার কথা ছিল, সেটা ক্যানসেল করে একেনবাবু আর প্রমথকে নিয়ে রওনা দিলাম। ওয়াইএমসিএ এস.এন ব্যানার্জি রোড আর জওহরলাল নেহরু রোড দু-জায়গাতেই আছে। কোথায় ফাদার আছেন প্রশ্ন করাতে একেনবাবু বললেন, "দুটো ওয়াইএমসিএ আছে নাকি?"

প্রমথ বলল, "কি ডিটেকটিভ হয়েছেন মশাই, ঠিকানা পর্যন্ত খুঁজে বার করতে জানেন না!"

যাইহোক মোবাইল ফোনটা কাজে লাগল। আবার ফাদারকে ফোন করে জানা গেল যে, এস.এন ব্যানার্জি রোডে আছেন।

প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ বিনয় সম্পর্কে এত জানার আগ্রহ হচ্ছে কেন বলুন তো?"

একেনবাবু কথাটার উত্তর দিলেন না।

ফাদার লাফিয়ের বয়স হয়েছে। বেলজিয়ামের লোক, কিন্তু ভারতবর্ষে আছেন প্রায় চল্লিশ বছর। বছর দশেক আসামে ছিলেন, গত তিরিশ বছর উড়িষ্যাতে একটা হাসপাতাল আর অনাথ আশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে আছেন। ফাদার লাফিয়ে শুধু বিনয়কে নয়, শ্যামলবাবুকেও ভালোভাবে চিনতেন। শ্যামলবাবু এককালে উড়িষ্যাতে কন্ট্রাক্টরি করতেন। শ্যামলবাবুর মৃত্যুর খবরে খুবই দুঃখিত হলেন। বিনয় কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন। বিনয়কে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে এবং কেন করেছে শুনে উনি মর্মাহত! সাধারণত কলকাতায় এলে বিনয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, এবার দু-দিনের জন্য এসেছেন বলে আর করেননি।

"আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না বিনয় এ-রকম কাজ করতে পারে।" বার বার এই কথাটাই বললেন ফাদার।

একেনবাবু ফাদার লাফিয়েকে বিনয় সম্পর্কে অজস্র প্রশ্ন করলেন। তার থেকে যা উদ্ধার হল, তা হল: বিনয়ের যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন বিনয়ের মা বিনয়কে অনাথ আশ্রমে রেখে যান। সাধারণত মা-বাবা কেউ বেঁচে থাকলে বাচ্চাদের আশ্রমে রাখা হত না। কিন্তু বিনয়ের মা-র বাচ্চাকে নিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছিল বলে ফাদার ওকে রাখতে

সম্মত হন। সেই থেকে ও আশ্রমেই ছিল। পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল বিনয়। শ্যামলবাবু এরমধ্যে উড়িষ্যা থেকে চলে এলেও ফাদারের সঙ্গে শ্যামলবাবুর মাঝেমাঝেই ফোনে কথাবার্তা হত। ফাদারই কথা প্রসঙ্গে বিনয়ের কথা শ্যামলবাবুকে বলেন। মেধাবি ছাত্র জেনে শ্যামলবাবু নিজে থেকেই বিনয়ের কলেজে পড়াশুনোর দায়িত্ব নিতে চান। তাতে সুবিধাই হল, কারণ অনাথ আশ্রমে আঠেরো বছরের বেশি কাউকে রাখা হত না।

"বিনয়বাবুর মা-র সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি স্যার?"

"না, বাচ্চাকে রেখে যাবার পর সে আর আসেনি।"

"খোঁজখবর করেনি ছেলের?"

"হয়তো করেছে, কিন্তু আমি জানি না। আসলে আমার সেক্রেটারি ছিল অবিনাশ গুপ্ত। সে বিনয়ের মাকে একটু চিনত। তার কাছে যদি খবর নিয়ে থাকে।"

"অবিনাশবাবু এখন কোথায় থাকেন?"

"অবিনাশ অল্প কিছুদিন হল রিটায়ার করে কলকাতাতেই আছে।"

"ওঁর ঠিকানা বা ফোন নম্বর কি আছে আপনার কাছে?"

ফাদার একটা ডায়েরি বের করে একটু খুঁজে একটা ফোন বার করলেন। আমি সেটা মোবাইলে তুলে নিলাম। কারণ একেনবাবু মোবাইলে নম্বর সেভ করতে এখনও হিমশিম খান। প্রায়ই আমার বা প্রমথর সাহায্য চান।

ফাদার লাফিয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একেনবাবু বললেন, "স্যার, একটু অবিনাশবাবুকে ফোন করুন।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার বলুন তো, কী মাথায় ঘুরছে আপনার?"

"কিছুই না স্যার। যখন নম্বরটা পেলাম, কাছাকাছি যদি থাকেন, তাহলে একটু কথা বলে যেতাম।"

বেশ কয়েকবার রিং-এর পর অবিনাশবাবুই ফোনটা ধরলেন। ভদ্রলোক মনে হল আমাদের সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক নন। কিন্তু ফাদার লাফিয়ের কাছ থেকে আসছি শুনে শেষে রাজি হলেন। অবিনাশবাবুর বাড়িটা খুব একটা দূরে নয়। মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছোনো গেল।

অবিনাশবাবুর বেশ বয়স হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়। টাক মাথা, যে কয়েকটা চুল অবশিষ্ট আছে সবই সাদা। কথায় কথায় জানলাম, বিয়ে-থা করেননি। চাকরি জীবনের পুরোটাই উড়িষ্যাতে কাটিয়েছেন। রিটায়ার করেছেন মাত্র কয়েক মাস আগে। রিটায়ার করার পর কী খেয়াল হল কলকাতায় চলে এলেন! আত্মীয়স্বজন বলতে কেউই প্রায় নেই। শ্যামলবাবুই কলকাতায় একটা থাকার জায়গা খুঁজে দিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে এসে ভুল করেছেন। তার ওপর ক'দিন আগে প্রায় গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাচ্ছিলেন! শুধু তাই নয়, ওঁর কেমন দৃঢ় ধারণা হয়েছে কেউ ওঁকে চাপা দিতে চেয়েছিল!

ভদ্রলোক কথাগুলো বলছিলেন হাত-পা নেড়ে খুবই উত্তেজিত ভাবে। প্রমথ দেখলাম মুচকি মুচকি হাসছে। আমারও হাসি পাচ্ছিল ওঁর বলার ধরন দেখে। কিছু কিছু লোক অবশ্য এ-রকম প্যারানয়াতে ভোগে। সব সময় তাদের ধারণা কেউ তাদের অনিষ্ট করার চেষ্টা করছে!

একেনবাবুর অম্লান বদন। "কী করে বুঝলেন স্যার, আপনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে?"

"কী আশ্চর্য, বুঝব না! গাড়িটা গলির মুখে দাঁড়িয়েছিল। আমি যেই গলিতে ঢুকেছি,

তেড়ে এল আমার দিকে! আমি যেদিকে যাই, সেদিকেই গাড়ির মুখ ঘোরায়! যখন প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তখন কোনো মতে একটা বারান্দায় লাফিয়ে উঠে বাঁচি।”

এর ব্যাখ্যা অন্য রকমও হতে পারে আনাড়ি ড্রাইভার, মাতাল ড্রাইভার, ইত্যাদি। তবে ভদ্রলোক এ ধরনের ব্যাখ্যাতে যে সন্তুষ্ট হবেন না, সেটা বলাই বাহুল্য।

যাইহোক, এই ঘটনার পর থেকে অবিনাশবাবু নিজের বিনাশ রোধ করার জন্য পারতপক্ষে বাড়ির থেকে বেরোচ্ছেন না। ওঁর সারা জীবনের শখ ছিল রিটায়ার করে কলকাতায় এসে নিশ্চিন্ত মনে নাটক-সিনেমা দেখে কাটাবেন। বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে ডুবে থাকবেন, কিন্তু কোথায় কী!

আমাদের শ্রোতা পেয়ে অবিনাশবাবু নিজের জীবন-কাহিনি হয়তো আরও বিস্তারিত বলতেন, কিন্তু একেনবাবু আলোচনাটা শুধু শ্যামলবাবু আর বিনয়ের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টাতে ওঁর গল্পে বারবার ছেদ পড়ল। তবে প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু পেতে আরও অনেক আনুষঙ্গিক কাহিনি শুনতে হল বসে বসে। আসলে ভদ্রলোক কথা বলার লোক পেয়ে প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, “বুঝলেন, প্রথমে যখন ফোন করলেন, তখন একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আসলে ওই গাড়ির ব্যাপারটার পর থেকে, সবার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছি। ভাগ্যিস আপনারা এলেন!”

যাইহোক, কতগুলো শকিং তথ্য পাওয়া গেল ওঁর কাছ থেকে। প্রথম তথ্য হল বিনয়ের মা শ্যামলবাবুর বাড়িতে কাজ করত। শ্যামলবাবু যখন কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা শুরু করে অনাথ আশ্রমের জন্য কতগুলো নতুন উইং তৈরি করছিলেন, তখন অবিনাশবাবুর সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ হয়। দু-জনেই অবিবাহিত, তাই একসঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরেও বেড়িয়েছেন। এরমধ্যে একদিন অবিনাশবাবুকে শ্যামলবাবু জানান, উনি ভানু অর্থাৎ ওঁর কাজের মেয়ে ভানুমতীকে বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন। অবিনাশবাবু কথাটা শুনে থ! অনেক বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু শ্যামলবাবু শোনেননি। শ্যামলবাবুর চাপাচাপিতে অবিনাশবাবুই একটি পুরুত ডেকে হিন্দুমতে বিয়েটা দেন। কিন্তু বিয়ের কয়েকদিন বাদেই বিরাট ঝামেলা শুরু হয়। ভানুমতীর আগে যে একটা বিয়ে ছিল, ভানুমতী সেটা বলেনি। নিশ্চয় ইচ্ছা করেই বলেনি। বছর চারেক বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বর মারধোর করত বলে পালিয়ে এসে শ্যামলবাবুর বাড়িতে কাজ নিয়েছিল। ওর প্রথম স্বামী গ্রামের লোকজন নিয়ে এসে হাজির শ্যামলবাবুকে মারবে বলে। সে এক বিশ্রি ব্যাপার। কোনো মতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে ওদের হাত থেকে শ্যামলবাবু নিস্তার পান। ভানুমতীকেও ওর স্বামী গ্রামে নিয়ে যায়। এর কয়েকমাস বাদেই শ্যামলবাবু উড়িষ্যার ব্যবসা গুটিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তবে অবিনাশবাবুর সঙ্গে চিঠিপত্রে ওঁর যোগাযোগ ছিল। এরপর বেশ কয়েক বছর বাদে অবিনাশবাবুর বাড়িতে হঠাৎ ভানুমতী এসে উদয় হয়। বলে বর ওকে ছেড়ে চলে গেছে, স্রেফ ভিক্ষে করে ওকে দিন কাটাতে হচ্ছে অবিনাশবাবু যদি ওকে আশ্রয় দেন! অবিনাশবাবু রাজি হননি। অবিনাশবাবু একা থাকেন, ভানুমতী শুধু যুবতী তাই নয়, ওর বর আর তার সাঙ্গপাঙ্গোরা কীরকম হেনস্তা শ্যামলবাবুকে করেছিল সেটা ওঁর বিলক্ষণ মনে ছিল। অবিনাশবাবু যখন কিছুতেই রাজি হলেন না, তখন ভানুমতী কাতর অনুরোধ জানাল ওর ছেলে বিনয়কে যদি অবিনাশবাবু অনাথ আশ্রমে রেখে দেন। অবিনাশবাবুর তখন একটু দয়াই হয়। তিনি শুধু বিনয়কে আশ্রমে ভর্তি করার বন্দোবস্ত করলেন তাই নয়, ভানুমতীকে কিছু টাকাও দিলেন। পরে ভানুমতীর এই দুরবস্থার কথা শ্যামলবাবুকে জানাতে শ্যামলবাবুও মাঝে মাঝে কিছু টাকা অবিনাশবাবুকে পাঠাতেন ভানুমতীকে দেবার জন্য।

"বিনয় কি শ্যামলবাবুর ছেলে স্যার?"

অবিনাশবাবু একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "সেটা আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তু বোধহয় নয়।"

"কী করে বুঝলেন স্যার?"

"ওর যে জন্ম তারিখ ভানুমতী দিয়েছিল, সেটা শ্যামলবাবুর বাড়ি থেকে চলে যাবার বছর দেড়েক পরে।"

"ওদের হিসেবেরও তো গণ্ডগোল হতে পারে।"

"তা পারে," অবিনাশবাবু বললেন।

"আপনাদের অনাথ আশ্রমের খাতায় কার নাম লেখা আছে ওর বাবার নাম হিসেবে?"

"কারোর নাম নেই।"

"আপনি বললেন স্যার, ভানুমতী খেতে পাচ্ছিল না, কিন্তু অন্যান্য বাচ্চাদের না রেখে শুধু বিনয়কেই রাখতে চাইল কেন?"

"ওর শুধু ওই একটাই বাচ্চা ছিল।"

"আই সি স্যার। শ্যামলবাবুর এই ব্যাপারটা, মানে ভানুমতীর ব্যাপারটা আর কেউ জানে?"

"একজন জানে, সে হল শ্যামলবাবুর ড্রাইভার রামশরণ।"

"সে এখন কোথায়?"

"সে এক কাণ্ড। আমার কাছে ক'দিন আগে রামশরণ এসেছিল, শ্যামলবাবু নাকি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"কেন স্যার?"

"সেটা আমি বলতে পারব না। ও যা বলল, সেটা শুনে মনে হল এক দেশোয়ালি ভাইয়ের সঙ্গে দারু পিয়ে একটু মাতাল হয়ে শ্যামলবাবু সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলেছিল। সেই খবর কানে যেতে, শ্যামলবাবু 'তুই নেমকহারাম' বলে ওর কোনো কথা কানে না তুলে গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করেছেন।"

বুঝতে পারলাম অবিনাশবাবু ড্রাইভারটিকে তাড়ানোর আসল কারণটা জানেন না। শ্যামলবাবু ওঁর শেষ চিঠিটা পান ড্রাইভারটি বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারতে ব্যস্ত ছিল বলে। তবে একেনবাবু দেখলাম সে প্রসঙ্গ তুললেন না। বরং জিজ্ঞেস করলেন, "'কী আজেবাজে' কথা জানেন?"

"না, সেটা জিজ্ঞেস করিনি। মাতাল অবস্থায় তো অনেক কিছুই লোকে বলে!"

"খবরটা শ্যামলবাবুর কানে গেল কী করে স্যার?"

"সেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। রামশরণের ধারণা ওর দেশোয়ালি ভাই কথাগুলো তার মালিককে বলেছে, যিনি নাকি আবার শ্যামলবাবুর ভাইপো!"

"আপনার কাছে রামশরণ এল কেন স্যার?"

"রামশরণ জানে শ্যামলবাবু আমার বিশেষ বন্ধু। আমার পারিপোতা-র বাড়িতে ও বহুবার এসেছে, এখানেও এসেছে বার দুয়েক। তাই চাইছিল যদি শ্যামলবাবুকে বলে ওকে চাকরিতে আবার বহাল করাই।"

"আপনি কি শ্যামলবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলেন স্যার?"

"না, ওঁকে ধরতে পারিনি। তারপর ক'দিন আমার মোবাইলটাও কাজ করছিল না। কেউ ফোন করলেও ধরার উপায় ছিল না। তারপর তো জানলাম তিনি আর বেঁচে নেই!"

"বিনয়বাবুর সঙ্গে এর মধ্যে আপনার কথা হয়েছে?"

"না, ওর নম্বরটা আমার জানা নেই, শুধু শ্যামলবাবুর নম্বরটাই জানতাম। ওদের বাড়িটাও চিনি না যে যাব।"

ফেরার পথে যখন একেনবাবুকে বাড়িতে নামাচ্ছি, তখন শুনলাম একেনবাবু রাখালবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। পেছনে একটা গাড়ি এত জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছিল যে, আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। আবছা যা শুনলাম তা হল, একেনবাবু জানতে চাইছেন গাড়িতে কোনো ফাইবার পাওয়া যায় কিনা দেখতে। আর তিনজনের ফোন ট্রেস করা হয়েছে নাকি।

কিছু কথা কানে আসেনি বলে, দুটো প্রশ্নই আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকল। কিন্তু একেনবাবু গাড়ি থেকে নেমে গেছেন। সুতরাং কালকে সকালে যখন চা খেতে আসব, তখনই জেনে নেওয়া যাবে।

।। ১০ ।।

পরদিন সকালে যখন একেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছোলাম, তখন প্রমথও দেখলাম ট্যাক্সি থেকে নামছে। একেনবাবু বউদিকে নিয়ে চা খাচ্ছিলেন। হাতে একটা লাল মলাটের বই। আমাদের দেখে বললেন, "আসুন স্যার, আসুন। কী খাবেন বলুন?"

"আপনাকে বলে লাভটা কী," প্রমথ বলল, "বন্দোবস্ত করার মালিক তো বউদি।"

"আরে সেইজন্যেই তো আপনাদের সাহায্য চাইছি? আপনারা খাবেন, আমিও প্রসাদ পাব।"

"শুনলেন তো ভাই ওঁর কথা, উনি চাইলে আমি যেন কিছু করি না!"

"না, করাই উচিত বউদি, কোনো গ্র্যাটিচুড নেই আপনার কর্তার।"

বউদি মুচকি হেসে উঠে পড়লেন।

"আচ্ছা একটু বেগুন ভাজা আর লুচি করলে কেমন হয়?" একেনবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে অ্যাপ্রুভাল খুঁজলেন।

"ওরকম ভাববাচ্যে কিছু চলবে না," প্রমথ ধমক দিল। "লুচি খেতে চান তো নিজে রান্নাঘরে যান।"

আমি বললাম, "তোর সাহস তো কম নয়, একেনবাবুকে রান্নাঘরে পাঠাচ্ছিস!"

"ঠিক বলেছিস, আমিই বরং যাই বউদিকে সাহায্য করি।"

"কোনো সাহায্য লাগবে না ভাই, আপনারা বসে বসে গল্প করুন, তাহলেই আমার সাহায্য হবে।"

"আপনি প্রমথকে স্পয়েল করছেন বউদি, আমি বললাম। গুণের মধ্যে একটাই ছিল□ একটু রান্না করতে পারত, সেটাও নষ্ট হচ্ছে!"

"রান্নার হাত কি নষ্ট হয় ভাই," বলে বউদি অদৃশ্য হলেন।

একেনবউদির বাড়িতে রান্নার করার একটি মেয়ে আছে, তাও বউদি নিজের হাতে আমাদের রান্না না করে খাওয়ালে তৃপ্তি পান না। প্রমথর অবশ্য ধারণা একেনবাবুর বকবকানির হাত থেকে রক্ষা পেতে উনি রান্নাঘরে অদৃশ্য হন।

বউদি চলে যেতেই একেনবাবু বললেন, "যাই বলুন স্যার, চায়ের সঙ্গে গরম গরম

লুচি আর লম্বা করে কাটা বেগুন ভাজা□ এর কোনো তুলনা হয় না।”

“তা-তো বটেই,” প্রমথ বলল, “বিশেষ করে সোফায় বসে হাত-পা নাড়ানোর আগেই কেউ যদি সেটা সামনে এনে হাজির করে। আপনি মশাই একটা যাচ্ছেতাই!”

“কেন স্যার?”

“বউদি যে এত খেটে মরছেন, সেটা একবারও ভাবেন?”

একেনবাবু বললেন, “আসলে স্যার, ও আবার এইসব করতে খুব ভালোবাসে, না করতে পারলেই কষ্ট পায়।”

“আপনার মুণ্ডু! প্রিভিলেজ পেতে পেতে বোধবুদ্ধি সব গোল্লায় গেছে!”

“শুনছেন স্যার,” একেনবাবু আমার দিকে তাকালেন।

“প্রমথর কথায় কান দেবেন না, ও বিশ্বনিন্দুক। তা এত সকালে মন দিয়ে পড়ছিলেন কী?”

উনি উত্তর দেবার আগেই ফোনটা বেজে উঠল।

“হ্যালো, ও রাখাল! বলো ভাই, কোনো খবর পেলে? পাওয়া গেছে? আর ফোন? দুটো বাঘাযতীন স্টেশনের কাছে ছিল? আর অন্য ফোনটা? চমৎকার। আরে না না, এ আর এমন কী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলে এসো।”

“কি ব্যাপার?”

“সত্যব্রতবাবুকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।”

“কেন?”

“শ্যামলবাবুকে হত্যার অভিযোগে।”

“বিনয়বাবু?”

“ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।”

“দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান! বুঝতে পারছি এর মধ্যে একেনাদ্বিতীয়ম, মানে অদ্বিতীয় একেনবাবুর হাত আছে। ব্যাপারটা খুলে বলুন তো□ এক্কেবারে গোড়া থেকে। ও বউদি চলে আসুন, আপনার পতিদেবের কীর্তি-কাহিনি একটু শুনে যান!”

বউদি তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে এসে বললেন, “কী হল?”

“আরে এসে বসুন, লুচি পরে হবে।”

“আমি সব দেখিয়ে দিয়ে এসেছি, এখন নমিতাই সব করতে পারবে।” আমাদের অভয় দিয়ে বউদি বসলেন।

একেনবাবু শুরু করলেন, “আসলে স্যার, শ্যামলবাবু যখন এসে বললেন যে, ওঁর খুনিকে খুঁজে বার করতে হবে, তখনই আমার গোলমাল লাগছিল। হ্যাঁ, যে খুন করার চেষ্টা করছে, তাকে ধরতে বলার অর্থ হয়। খুন হবার আর সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু খুনটা করার পর সে ধরা পড়লেও ভদ্রলোকের লাভটা কী? হ্যাঁ স্যার, সমাজের নিশ্চয় একটা লাভ আছে□ কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু সেটাই কি কারণ? আরেকটা হতে পারে, উনি খুব ভালো করেই জানেন কে খুন করবে। সে যেন উপযুক্ত শাস্তি পায়, সেটাই আমার সাহায্য নিয়ে নিশ্চিত হতে চান। হাসবেন না স্যার, বিচিত্র এই পৃথিবী!

“তারপর স্যার, শ্যামলবাবু খুন হলেন। পুলিশ প্রথমে ভাবল আত্মহত্যা, তারপর সন্দেহ করল বিনয়কে। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। অজ্ঞাতকুলশীল বিনয়কে শ্যামলবাবু ওঁর সম্পত্তির প্রায় পুরোটাই দান করেছিলেন। যখন উকিলের কাছ থেকে উইলটা এনে বদলাবার কথা ভাবছিলেন ঠিক তার আগেই খুন হলেন। টাইমিংটা

ইম্পর্টেন্ট। শ্যামলবাবুর আয়ু বেশি দিন ছিল না, বড়োজোর কয়েকমাস। সুতরাং যিনি খুন করেছেন, তিনি শ্যামলবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্যামলবাবু মৃত্যুর আগে উইল পালটালে সবচেয়ে ক্ষতি হত বিনয়বাবুর, এটা বিচার করলে সন্দেহটা বিনয়বাবুর উপরেই পরে। তবে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে যে, উইলে যাই থাকুক না কেন, সেটা না পাওয়া গেলে তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ উইলটা না পাওয়া গেলে বিনয়বাবুর ভাগ্যে কিছুই জুটত না, সম্পত্তির পুরোটাই পেতেন শ্যামলবাবুর একমাত্র ওয়ারিশ ভাইপো সত্যব্রতবাবু। অথচ সেই সত্যব্রতবাবুই সম্পত্তির লোভ উপেক্ষা করে উইলটা খুঁজে বার করলেন। কেন করলেন স্যার, সেটা নিয়েই আমি ভাবছিলাম। উইলটা না পাওয়া গেলে সন্দেহের তীরটা বিনয়বাবুর বদলে সত্যব্রতবাবুর দিকেই পড়ত, সেটা ঠিক। কিন্তু তা পড়ুক না স্যার, সত্যব্রতবাবু যদি নির্দোষ হন, তাহলে অসুবিধাটা কোথায়? চুপাচাপ না বসে থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেন তিনি উইলটা আবিষ্কার করলেন! তিনি কি এতই মহানুভব? দ্যাট ট্রাবলড মি স্যার, ট্রাবলড মি এ লট। তারপর অবিনাশবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে ক্লিয়ার হল। বুঝতে পারছেন স্যার আমি কি বলছি?”

“না,” আমি মাথা নাড়লাম।

“কী মুশকিল, অবিনাশবাবু বলেছিলেন না যে, ওঁর সন্দেহ হয়েছিল বিনয়বাবু শ্যামলবাবুর অবৈধ সন্তান! সেই একই সন্দেহ নিশ্চয় শ্যামলবাবুর ড্রাইভারটিরও হয়েছিল। এই সন্দেহটাই নিশ্চয় মদের ঘোরে ড্রাইভারটি সত্যব্রতবাবুর ড্রাইভারকে বলেছিল, পরে সেটা সত্যব্রতবাবুর কানেও ওঠে। যার সঙ্গে কথা বলে শ্যামলবাবু ভীষণ উত্তেজিত হয়েছিলেন স্যার, সেই ব্যক্তিটি আমার বিশ্বাস সত্যব্রতবাবু। তিনিই কাকার সঙ্গে ভানুমতীর সম্পর্কের কথা তোলেন, হয়তো বিনয়ের প্রসঙ্গও। সেই কারণেই বহুদিনের বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে শ্যামলবাবু তাড়ালেন। এখন বিনয়বাবু যদি সত্যিই ভানুমতীর গর্ভজাত শ্যামলবাবুর সন্তান হতেন, সেক্ষেত্রে অবৈধ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারে শ্যামলবাবুর সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার তাঁর থাকত, সত্যব্রতবাবুর ভাগ্যে জুটত শূন্য। এই ভয়টাই সত্যব্রতবাবুর হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্যার, কাকা উইল করে ওঁকে সম্পত্তি না দিয়ে গেলে উনি কিছুই পাবেন না। বিনয়বাবুকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার একমাত্র উপায় হল শ্যামলবাবুকে দিয়ে উইল পালটানো অথবা বিনয়বাবুকে শ্যামলবাবুর হত্যাকারী বলে প্রমাণ করা। বিনয়বাবু খুনি প্রমাণিত হলে সম্পত্তি পাওয়ার সুযোগ হারাবেন, তখন সম্পত্তির ষোলো-আনা মালিকানা হবে সত্যব্রতবাবুর। আমার থিওরি হল স্যার, প্রথমে সত্যব্রতবাবু ভানুমতীর প্রসঙ্গ তুলে শ্যামলবাবুকে লোকলজ্জার ভয় দেখিয়ে উইল পালটাবার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। সেই চাপেই বোধহয় শ্যামলবাবু ভাইপোর হাতে উইলটা তুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘তুই এটা ছিঁড়ে ফেল, নতুন উইল করে তোকে সব কিছু দিয়ে যাব।’

কিন্তু সত্যব্রতবাবু কাকাকে বিশ্বাস করেননি। সত্যব্রতকে সম্পত্তি উইল করে, পরে তিনি আরেকটা নতুন উইল করে আগের উইলটা বাতিল করতে পারেন। সেই ভেবেই স্যার সত্যব্রতবাবু অন্য পথ ধরলেন। তিনি শুধু নিখুঁত অভিনেতা নন, অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। প্রথমে শ্যামলবাবু সেজে আমাকে কাজে নিযুক্ত করলেন, যদি পুলিশ এটাকে ভুল করে আত্মহত্যা ভেবে বসে সেটা ঠেকাতে। বাকি রইল কাকাকে খুন করে বিনয়বাবুকে হত্যাকারী হিসেবে ফাঁসানো। মৃত্যুর দিন স্যার শ্যামলবাবু একা বেরিয়েছিলেন, কারণ ভানুমতীর বিষয়ে ওঁর সঙ্গে সত্যব্রতর আলোচনা আর কেউ শুনুক তিনি তা চাননি।

কাছাকাছি কোথাও দু-জনের দেখা হয়েছিল। বিনয়বাবু যে রঙের পাঞ্জাবি সাধারণত পরেন সেইরকম একটা পাঞ্জাবি ছিল সত্যব্রতবাবুর গায়ে। বিনয়বাবুর অজান্তে তাঁর মোবাইলটাও সত্যব্রতবাবু হাতিয়েছিলেন। সেটিকে 'অন' করে রেখেছিলেন স্যার, যাতে তার গতিবিধি মোবাইল কোম্পানির সুইচিং সেন্টারের ডেটা থেকে বার করতে পারা যায়। কথা বলার সুবিধা হবে এই অছিলায় সত্যব্রতবাবু কাকাকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাঘাযতীন স্টেশনের কাছে পৌঁছোন। সেখানে গাড়ি থামিয়ে শ্যামলবাবুকে জোর করে নামিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ফেলে দেন। তারপর কাকার ফোন থেকে বিনয়কে একটা এস.এম.এস পাঠিয়ে তৃতীয় এক ব্যক্তি যিনি আগে থেকেই ওখানে ছিলেন, তাঁর হাতে বিনয়ের মোবাইলটা দিয়ে সত্যব্রতবাবু বাড়ি ফিরে যান।"

"তৃতীয় ব্যক্তি!"

"হ্যাঁ স্যার, তৃতীয় ব্যক্তি একজন ছিলেন। সেই তৃতীয় ব্যক্তি হলেন শিবদাসবাবু। তিনিই বিনয়বাবুর মোবাইলটা ফেরত এনে সোফায় রেখে দেন। শুধু তাই নয় আরেকটা কাজও সেদিন সকালে শিবদাসবাবু করেছিলেন। বিনয়কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য। বিনয়বাবু বাড়িতে থাকলে স্যার, তার একটা অ্যালিবাই থাকত। এক্ষেত্রে সেটা আর রইল না। শিবদাসবাবুর আমার কাছে এসে শ্যামলবাবুর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে বলাটাও স্যার ওদের প্ল্যানের একটা অংশ, যাতে পুলিশ বিনয়বাবুকে ধরতে না পারলেও আমি পারি। শিবদাসবাবু যে ওখানে ছিলেন, সেটা ওঁর মোবাইল ট্রেস করে পাওয়া গেছে। শুধু দুটো ভুল সত্যব্রতবাবু করেছিলেন স্যার। এক নম্বর হল, নিজের মোবাইলটা উনি 'অফ' করে রেখেছিলেন।"

"সেটা তো বুদ্ধিমানের কাজ, ওঁর ফোনের ট্রেস পাওয়া যাবে না।"

"তাই কি স্যার? শার্লক হোমসের সেই বিখ্যাত গল্প 'সিলভার ব্লেজ'-এর কথা ভাবুন... কুকুর কেন চেঁচায়নি? অচেনা লোক দেখলে যেটা করা স্বাভাবিক সেটা করেনি! সুতরাং অপরাধী চেনা লোক। এটাও খানিকটা সে-রকম। যাঁকে সব সময় মোবাইলে পাওয়া যায়, তিনি সেটা না নিয়ে ঘুরছেন... বিশ্বাস করাটা কঠিন। বিশেষ করে শ্যামলবাবু ট্রেন চাপা পড়ার দশ মিনিট বাদেই হঠাৎ ওটার ট্রেস পাওয়া গেছে বাঘাযতীন থেকে খানিকটা দূরের একটা টাওয়ারে।"

"আর দ্বিতীয় ভুল?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"দ্বিতীয় ভুলটা করেছিলেন, প্রথম দিন আমার বাড়িতে যখন এসেছিলেন।"

"সে ভুলটা আবার কী?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

শ্যামলবাবু, যিনি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারেন না, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করছিলেন। আমিই তখন ওঁকে বললাম, উনি লাঠিটা ফেলে যাচ্ছেন। যিনি সব সময় লাঠি নিয়ে ঘোরেন, তাঁর পক্ষে এই ভুলটা অস্বাভাবিক। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর জেনেছিলাম যে, সত্যব্রতবাবু একজন অভিনেতা। তখনই সন্দেহটা দানা বাঁধতে শুরু করে।"

"একটা জিনিস আমি বুঝছি না। তিন-তিনটে চিঠির কথা সত্যব্রত আনল কেন, একটা চিঠিই তো যথেষ্ট ছিল?"

উত্তরটা প্রমথ দিল। "আচ্ছা ইডিয়ট তুই! লোকটা ভালো অভিনেতা, লেখক তো নয়! নিশ্চয় ভেবেছিল একটার বদলে তিনটে চিঠি দিলে রহস্যটা পোক্ত হবে!"

"তোর মুণ্ডু! আর শিবদাসবাবু ওর সঙ্গে যোগ দিলেন কেন?"

"খুবই সিম্পল। বিনয় ব্যবসাটা ভালো বোঝে। ওর বদলে সত্যব্রত ব্যবসার পার্টনার

হলে শিবদাসবাবুর টুপি পরাতে সুবিধা হবে। মাথায় ঢুকল?... যাইহোক, একেনবাবু, চমৎকার ডিটেকশন আপনার, কিন্তু ধোপে টিকবে তো?”

“টিকবে স্যার টিকবে। সত্যব্রতবাবুর গাড়িতে শ্যামলবাবুর জামার ফাইবার পাওয়া গেছে, বিনয়বাবুর মোবাইলে শিবদাসবাবুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট। রাখালের নির্দেশে বেশ থরো জব করেছে কলকাতার পুলিশ।”